না ট্য ভা ব না

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা : সুভাষ সেনগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : ১৪০৩

প্রকাশক :
শিপ্রা দাস
২৫ চণ্ডীতলা ব্রাঞ্চ রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৩

মুদ্রণ :
পরিতোষ মান্না
স্পীড পাওয়ার অফসেট
১৮এ হরতুকি বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

লেজার টাইপ সেটিং :
'লেজার এ্যাড'
৪০/১ কবিতীর্থ সরণী
কলকাতা-৭০০ ০২৩

ফটো প্রসেসিং :
গৌতম সাহা
৮৭/১ বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

যুগশ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার-নির্দেশক

শম্ভুদাকে—

কেন এই সংকলন

বাঙালি নাটক করছে বহুদিন ধরেই, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্য-শিক্ষা ব্যতিরেকে; তবু, এই সৃষ্টি-প্রবাহ নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বৈচিত্র্যে এবং সংখ্যাধিক্যে প্রযোজনাগুলি বাঙালির নাট্য-আসক্তিকে যেমন প্রমাণ করছে, তেমনি আবেগ-প্রাবল্যে তার বিশিষ্ট উপাদনাগুলিকে অনেকাংশে বিনষ্ট করেছে।

সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দেশিত নাট্য-উপস্থাপনে প্রয়োজন: বাস্তবমুখী চিন্তন, বিশ্বভাবনার অনুধ্যান এবং নাট্য-প্রয়োগ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা। এই ত্রি-মাত্রিক প্রয়াসেই গড়ে ওঠে উন্নত এক চিত্তবৃত্তি—যা নাট্যরচনা এবং মঞ্চাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে অপরিহার্য উপাদান। এই পরিশীলিত মননশীলতার অভাবই আমাদের নাট্য-প্রগতিকে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। ব্যর্থতাবোধে হয়েছি আশাহত।

১৯৪৪-এর 'নবান্ন'-উত্তর পর্বে নাট্য-ভাবনায় একটা সুশিক্ষিত ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নির্মাণের কাজ শুরু হয়—যার মুখ্যদায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রী শম্ভু মিত্রের পরিকল্পিত ও পরিচালিত 'বহুরূপী' নাট্য-সংস্থা। এখানে সমবেত হন বিভিন্ন গুণিজন, যাঁরা নাট্যোৎকর্ষের যাবতীয় শর্ত-পূরণে শ্রী মিত্রের মতাদর্শ ও কর্মপন্থাকে স্বাগত জানান। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা না -ক্ষেত্র উর্বর হয়ে ওঠে এবং অচিরেই সুফল ফলতে থাকে। সুশৃঙ্খল, দৃঢ়ীভূত, আত্মপ্রকাশ-ঋদ্ধ এই নাট্যদলটি প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা তৈরি করতে সক্ষম হয়, যার ফলে দর্শক-মনন ও নাট্য-চিন্তন একটা সুসংস্কৃত রূপ লাভ করে। এই সৃজন-কর্মের অন্যতম অংশীদার হলেন শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায়।

'বহুরূপী'র প্রাক্-প্রতিষ্ঠা কালেই শ্রী শম্ভু মিত্রের সঙ্গে শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগাযোগ ঘটে। এই সংযোগই নাট্য-বুভুক্ষু, গৃহ থেকে পলাতক-প্রায়, কলকাতা-ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধনরত শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পথ-অন্বেষণকে নির্দিষ্ট এক বন্দরে পৌঁছে দেয়—যেখানে অভিনয় ও যাবতীয় নাট্য-ক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ঈপ্সিত সাধনা।

প্রতিভাবান, সুশিক্ষিত, সুদর্শন শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এই অনুশীলন-পর্বে নিজেকে নাট্যশিক্ষিত ক'রে তুলতে থাকেন এবং আলোকপ্রাপ্ত সেই শিক্ষার দ্যুতিতেই তাঁর অভিনয়-প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে তাঁর সহজাত দক্ষতা দর্শককে সম্মোহিত ক'রে ফেলে—জনপ্রিয় অভিনেতা হিসাবে তিনি সমাদৃত হন।

শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত 'পথিক'-এ গোগরা, 'উলুখাগড়া'তে সুরেশ এবং দেবব্রত, 'ছেঁড়াতার'-এ সরেমামুদ, 'চার অধ্যায়'-এ কানাই গুপ্ত এবং ইন্দ্রনাথ, 'বিভাব'-এ অমর, 'দশচক্র'তে অমলেন্দু, 'রক্তকরবী'তে বড় সর্দার, 'ডাকঘর'-এ মোড়ল, 'পুতুল খেলা'তে কেষ্টপদ, 'কাঞ্চনরঙ্গ'তে সূত্রধার এবং বড়কর্তা, 'বিসর্জন'-এ রঘুপতি, 'মুক্তধারা'তে হুব্বা 'রাজা অয়দিপাউস'-এ তাইরেসিয়াস, 'রাজা'তে কাঞ্চীরাজ এবং গ্যালিলেও (গ্যালিলেও), মহারাজা

নন্দ (রাজদর্শন), দুর্যোধন (ধর্মাধর্ম) প্রভৃতি চরিত্র তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বৈচিত্র্যময় অনুভূতি নিয়েই যথাযথভাবে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণমুখী চিন্তা ও আত্মপ্রত্যয়ী মনই সদা-সতর্কভাবে সক্রিয় থেকেছে। এসব কারণেই দর্শক সর্বদাই তাঁর অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকতেন।

১৯৮৫-'৮৬তে তিনি মঞ্চাভিনয় থেকে অবসর নেন। যদিও বেতার, চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শনের অভিনয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেননি। তবু, এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই যে মঞ্চাভিনয়ে তাঁর অভিনয়-দীপ্তি যতটা উজ্জ্বল, স্বাভাবিক কারণেই অন্য মাধ্যমগুলিতে সেই দ্যুতি অনেকটাই নিষ্প্রভ; তাঁর সেই অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার স্বীকৃতি আজ শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শীর আলাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য, প্রত্যেক অভিনেতাই মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন; মাত্র কয়েকজনই জনশ্রুতিতে গৌরব-প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত অমর গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে সেই অল্প সংখ্যকদের মধ্যে একজন।

পরিসংখ্যানগত তথ্য উপস্থাপন না ক'রেও বলা যায় জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশই নাট্য-ক্রিয়া বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু। একটি দলের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-ভাবনা ও প্রয়োগ-রীতিতে যে নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটলো—তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; তৎকালীন সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থ'র অবস্থানগত স্থানান্তরিতকরণের ঐতিহাসিক এক পরিণতি মাত্র। রূপান্তরিত সমাজ-দর্শনে প্রভাবিত নাট্য-চালচিত্রটি নবরূপ পরিগ্রহ করে, যার প্রধান চিত্রক 'বহুরূপী' নাট্য-সংস্থা। এই চিত্রণ-ইতিবৃত্তের নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে শ্রীযুক্ত অমর গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে। 'দল গড়ার দায়িত্ব' থেকে 'সহজ সমস্যা'; 'রঙ্গমঞ্চের পূর্বসূরি'দের মূল্যায়ন থেকে শ্রী 'শম্ভু মিত্র'র প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা আত্ম-পর্যালোচনার নিরিখে 'কিছু কথা'—প্রভৃতি নিবন্ধ তৎকালীন নাট্য-ভাবনার মূল্যবান দলিল।

সময়ান্তরে লিখিত প্রবন্ধগুলির কালসীমা পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকে নব্বুইয়ের সাম্প্রতিক বছর পর্যন্ত; একমাত্র 'শম্ভু মিত্র' প্রবন্ধটি ছাড়া সবগুলিই ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের একটি সংকলন মাত্র।

প্রবন্ধগুলিকে বিষয়গত কিংবা কালানুক্রমিক—যে-কোনো পদ্ধতিতেই বিন্যস্ত করা যায়; এক্ষেত্রে দ্বিতীয় রীতিটিই গৃহীত হ'লো। কারণ, সম্ভবত অনুসৃত পদ্ধতির মাধ্যমেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সময়গত অবস্থান, পরিবর্তন এবং উত্তরণের একটি রেখাঙ্কন সম্ভব—যার সাহায্যে পাঠক অনায়াসেই লেখক-মানসিকতা অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

প্রবন্ধগুলির সময়সীমা যেহেতু কয়েক দশক, সেহেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দ, ভাষা ও বানানগত কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে; সেগুলো করা হয়েছে লেখকের পূর্ণ সম্মতিতেই।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ বিষ্ণু বসু এই সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাঁর অমূল্য গ্রন্থভাণ্ডার থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহের অনুমতি দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। সমস্ত সহায়তার কারণে তাঁর কাছে ঋণবদ্ধ থাকলাম।

কৃতজ্ঞ থাকলাম শ্রদ্ধেয় শ্রী সলিল সেনের কাছে। সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-বেত্তা, স্নেহপ্রবণ শ্রীযুক্ত সেন যেভাবে বয়সজনিত বাধাকে অতিক্রম ক'রে সম্পাদনার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে'ন তাতে তাঁর সাহিত্য-নিষ্ঠারই অভিব্যক্তি প্রতিভাত হয়েছে। আশা করি তাঁর এই শ্রমদান সার্থক হবে।

গ্রন্থটির কম্পোজিং-এর দায়িত্বে ছিলেন শ্রী গৌতম পাল ও তাঁর সহযোগী শ্রী শিশির মন্ডল। ফটো-প্রসেসিং করেছেন শ্রী গৌতম সাহা। এঁরা সর্বদাই ব্যবসায়ী-মনোবৃত্তিকে সরিয়ে রেখে গ্রন্থ-সৌষ্ঠব রক্ষায় সহায়তা করেছেন। তাঁদের এই মানসিকতাকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থ-প্রকাশে নানাবিধ সহায়তা এবং পরামর্শদানে প্রীতিভাজন শ্রী রূপক দাসের আন্তরিক প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর মুদ্রণ-জনিত অভিজ্ঞতা গ্রন্থ প্রকাশের কাজকে ত্বরান্বিত এবং সহজতর করেছে। এই কারণে তিনি ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে বলা যায়, নব্বুই-এর প্রান্তিক লগ্নে স' গ্রিক নাট্য-ক্রিয়া একটি সংকট-মুহূর্তে অবস্থান করছে। তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যা এ¯ , অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সংশয় এবং নিস্পৃহতা—এই সংকটকে ঘনীভূত করেছে। লক্ষণীয়, '৪৪-এর নাট্য-প্রবাহ ইতিমধ্যেই তাঁর গতিবেগ হারিয়েছে; গতিমুখ পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষমাণ। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ-পথ নির্ণয়নে নাট্য-সম্পৃক্ত সকলেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধগুলি হয়তো সেই ভবিষ্য-সূচনাতে কিছু সাহায্য করতে পারে, কারণ অতীতের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই সুপ্ত থাকে আগামীকালের দর্শন—তাই এই সংকলন, এই একত্রীকরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়; বহু নাট্য-চিন্তকের গুরুত্বপূর্ণ নাট্য-ভাবনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে; উল্লিখিত লক্ষ্যে সেগুলিরও আশু সংকলন বা পুনঃপ্রকাশ একান্ত দরকার। নাট্যদল এবং প্রকাশকরা এ-ব্যাপারে দায়িত্ব এবং উদ্যোগ নিলে আগামী নাট্য-প্রক্রিয়ার লক্ষ্য-নির্ধারণের কাজটি সহজতর হবে ব'লেই বিশ্বাস করি।

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি যদি পাঠক-শ্রেণীকে আকৃষ্ট করে তাহলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তৃপ্তিলাভে ধন্য হবো।

নমস্কারান্তে—

সুভাষ সেনগুপ্ত

(সম্পাদক)

সূচিপত্র

দল গড়ার দায়িত্ব

অনস্বীকার্য প্রযোজন ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করে। কোনো সংঘ বা সংগঠনও ওই একই ভাবে সৃষ্টি হয়। বাঁচবার তাগিদে, আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে মানুষ দল বাঁধে। আলোচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ক'রে, দল-বিশেষের কথায় এলে ব্যক্তি-বিশেষের কথা উঠতে পারে; কিন্তু সমগ্রভাবে বলতে গেলে বলা যায়, প্রযোজন তীব্রভাবে অনুভূত হ'লে দল আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।

নাটকের দলেব বেলাতেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। নাট্যশিল্প যৌথ-প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে—আর তাই এ-প্রসঙ্গে দল বাঁধার কথা ওঠে। জীবনের উপলব্ধি ও প্রকাশই হ'লো শিল্পের মূল কথা। বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন পথ অনুসৃত হয়ে থাকে। প্রয়োজন মতো কখনো একক প্রচেষ্টায় শিল্পী অগ্রসর হন, কখনো বা দলগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। চিত্র-শিল্পী নির্জনে একক সাধনায় জীবনের গূঢ়তম সত্যকে স্পর্শ ও প্রকাশ করতে পারেন—কিন্তু নাট্য-শিল্পী তা পারেন না, তাঁর সহযোগী, সহধর্মীর প্রয়োজন হয়।

দেখা যায় স্ব-স্ব তাগিদে বা প্রয়োজনে সমধর্মীয় লোক এক বেদিতে এসে জড়ো হয়; গড়ে ওঠে দল। বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিত্বের চাপে, সামাজিক অনুশাসনে এবং সর্বোপরি উদ্দেশ্যের নিজস্বতায় কিছু কিছু সাধারণ নিয়ম আপনিই গড়ে ওঠে—এবং কাজের সুবিধার্থে অন্যান্য নিয়ম তৈরি করা হয়। সমস্ত সভ্যই সচেতনভাবে এই নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করেন— ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং দলীয় প্রয়োজনে। কিন্তু আরো একটা মন আছে, যে প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্ত বাধা বা আরোপ করা নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু সচেতন বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে সে এত দূরে থাকে যে বেশির ভাগ সময়েই সে আমাদের প্রতারিত করে। ফলে সহসা যখন দলে কোনো অন্তর্বিরোধ শুরু হয়, আপাতদৃষ্টিতে তখন তার কারণ গৌণ মনে হ'লেও, দীর্ঘদিনের অবহেলায় অযত্নে সে তখন এতই গভীরে শিকড় চালিয়ে দেয় যে তার মূলোচ্ছেদ

তখন দলের মূলোচ্ছেদেরই সামিল হয়। প্রকাশ্য নিয়মের এবং প্রকাশ্য ব্যতিক্রমের ধারা সুস্পষ্ট। কিন্তু মানুষের মন যতটা প্রকাশ পায়, তার চেয়ে বেশি সে গভীরে লুকিয়ে থাকে—তাই প্রকাশ্য কারণের সূত্রটা বহু সময়েই অপ্রকাশ্য থেকে যায়।

অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই দলের সৃষ্টি। আর ওই তাগিদেই সকলে সকলের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিয়ে একটা সাধারণ ঐক্যে মিলতে পারে। কতকটা জ্ঞাতে, কতকটা বা অজ্ঞাতে—সকলেই একই ধাঁচে কথা বলে, ব্যবহার করে। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মোপলব্ধি এবং শিল্পোবোধ কখনোই সকলের সমপর্যায়ের হয় না—এবং আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাও সকলের মধ্যে সমান বেগে থাকে না। তা সত্ত্বেও একে অন্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয় এবং পুর্ণোদ্যমে শিল্পের বেদিতে আত্মোৎসর্গ করে। কিন্তু এর উল্টো দিকেরও একটা চেহারা আছে—সেটা হ'লো প্রয়োজনের তাগিদ কমবার সঙ্গে সঙ্গে দলের সমস্ত গ্রন্থি একে একে আলগা হতে থাকে; একের অনুৎসাহ তখন অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়—এবং শেষ পর্যন্ত দলের ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় একটা সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি—সেটা হ'লো সাধারণ মানবিক ধর্মে দল সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তিগত ও দলগত প্রয়োজনবোধের ওপর তার পুষ্টি ও আয়ু নির্ভর করে। কিন্তু এ হ'লো অতি বৃহৎ সমস্যার অতি সাধারণ একটা দিক। মানুষ এক বিচিত্র সৃষ্টি এবং ততোধিক বিচিত্র তার ব্যবহার। মানুষের আত্মোপলব্ধি এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার তাগিদ নিরন্তর। চিরকালের, চিরযুগের সব শিল্পী তাঁর সমস্ত সাধনা দিয়ে জীবনের এই মহাসত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

একক-শক্তি-বহির্ভূত কাজ ব'লেই আমরা দল বাঁধি—একথা যদি সত্য হয়, তাহলে দলের মূলশক্তি বা প্রাণশক্তি হ'লো সমবেত কাজ। সেখানে যে লোক কাজ করে না—সে দলের প্রাণশক্তিকে অগ্রাহ্য করে। দলে থাকার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সে যদি থাকে বা তাকে যদি রাখা হয়, তাহলে দলের ভার-স্বরূপই সে থাকে। এক্ষেত্রে দলের সমস্ত নিয়মকানুন এবং নীতি-নির্ধারণ যদি কাজের ভিত্তিতে সুপরিকল্পিত ভাবে হয়, তবে মোটামুটিভাবে দৃষ্টির স্বচ্ছতা আসে এবং যে-কোনো সুবিধা বা অসুবিধার সময় 'কাজকে'ই যদি দিক-নির্ণয় যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সমস্ত আলোচনা বা সিদ্ধান্ত সুপ্রযুক্ত হয় এবং নিজস্ব দৃষ্টির আবিলতায় সকলকে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

এর সঙ্গেই আসে পরিকল্পিত কাজের বাস্তবায়ন এবং তার বোঝাপড়া—এতেই দল সচল থাকে। নতুবা পরিকল্পনাকে কল্পনার ক্ষেত্র থেকে বাস্তবে রূপায়িত করা কিছুতেই সুসাধ্য হয় না। একথাও বলা যেতে পারে—ভালোভাবে পরিকল্পনা ক'রে, সব সময়ে সচেতন থেকে, যে দল কার্যান্তে সমস্ত বিষয় সতর্কভাবে হিসাব-নিকাশ করে সে দলের আয়ু দীর্ঘ হয়।

ব্যক্তি কখনো নিজের ক্ষমতায় দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়—কখনো-বা সংঘ-শক্তি থেকে সে প্রাণশক্তি আহরণ করে। এই ভাবেই ব্যক্তির সঙ্গে দলের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। তাই দলের প্রতি আনুগত্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা এবং উদ্দেশ্যের একমুখিতা দলের স্থায়িত্বের পক্ষে প্রধান বিচার্য-বিষয়; এর কোনো একটির দুর্বলতা সংঘকে বিকলাঙ্গ করে—এবং শেষ পর্যন্ত সংঘের পুরো দেহটা নিজের ভারসাম্য হারায়।

যেমন জীবনে, তেমনি শিল্পে—প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং অপ্রত্যক্ষ সত্য—দু'য়ের মিলনেই পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সীমা-পরিসীমা নেই। তাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য, একটা কর্মপদ্ধতি থাকে। অপ্রতিষ্ঠিত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াকু নাট্য-দলগুলোর কথা বাদ দিয়েই বলতে পারি যারা নিজস্ব কর্মকুশলতায়, নিজস্ব শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তারাও কেন দীর্ঘ জীবন লাভ করে না? বিড়ম্বিত দীর্ঘজীবন নয়— স্বাভাবিক সুন্দর জীবন। যে জীবন নতুন কিছু বলতে পারে, নতুন কিছু করতে পারে, নতুন কিছু ভাবতে পারে— বাঁচার প্রশ্নে নতুন কিছু করা বা ভাবাটা একান্তই দরকার। যখন দেখা যায় দলের নতুন কিছু বলার বা নতুন কিছু ভাবার ক্ষমতা নেই তখন বুঝতে হবে দলের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখনো যদি সে টিকে থাকে তাহলে সেটা শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই রইবে এবং এই নিষ্ফলা টিকে থাকার আর কোনো অর্থই থাকে না। কিন্তু প্রাণশক্তি যে কী ক'রে নষ্ট হয় তা বলা কঠিন, কারণ সংঘ যদি একবারও জীবনের মহাসত্যকে স্পর্শ ক'রে থাকতে পারে, একবারও যদি সে নিজের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরে থাকে, তাহলে তার প্রাণশক্তি নিজের অর্জিত শক্তিতেই বেঁচে থাকে—ব্যক্তিবিশেষের শ্রান্তি, ক্লান্তি, প্রয়োজনের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করে; প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অপ্রত্যক্ষ সত্যের গ্রন্থি বাঁধে।

বহু দিনের প্রস্তুতি, বহু দিনের প্রচেষ্টায় অন্ধকার অতিক্রান্ত হয়— আসে সাফল্য, সঙ্গে আসে আত্মপ্রসাদ। আত্মপ্রসাদ আত্মপ্রত্যয় নয়; ফলে গড়বার বদলে আমরা শুরু করি ভাঙতে—কতকটা জ্ঞাতে, কতকটা বা অজ্ঞাতে।

নিজেকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরকে সতর্ক করি এবং ঘটনাটা চক্রবৎ হওয়ার ফলে সকলেই সকলকে সতর্ক করি, সকলেই নিজেকে প্রশ্রয় দিই। তখন ক্রমে ক্রমে মানসিক এবং দৈহিক আলস্যপ্রসূত ধারণা, বিশ্বাস, গোঁড়ামি এসে ভর করে। দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয়—এবং 'পথ থেকে বথ' সকলেই নিজেকে দেবতা ব'লে মনে করি—বাণী দিতে চাই, ভোগ পেতে চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কথা কাউকে শোনাতে না পেরে, কাউকে বোঝাতে না পেরে, সকলের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা দেখিয়ে সগৌরবে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে সকলের আড়ালেই অপপ্রচার করার মহাব্রতে লেগে যাই—দল ভেঙে যায়।

আগাছা নয়—গাছই হ'লো বাগানের সৌন্দর্য। কিন্তু তার জন্য যত্ন নিতে হয়—চেষ্টা করতে হয়। গাছের জন্য যত্ন নিলে আগাছা আসতে পারে না, কারণ গাছের পক্ষে যেটা অযত্ন, আগাছার তাই প্রাণসম্পদ। ঠিক তেমনি দলে প্রয়োজনীয় আলোচনা, তর্কবিতর্ক এবং বোঝাপড়া নিয়মিত না হতে থাকলে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, বাজে গাল-গল্প প্রশ্রয় পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কাজের ভিত্তির মূল আলগা হয়ে যায়। তখন হঠাৎই সতর্ক হতে গেলে আড়ষ্টতা আসে—ফলে অপ্রাসঙ্গিক তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়, নয় সমস্ত আলোচনাই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সহকর্মীকে বোঝাবার সহজ ক্ষমতা নষ্ট হয়; প্রয়োজনীয় কথাও আর আসরে স্থান পায় না। অভিমান এসে জড়ো হয়—ধীরে ধীরে সে ক্ষোভের রূপ নেয়। তখন যে-কাজ এক কথায় বোঝা যেত, করা যেত, এখন দশ কথা ছাড়া আর তা পরিষ্কার হয় না। আর দশ কথা বলা হয়ে ওঠে না ব'লেই শেষ পর্যন্ত কাজও আর হয় না।

কিছু লোক ভাবে, যতদিন পারা যায় এই ভাবেই করবো, আবার কিছু লোক ভাবে এ কাজ আমার একারই করণীয় নয়। কিন্তু এ বোঝা-ও ঠিক নয়। কারণ, প্রথমত এ ভাবে কাজ করা যায় না—ক্ষেত্র ক্রমে সীমিত হতে হতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; দ্বিতীয়ত এ কাজ যে মনে করবে করণীয়, সে কাজ হয়ে দাঁড়ায় তারই। এ-দুই মনোভাবের কোনোটাই কাজকে সাহায্য করে না। তাই আবার সেই কাজকেই সামনে রেখে আত্মাভিমান দূর ক'রে, নিজেকে প্রশ্রয় না দিয়ে এবং নিজেকে ব্যতিক্রম না ভেবে যদি সকলে সহজ আলোচনায় বসতে পারে তাহলে সহজেই মেঘ কেটে যায়। কিন্তু এ-কথা যত সহজে বলা গেল, কাজটা তত সহজে হয় না। কারণ আমরা যে-সমাজে বাস করি, যে-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠি তাতে মনের পরিসর খুব কম সময়েই প্রসারতা পায়—বেশির ভাগ সময়ে তাকে সযত্নে বাড়াতে হয়। সময়টা একবার নষ্ট করলে আবার দ্বিগুণ মনোবলের প্রয়োজন হয়। নানা রকম মোহ, লালসা, আত্মপ্রচারের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঘিরে ধরে। নিজের সততায়, চেষ্টায় যে তাকে

জয় করতে পারে, সে-ই উন্নত হয়, সে-ই জীবনকে প্রকাশ করতে পারে। কারণ জীবন বা শিল্প, সুন্দর আধার ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করে না। আমরা সেই সুন্দরের পূজা করতে চাই; জীবন ও শিল্পকে উপলব্ধি করতে চাই।

সুন্দরের এই প্রকাশ ঘরে এবং বাইরে— সর্বত্র কাম্য। যে রুচিবোধ এবং শিল্পবোধ থেকে আমরা নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখি, ঘরকে সাজাই, তারই বৃহত্তর পরিচয় দিতে হয় সংঘে। সব সময় সচেতন হয়ে ভাবতে হয় কী ক'রে সাজালে দলের চেহারা সুন্দর হয়ে উঠবে; কাকে কোথায় রাখলে এবং কী ভাবে কাজে লাগালে, সে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে—দলের সৌরভ আরও বাড়বে।

আর একটা কথা। কাজের লোকের জন্য কাজের সুযোগ রাখা প্রয়োজন, যাতে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই কাজ করতে পারেন। আর এ সুযোগ যতদিন থাকবে দল ততদিন সচল থাকবে—এর ব্যতিক্রম ঘটলে নিজেদের শ্মশান-শয্যা নিজেদেরই রচনা করতে হবে। দলে কাজ করার অধিকার সকলের, কাজ না করার অধিকার কারো নেই। যে-কোনো শিল্প-সংঘে সাম্য বা গণতন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এই পদ্ধতিতেই—ভোটের জোরে নয়। যে কর্মদক্ষ তাকে ভোট চাইতে হয় না, সে ভোট পায়—আর অন্যকে সমর্থন খুঁজতে হয়। কাজ না করার দলে পড়লে একদিন সকলকেই প্রায় খরগোসের মতো মুখ লুকিয়ে নিজেদের মান বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয়। জীবনের স্রোত অপ্রতিরোধ্য, সত্যের জ্যোতি অত্যন্ত তীব্র—ফলে আড়াল টেনে কেউ-ই নিজেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারে না। এই অবস্থা মারাত্মক কষ্টকর। কারণ বিরোধ তখন শুরু হয়ে যায় নিজের মধ্যেই, সকলের মধ্যে থেকেও সে একা হয়ে যায়; একাকিত্বের বুক-চাপা কষ্ট তাকে গুমরে গুমরে মারে।

আমরা অনেক সময় নিজেকে নিজে বুঝতে পারি না—অসংলগ্ন ব্যবহার করি। অপরের যে-ভুলকে অন্যায় মনে করি, নিজের ক্ষেত্রে সেই অন্যায়কে ভুল মনে করে ক্ষমা করি। নিজের চারপাশে একটা গণ্ডি টেনে দিই—কিছুতেই তখন আর বাইরের দৃষ্টি দিয়ে নিজের চেহারাটা দেখতে পাই না। ফলে ভুল ক'রে হোঁচট খাই, হোঁচট খেয়ে ভুল করি—কিন্তু পতন আর ঠেকাতে পারি না। শিল্প-কর্মে সব সময় সকলকে সচল থাকতে হয়—প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অধিকার অর্জন করতে হয়, অধিকার বজায় রাখতে হয়। গায়ের বা মুখের জোরে না—কাজের জোরে। নতুন ক'রে বার বার শিল্পের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, সত্যকে আবিষ্কার করতে হয়, প্রতিষ্ঠা করতে হয়। না হ'লে পিছিয়ে পড়তেই হবে—নানা আবর্জনা তখন তাকে ঘিরে ধরবে, ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবে তাকে।

যেমন সমাজ-জীবনে, তেমনি সংগঠনে কিছু লোকের ওপর কার্য পরিচালনার ভার পড়ে, যাদের ক্ষমতার ওপর দলের সৌষ্ঠব অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাদের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিও দলকে সময় বিশেষে প্রভাবিত করে। নিয়ম তৈরি করা এবং নিজেরা তা যথাযথ মেনে আদর্শ-স্বরূপ হয়ে ওঠা প্রাথমিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। দল আগে তারপব ব্যক্তি, তা সে যে-ই হোক—এই কথা মনে রেখে কাজ করলে প্রয়োজনের সময় ঠিক ব্যক্তি-বিশেষই দলের আগে যায়, নতুবা জোর ক'রে এগুতে গেলে জোরটাই প্রকট হয়ে পড়ে—এতে দলের সমৃদ্ধি তো হয়-ই না—এমন কি ব্যক্তিও বেশি দিন সামনে থাকতে পারেন না। তবে এ কথার সত্যতা বোঝা যত সহজ—সংযত হওয়া ঠিক ততই কঠিন। কারণ এ এক দুর্জয় মোহ—অদম্য তার আকর্ষণ। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস, নিজের এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ, দলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা না থাকলে এ দুরত্যয় মোহ কাটানো সম্ভব নয়।

সংগঠনে একই লোকের দুটো সত্তা পাশাপাশি কাজ করে—ব্যক্তি হিসাবে, দলগত-সভ্য হিসাবে। সমস্ত কাজের মধ্যে এই দুটো সত্তাই প্রকাশ পায়। তার আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা এবং দলগত জিজ্ঞাসা ও দলগত সমালোচনা, দুই-ই কাজকে সাহায্য করে। প্রথমটায় সে নিজেকে দেখতে পায়, আর পরেরটায় সে দলকে দেখতে পায়—এই দু'য়ে মিলে সে সত্যকে বুঝতে পারে। এ না হয়ে, এর যে-কোনো একটার সমালোচনা হ'লে, হয় সে আত্মপ্রসাদে মগ্ন হবে—নয় অবসাদে ডুবে যাবে; এ দু'টোর পরিণামই মৃত্যু। নিজেকে নিজের মোহ এবং তার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে দৃষ্টির স্বচ্ছতা আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসর্বস্বতা, দল এবং ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে এ রোগ সব সময় সংক্রামক নয়—দলের কর্ণধারদের এ রোগ হ'লে এর সংক্রামকতা বৃদ্ধি পায়—এবং তখন তার প্রতিকার প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

তবে এর অন্য একটা চেহারাও আছে। সেটা হ'লো কেবলমাত্র গণতন্ত্র বা সাম্যের দাবিতে যখন কেউ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন সে-ও আবার কাজকে ব্যাহত করে। কারণ এখানেও সে আত্মকেন্দ্রিক, নিয়ম-সর্বস্ব হয়ে পড়ে। সমস্ত কিছুর আইনগত বা নিয়মগত ত্রুটিবিচ্যুতির দিকেই তার লক্ষ্য থাকে এবং সব সময়ে আইনের প্রশ্ন তুলে কাজের লোকের বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। যেমন ব্যবহারিক জীবনে, তেমনি সংগঠনে সব কাজ সকলে পারে না বা করেও না—এই সত্যকে মেনে নিয়ে এবং নিজের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখলে, স্তরভেদের সঙ্কীর্ণতা মনে স্থান পায় না। কাজের প্রতি

শ্রদ্ধা এবং নিজের প্রতি আস্থা হারালে মনে গ্লানি আসে, যা সময়ে সচেতন না হ'লে তাকে টেনে নিচে নিয়ে যেতে বাধ্য।

আমরা প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। শিল্প-সংগঠনে সমস্যা কিছু ভিন্ন; তবু মোটামুটিভাবে সাংগঠনিক সমস্যার চেহারার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। সকলেই জানি যত সহজে দল গড়ে ওঠে, ভেঙেও যায় ততই সহজে। সচল এক দলের সঙ্গে থেকে এবং বিভিন্ন সংগঠনের সংস্পর্শে আসার ফলে দল গড়া এবং ভাঙার ব্যাপারে আমার মনে যা কিছু ভাবনা এসেছে তাই আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এ-ছাড়া আরো অনেক সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিশ্চয় আছে, যা নিয়ে বিশদ আলোচনা, তর্কবিতর্কও সম্ভব—এবং প্রয়োজনীয়ও বটে; কিন্তু সে সমস্ত ক্রমশ আলোচ্য হওয়াই ভাল।

উপসংহারে বলা যায়, যৌবন যেমন সব প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ ক'রে জীবনকে জয় করতে পারে, স্রোতস্বিনী যেমন পঙ্কের আবিলতাকে অতিক্রম ক'রে নিজের বেগে ছুটে যায়, তেমনি সচল এক প্রতিষ্ঠানও নিজের গতিতে, নিজের প্রাণশক্তিতে সমস্ত কিছু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে আপন কক্ষপথে চলতে থাকে, অবশ্য যতদিন তার প্রাণ থাকে। জরা এবং মৃত্যু নানা ছদ্মবেশে আমাদের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়; অসতর্ক হয়ে যতটা দুর্বল হই, ততটাই প্রশ্রয় পায় সে। তার বেশভূষা যতই মনোরম হোক না কেন, সে মৃত্যুরই পরোয়ানা নিয়ে আসে—এসে সে সৃষ্টির সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট ক'রে দেয়। সেই জরা-মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে আমরা জীবনের মধ্যে শিল্পকে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, মহত্তর জীবনের আস্বাদ পেতে চাই; তাই এত ভাবনা, তাই এত কাজ।

রচনাকাল : ১৯৫৮
বহুরূপী পত্রিকা/৬ সংখ্যা

এই যৌথ শিল্পকর্ম

সূর্যোদয়ের সংগে সংগে আমাদের দিন শুরু হয়। এক একটা দিন এক একটা ছোটো ছোটো অধ্যায়। এই রকম অসংখ্য ছোটো ছোটো অধ্যায় মিলে মানব-সভ্যতার সূর্যোদয় থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত পৃথিবী এগিয়ে চলেছে—নিজের অনিবার্য গতিতে। এরই মধ্যে আমাদের মতো অসংখ্য মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে—জীবন উপভোগ করছে। প্রতিটি দিনের গ্রন্থনেই যুগ থেকে যুগান্তরে চলা; প্রতিটি মনের বন্ধনেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তরণ। এখানে ব্যক্তিও বড়, সমষ্টিও তাই। একে অপরের সম্পূরক। সেই কারণেই সমাজ ও সভ্যতা গভীর থেকে গভীরতর ব্যাপ্তির সন্ধান পাচ্ছে: জীবন ও শিল্পে দেখি তারই প্রকাশ।

সূর্যোদয়ের মধ্যে আমরা নতুন ক'রে জীবন ও শক্তি পাই; নতুন ক'রে বাঁচবার ইচ্ছা, ভালবাসবার ইচ্ছা, কাজ করবার ইচ্ছা পাই। আর তারই প্রকাশ হয় শিল্প-কর্মে। দিনের শেষে যেমন আর একটা দিন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তেমনি নতুন তার সজীবতার শেষে আর এক নতুনকে জন্ম দেয়—এই হ'লো জীবন। তাই জীবনের শেষ যেমন বলা সম্ভব নয়, শিল্পের শেষ কথা বলাও তেমনি অসম্ভব।

নাচ-গান, আবৃত্তি-বাজনা, ছবি—সমস্তই আমাদের মনের প্রকাশ। এর যে-কোনো একটার মাধ্যমেই আমরা জীবনকে উপলব্ধি করতে পারি—নিজেকে প্রকাশ করতে পারি। আর এ সমস্ত শিল্পই একত্র হয়েছে নাট্যাভিনয়ে। তাই তার গভীরতার সীমা নেই।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীতে নাট্যাভিনয় চলে আসছে। আমাদের দেশেও তাই। কিন্তু ঠিক কী ভাবে বা ঠিক কোন সময় এর উৎপত্তি তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই, তেমনি মতভেদেরও শেষ নেই।

প্রত্যেকটি দেশের, প্রত্যেকটি জাতির রীতি-নীতি, ভাবধারা, তার ধর্ম-কর্ম, চিন্তা সবই শিল্পের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে বিভিন্ন

'বেদে' ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবন-ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। এবং এই সমস্ত 'বেদ' থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে, যেমন—'ঋক্‌বেদ' থেকে পাঠ, 'সামবেদ' থেকে গান, 'যজুর্বেদ' থেকে অভিনয় এবং 'অথর্ববেদ' থেকে রস সংকলন ক'রে পঞ্চম বেদ 'নাট্য-শাস্ত্র' তৈরি হ'লো। আমরা সৃষ্টির আনন্দ পেলাম—মুগ্ধ হ'লাম।

অন্যান্য শিল্পের মতো নাট্যশিল্পেরও তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক—দু'দিকের উৎকর্ষের চেষ্টা আদিকাল থেকে স্বাভাবিক ভাবেই চলে এসেছে এবং তা চলেছে পৃথিবীর সর্বত্রই। বহু শিল্পের সংযোজনে এই নাট্য শিল্প সমৃদ্ধ। আর তাই এর উৎকর্ষ-সাধন বহু আয়াস-সাধ্য।

চিত্র-শিল্পীর ছবি, গায়কের গান, আবৃত্তিকারের পাঠ, নৃত্যশিল্পীর নাচ, এ সবেতেই তাঁরা একা, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে করতে পারেন, কিন্তু নাট্যাভিনয়ে অন্য সকলের সঙ্গে এঁদেরও প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ভাবে নয়, মূল কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, একে অপরের পরিপূরক হিসাবে। নাট্যকার, অভিনেতা, বিভাগীয় শিল্প-নির্দেশকের সম্মিলিত প্রয়াসে এই যৌথ শিল্পকর্মটি সম্পূর্ণতা পায়।

একের বেশি কাজ নাট্যাভিনয়ে—তাই একের বেশি লোক এতে একত্র হয়। স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে সংগঠন। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মন নিয়ে আসে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ক্ষমতা নিয়ে আসে—তাই এর জটিলতাও বাড়ে। আমাদের বার বার ক'রে ভাবতে হয় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র লোকের কথা, বিভিন্ন বিভাগীয় শিল্পের কথা। কারণ বিভিন্ন লোক নিয়েই সংগঠন, বিভিন্ন বিভাগীয় শিল্প নিয়ে নাট্যাভিনয়। তাই নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনার দুটো সাধারণ দিক আছে। এক, সাংগঠনিক দিক; আর অন্য, তার প্রযোজনার দিক। যত দিন এই দু'য়ের মধ্যে সমতা থাকে ততদিন কাজ সুষ্ঠু ভাবে হয়—তার পরে ভাঙন ধরে।

যে কোনো জিনিসে, যে কোনো কাজে, যেখানেই একের মধ্যে বহুকে ধরার বা বহুর মধ্যে বিশেষকে উপলব্ধির প্রয়োজন ঘটে, সেখানেই জটিলতা বাড়ে, কারণ তার প্রসার অনেক। প্রতিটি মুহূর্তের সার্থকতার মধ্যে আসে দিনের সার্থকতা, দিনের সার্থকতার মধ্যে মাসের—এই ভাবে বৎসর থেকে বৎসর, যুগ থেকে যুগান্তরে চলা। আর তখন যুগের আলোচনায় হয়তো অনেক মুহূর্ত স্থান পায় না—কিন্তু তাতে তার দাম নষ্ট হয় না। কারণ লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত প্রাণ দিয়েছে বিরাট মুহূর্ত গড়ে তোলার কাজে—যা নিয়ে যুগাবসানে এত তর্ক, এত আলোচনা। তাই মুহূতেরও যেমন দাম, যুগেরও তেমনি। একক

বাদ দিলে অন্যের অস্তিত্ব থাকে না—অন্যকে বাদ দিলে একের আলোচনা চলে না।

নাট্যাভিনয় দেখতে আমরা যখন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসি—তখন থেকেই আমাদের মন ক্রমশ একাগ্র হয়ে ওঠে। সামনে মঞ্চ, পর্দা দিয়ে ঢাকা। পাশে আমাদেরই মতো শত শত দর্শক। আলো জ্বলছে, লোকে কথা বলছে—গল্প করছে, হাসছে। আস্তে আস্তে প্রেক্ষাগৃহের আলো কমতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়; ক্ষণকাল থাকে সেই অবস্থায়, সমস্ত লোক নিস্তব্ধ, চোখ কান এবং মন নিবদ্ধ হয় মঞ্চের দিকে। আস্তে আস্তে পর্দা উঠতে থাকে। নাটকীয় ভাবে আরম্ভ হয় নাটকের।

দর্শক এবং অভিনেতাদের রসগ্রহণ এবং বিতরণের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে অভিনেতারা অভিনয় করেন। সেক্ষেত্রে দর্শকরাও সমস্ত মন, সমস্ত একাগ্রতা না দিলে পারস্পরিক আদান-প্রদানে ব্যাঘাত ঘটে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা, বিক্ষিপ্ত মন, সঙ্গী-দর্শক—সব ভুলে যেতে হয় প্রেক্ষাগৃহের আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে। তখন কেবল তিনি একা, সামনে দেখছেন এক জীবন্ত কাহিনী, নাটকের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে। দর্শক আর অভিনেতাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা অতি প্রয়োজন।

যেমন দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তেমনি নাটকের বিভিন্ন অর্থ, গভীরতা ও ব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য বহুবিধ আঙ্গিকের সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে। আর সেই জন্যই মঞ্চসজ্জা, সংগীত, আলোকসজ্জা, পোশাক সমস্ত দিয়ে গড়ে তোলা হয় অনুষ্ঠান। কখনো মঞ্চে গড়ে তোলা হয় বিরাট প্রাসাদ—কখনো বা পাহাড়-পর্বত, কখনো বা মঞ্চ খালি থাকে তার শূন্যতা নিয়ে। মঞ্চে উঁচুনিচু নানা স্তর সৃষ্টি করা হয় প্রসারতা বা বিভিন্ন আকৃতির জন্য কিংবা দৃশ্যসজ্জাকে আরও গভীর ক'রে তোলার জন্য।

তেমনি কখনো সাধারণ আলো ব্যবহার করা হয়, কখনো সমস্ত আলো কমিয়ে বিশেষ বস্তুর ওপর আলোক নিবদ্ধ করা হয়। প্রয়োজনে আলোতে বিভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়। কখনো আলো খুব প্রখর, কখনো-বা ঢিমে। আলো কাব্য প্রকাশ করে, নাটকে ব্যাপ্তি আনে। রূপসজ্জা ও চরিত্র প্রকাশে সাহায্য করে। পূর্বযুগে যা মুখোশের সাহায্যে করা হতো। আবাহসঙ্গীতও নাটকে গভীরতা প্রকাশে সাহায্য করে।

নাট্যকার নাট্য-কাহিনীতে তাঁর উপলব্ধি, তাঁর জীবন-দর্শন বলেন। অভিনেতারা সেই কাহিনীতে উদ্বুদ্ধ হন—বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণ করেন নিজের

মতো করে। কিন্তু আর এক তৃতীয় ব্যক্তি আছেন যিনি নাটকের রস উপলব্ধি ক'রে পুরো চেহারাটা কল্পনা করেন। নাটকে যা বলা থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে না-বলা; তিনি সেই না-বলা আর বলার সামঞ্জস্য খুঁজে বার করেন এবং নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ, আলো ও সংগীতশিল্পীদের সকলের চিন্তাবোধ ও কাজের মধ্যে যোগসাধন ক'রে সেই নাটক প্রযোজনা করেন এবং সাধারণ্যে উপস্থাপন করেন। নাটকই হ'লো এক্ষেত্রে মূলকেন্দ্র। তাই সকলের চিন্তা যত কেন্দ্রাভিমুখী হয় ততই এর সাফল্য আসে এবং তার পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেই তৃতীয় ব্যক্তি, যাঁকে আমরা আজকাল পরিচালক বা নির্দেশক ব'লে থাকি।

এই সব বিভিন্ন অংশের সাহায্য নিয়ে নাট্যাভিনয় গভীর হয়—বাদ দিলে তার অঙ্গহানি হয়। যে কোনো নাটকের বিশেষ দৃশ্য আমরা কল্পনা করতে পারি। 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি অপেক্ষা করছেন জয়সিংহের জন্যে। জয়সিংহ আজ রাজরক্ত আনবে—আজই শেষদিন—জয়সিংহ কখনো মিথ্যা বলে না, সে নিশ্চয় আসবে। আর রঘুপতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সে রক্ত রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হবে। কিন্তু রাজরক্ত আনতে গিয়ে যদি সে কোনো বিপদে পড়ে! রঘুপতি কালী-উপাসক—কালীকে ডাকতে থাকেন। অন্তরে তার চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কার ঝড় চলছে। বাইরেও তখন ঝড়। এই প্রচন্ড সুন্দর নাটকীয় দৃশ্য কেবল সমতল মঞ্চের ওপর সাধারণ আলো দিয়ে উপস্থাপন করলে নাটকের যে গভীরতা প্রকাশ পাবে, তার চেয়ে মঞ্চে দেব-মন্দিরে অর্ধেক আলো, অর্ধেক অন্ধকার; বাইরে ঝড়-বিদ্যুতের মাঝখানে রঘুপতির আকুল উদ্বেগ অনেক বেশি নাট্য-ভাবনাকে প্রকাশ করবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া—সমস্ত তৈরি হয়ে যায়। জয়সিংহ যখন আসে, ঝড়ের মতো আসে—'নাটক' তার চরম মুহূর্তে ওঠে। এই কাব্য বা শিল্প-প্রকাশে বহু সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রয়োজন হয়—যাকে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা যায় না; করলে অর্থহীন মনে হবে। সমস্ত মন দিয়ে, একাগ্রতা দিয়ে এই রকম অসংখ্য সূক্ষ্ম কাজের সাহায্যে রূপ ও রসকে একসূত্রে গাঁথা হয়; গড়ে তোলা হয় এক বিরাট শিল্প যা আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি।

শিল্পের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনবেদ প্রকাশ করে। নাট্যাভিনয়েও তাই। সেখানে নাটক ও তার অভিনয়ই হ'লো মূল কথা। এ দু'য়েরই ব্যাপ্তি অনেক—তাই বহু আঙ্গিকের সাহায্য নিয়ে এর গভীরতা প্রকাশ করা হয়। ভুল হয় তখন, যখন একে অন্যকে ছাপিয়ে উঠতে চায়; আর নাটক তখনই মার খায়। বিভিন্ন বিভাগীয়-শিল্পের সংযোজনার ফলশ্রুতি এই নাট্যশিল্প, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মুস্কিল হয় যখন চিত্রশিল্পীকে দিয়ে কেবল ছবি আঁকাতে চাই, নৃত্যশিল্পীকে দিয়ে নাচ দেখাতে এবং সঙ্গীতশিল্পীকে দিয়ে কেবল গান গাওয়াতে

চাই। বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে ছবি, গান বা নাচ আসতে পারে কিন্তু এর বাইরেও তাদের কাজ আছে—এবং সে কাজই বেশি। বিভিন্ন দৃশ্যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কম্পোজিশনের প্রয়োজন; শিল্পীদের অবস্থান এবং তাদের গতিবিধির সচলতার সঙ্গে যাকে যুক্ত করা যায়। এমন কি যেখানে কেবলমাত্র কালো পর্দার সাহায্যে অভিনয় হয় সেখানেও কম্পোজিশন তৈরি করতে হয় এবং এই কাজে আলোকশিল্পী, নৃত্যশিল্পী সকলেরই প্রয়োজন। সংগীতশিল্পীর সাহায্য প্রয়োজন হয় সুর-বোধের জন্য, সুর-সৃষ্টির জন্য—যা নাটককে ব্যঞ্জনাময় ক'রে তোলে। এই ভাবেই সমস্ত বিভাগ যুক্ত হয় নাট্যাভিনয়ে। নাট্যশিল্প এইভাবেই আদিকাল থেকে এগিয়ে এসেছে।

যেমন প্রথমে খালি উৎসব হতো, পরে গল্প জুড়ে নাটক তৈরি হতে থাকলো, ফলে লোক বাড়লো। মঞ্চে বেশি লোক আসাতে কম্পোজিশনের প্রয়োজন ঘটলো—দৃশ্যসজ্জা তৈরি হ'লো; পোশাক, রূপসজ্জা, আলো—সব একে একে জুড়তে লাগলো—নাটক সম্পূর্ণ চেহারা পেল।

শিল্পী তাঁর কাজের সুবিধার জন্য যখনই যা প্রয়োজন বোধ করেছেন সেই ভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকের সংযুক্তি ঘটাচ্ছেন। ন পাল্টাচ্ছে, যুগ বদলাচ্ছে, মানুষের মন নতুন চেহারা নিচ্ছে, আর শিল্পী সেইভাবে নতুন নতুন পথে এগিয়ে চলেছে। তাই এই কাজে যাঁরাই যুক্ত—সে যে-কোন বিভাগে হোক না কেন, তাঁরা সৃষ্টির আনন্দ পান, প্রত্যেকদিন তাঁরা নতুন ক'রে বাঁচতে থাকেন।

সংগঠনও এই ভাবেই গড়ে; তার কাজও ঠিক এই ভাবেই হয়। অভিনয় যৌথ শিল্প। তাই সকলেই নিজের নিজের তাগিদে এসে জড়ো হয়। কেউ-বা নাটক লেখে, কেউ-বা অভিনয় করে, অনেকে আবার নির্দেশনার কাজ নেয়। বিভিন্ন বিভাগীয় শিল্পের প্রয়োজনেই বিভিন্ন লোকের একত্রীকরণ। কারো কাজ মঞ্চ নিয়ে, কেউ-বা আলোর কাজে সাহায্য করে, আবার অনেকে ব্যবসায়িক দিকই দেখে—এইভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলে নিজের নিজের কাজ ক'রে চলে।

কারো কাজ প্রকাশ্যে, কারো কাজ অন্তরালে। কেউ-বা সামনে আসে, কেউ-বা ভেতরে থাকে। যে যার জায়গায় থেকে নিজের নিজের কাজ করে, সংগঠন চালায়। তাই নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষের জন্য যেমন তার প্রয়োজনার কথা ভাবতে হয়, ঠিক তেমনি. সংগঠনের কথাও ভাবতে হয়। বহুলোকে একত্র হয় এ-কাজে—বিভিন্ন তাদের সত্তা, বিভিন্ন তাদের প্রকাশ-ভঙ্গিমা। নাট্যাভিনয়ে যেমন অনেক বিভাগ, সংগঠনেও তেমনি অনেক কাজ। নাট্যাভিনয়ে

যেমন সমস্ত বিভাগীয় শিল্পের কথা ভাবতে হয়, সংগঠনেও তেমনি সমস্ত লোকের কথা ভাবতে হয়। সকলকে দিয়ে সব কাজ করানো যায় না, আবার একজনকে দিয়েও সকল কাজ সম্ভব নয়—তাতে অকাজের সম্ভাবনাই বেশি। একে অপরকে সাহায্য করে, একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যায়। সকলের প্রচেষ্টায় সংগঠন গড়ে ওঠে—শক্তি পায়; যেখান থেকে আবার সকলে শক্তি আহরণ করে। এইভাবেই কাজ হয় এবং এই কাজেই প্রাণ থাকে; যেখানে ব্যক্তি সম্মান পায়, সমষ্টিও মর্যাদা পায়। এখানে সকলে নিজেকে জানতে পারে, অপরকেও বুঝতে পারে; এই সচলতার মধ্যেই কর্মীরা মন দিয়ে কাজ করতে শেখে।

যে কাজে এত মনসংযোগেব প্রয়োজন, এত আয়াসের প্রয়োজন, সেখানে কষ্টও যেমন, আনন্দও তেমন। আর তাই নাট্যাভিনয়ের এত মর্যাদা। এই মর্যাদা রক্ষা করতে হ'লে এবং একে আরো বাড়াতে হ'লে এই শিল্পকে আরো ভাল ক'রে বুঝতে হবে। আমরা কী চাই আর আমরা কী করি এই দু'য়ের মধ্যে মিল আনতে হবে। শিল্পী এবং শিল্প-রসিক, দর্শক ও সমালোচক—সকলেরই কাজ এটা। আধুনিক কালের চিন্তা কী ক'রে প্রকাশ পাবে, কী ক'রে নাটক আরও গভীর, আরও বিরাট জীবন প্রকাশ করতে পারবে, আমাদের তা ভাবতেই হবে। যে কালে আমরা রয়েছি তাকেও যদি আমরা সর্ব দিক দিয়ে সার্থক ক'রে তুলতে না পারি, সে লজ্জা একালের সকলের। আমরা আমাদের কাজের মধ্যে বাঁচতে চাই। আজকের কাজই কাল আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। তাই কেবলমাত্র নিজস্ব গতির ওপর ছেড়ে না দিয়ে আরও সংহত হতে চাই—আরও এগিয়ে যেতে চাই।

রচনাকাল: ১৯৫৯
বহুরূপী পত্রিকা/৯ সংখ্যা

সহজ সমস্যা

ঘরে-বাইরে সর্বত্র, জ্ঞানী-গুণী সবার কাছ থেকে চিরকাল শুনছি: 'সহজ হও'। যেমন জীবনে, তেমন শিল্পে— সহজ হওয়াটাই নাকি আসল কথা। যে যত সহজ হতে পারবে সেই নাকি ততো কঠিন কাজ করতে পারবে—অর্থাৎ শিল্পকর্ম করতে পারবে। হতে পারে; হতে পারে নয়—নিশ্চয়ই তাই, কারণ সবাই যখন বলছে এই একই কথা। কিন্তু চিরকালই জানি কঠিন কোনো কাজ করা কত কঠিন। আর সহজ হওয়াই যদি সেই কঠিন কাজ করার উপায় হয় তাহলে সহজ হওয়াটা যে-কোনো কঠিন কাজের চেয়েও কঠিন।

আমরা যে সমাজে যে অবস্থার মধ্যে বাস ক র সেখানে সহজতার কোনো চিহ্ন নেই। সবাই যেন এক একটা মুখোশ ..টে ঘুরে বেড়াই। আর এই মুখোশ আঁটার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে ঢেকে ফেলি। তারপর সেই ফর্মা-মাফিক কাজ করি। সহজে হাসি না পেলেও হাসি, ভালো না মনে করলেও প্রশংসা করি, বুঝতে না পারলেও উপদেশ দিই। অর্থাৎ চলতি সমাজে কায়দা-মাফিক নিজেকে চালিয়ে দিই। তারপর এমন একদিন আসে যখন এই মুখোশটাকেই 'আমি' বলে মনে হয়, আমার নিজত্বকে আমি আর চিনতেও পারি না, প্রকাশ করতেও পারি না। আর এই অবস্থায় যদি কোনো দিন কোনো বড় ঘটনায় মনের গভীরে নাড়া খাই, তখন ভেতরের 'আমি' আর বাইরের 'আমি'-তে বিরোধ বাধে—ছট্‌ফট্‌ করে উঠি। নিস্তব্ধ রাতে নির্জনে একলা ব'সে যখন নিজের দিকে তাকাই তখন তফাৎ বুঝতে পারি; অসহায় ভাবে যেন 'আমিত্ব' আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয় পাই নিজের নগ্ন রূপ দেখে। তাড়াতাড়ি তাকে ঢেকে সহজ (!) হবার চেষ্টা করি—মুখোশটা এঁটে ফেলি। এই হ'লো যেখানে অবস্থা, সেখানে সহজ হতে বলা মানে খালি নিস্ফল উপদেশের জন্যেই তা বলা—যা মানবার কোনো দরকার নেই, শুধু শোনা এবং শোনাবার জন্যেই যেন কেবল তা বলা।

এই অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত। তাই এখানে কাউকে সহজ সরল ভাবে কথা বলতে শুনলে তাকে বোকা বলি। কেউ হয়তো রসিকতার চেষ্টা করেছে,

আমরা সবাই হাসছি—কারণ এইটেই তো প্রথা। আর সে যদি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে (রসবোধের অভাবে), তাতে আমরা আবার অবাক হয়ে যাই—ভাবি সে বুঝতেই পারলো না; একটু কৃপাদৃষ্টিতেই তাকে দেখি। আর সে-ও যখন বুঝতে পারে তার সহজ ভাবটাই তাকে মর্যাদা দিচ্ছে না, তখন তাড়াতাড়ি সহজ, সরল চেহারা নষ্ট ক'রে একটা মুখোশ আঁটে। আমরা বলি: 'ক্রমে ক্রমে মানুষ হচ্ছে'। এই মুখোশটা যে যত কায়দা-মাফিক লাগাতে পারে তার স্টাইল ততো বেশি।

যে সহজ মুখ আমরা ঢেকে ফেলি, তার শত-সহস্র রূপ। প্রতিটি ঘটনায়, প্রকৃত মন সাড়া দেয়—যার ছাযা পড়ে তার মুখে। সে হাসতে পারে, কাঁদতে পারে, রাগতে পারে, ভালোবাসতে পারে। সবটাই সে নিজের মতো করেই করে। কিন্তু মুখোশের এত রূপ কোথায়? সে বাঁধা পথে চলে, বাঁধা পথে পা ফেলে। কী করলে কী হয় সব তার পাঁজি-পুঁথিতে লেখা—তার বাইরে যায় সাধ্য কী!

এ রকম অবস্থায় যখন কোনো লোক চারপাশের এই অসহজ চেহারায় বিরক্ত হয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে তখন সে সত্যিই সকলকে বিব্রত করে। বাঁধা কথা সে বলে না, ভালো-মন্দর সহজ বুলি সে বলে না, নিজে না বুঝে দাগা বোলায় না। সে হয়ে ওঠে সকলের কাছে মূর্তিমান বিদ্রোহ। অবশ্য একটা বয়সে ছেলে-মেয়েদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই পাগলামি দেখা দেয়—আবার কিছুদিনের মধ্যেই সেরেও ওঠে। তারপর বাজার থেকে এক একটা মুখোশ এঁটে সংসারে প্রবেশ করে এবং শেষ-গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। কিন্তু ঐ বয়সের পরেও যারা নিজেদের পাগলামি জিইয়ে রাখে তাদের লোকে একটু অবাক হয়েই দেখে—ছেলেমানুষ মনে করে। কোনো সাধারণ অংকে তাদের ফেলতে পারে না, চালু প্রথায় তাদের ধরতে পারে না, তাই সহজে তাদের মানতেও পারে না, আবার এড়াতেও পারে না। বিরোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবশেষে একদিন আসে যখন পুরানো লোকেদের অভ্যাস হয়ে যায় তাকে দেখতে দেখতে। নতুনের দল তাকেই অনুসরণ করে। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে সেও নিজের অজ্ঞাতেই নিজের একটা চেহারা তৈরি ক'রে নেয়—শেষ পর্যন্ত যার আড়াল থেকে সেও আর বার হয়ে আসতে পারে না। মুখোশের বাইরে থেকে নিজেকে দেখতেই পায় না। ক্রমশ সে-ও গিয়ে পুরানো দলেই আসন নেয়। আবার শুরু হয় মুখোশ ছেঁড়ার পালা।

এই হ'লো আমাদের অবস্থা; আর সমাজের চেহারা। এরই মধ্যে নাটক। সেই নাটকে সহজ হওয়া কঠিনতর সমস্যা।

নাটক জীবন নিয়ে, নাটকে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আর তাই জীবনের সমস্ত জটিল-চেহারাই আমরা সমস্ত মহৎ নাটকেই দেখতে পাই। জীবনে যে যত সরলীকরণ পছন্দ করে, সাদা-সাপ্টা নাটকই তার তত বেশি ভালো লাগে এবং বলা বাহুল্য এরকম লোকই বেশি। সে রকম নাটকের সংখ্যাও যথেষ্ট। তবু সবাই বলেন: 'আমাদের দেশে নাটক নেই'।

আসল কথা—জীবনের জটিলতা বুঝতে, সত্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আমরা ভয় পাই। ক্ষমতার অভাবেই নয়, আয়াসের অভাবেও। সস্তায় কিস্তিমাৎ এবং নিশ্চিত ফললাভের চেষ্টাতেই আমাদের মন থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন বুঝতে পারি কিস্তিমাৎ আমার দ্বারা হ'লো না—নিশ্চিত ফললাভও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তখন আর নতুন ক'রে খাটবার সাহসও হয় না, বয়সও থাকে না। ফলে নানাপ্রকার মুষ্টিযোগের সাধনা করি—যদি কিছু হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি তাতে কী হয়। অথচ যাঁরাই সার্থক-পুরুষ তাঁদের দিকে তাকালেই দেখতে পাই সমস্ত জীবন ধ'রে কী কষ্ট তাঁরা স্বীকার করেছেন। ফলস্বরূপ অনিশ্চিত নিশ্চিত-রূপে এসেছে তাঁদের সামনে।

আমরা জানি সব, কিন্তু মানি না। তলিয়ে কোনদিন বুঝবার চেষ্টা করি না। আমরা কোনো ভালো অভিনয় দেখলে মুগ্ধ হই, কিন্তু কেন সেটা ভালো বুঝতে পারি না। বুঝতে কেউ সাহায্যও করে না। ফলে, যখন নিজেরা অভিনয় করতে যাই, পারি না। তখন মুষ্টিযোগের সাধনা করি। বড় অভিনেতাদের অভিনয় মনে করবার চেষ্টা করি: তাঁরা রাগলে কী করেন, কেমন করে হাসেন, কী করে আবেগ প্রকাশ করেন। তাছাড়া নানা ধরনের অভিনয় দেখে, নানা বিবরণ থেকেও আমাদের মনে কিছু বাঁধা-মূলধন জমা হয়ে যায়—যা থেকে আমরা জানি রাগলে চোখ বড় করতে হয়; কষ্ট পেলে খাদের পর্দায় গলা নামাতে হয়, মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়; বিরহীকে উদাস দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকাতে হয়; আর ভিলেন হ'লে পাইপ (অভাবে সিগারেট) মুখে দিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে হয়, এক ভ্রূ উঁচু ক'রে আস্তে আস্তে পা ফেলে চলতে হয়। এসব হ'লো আমাদের বাঁধা মূলধন—যার নমুনা যে কোনো থিয়েটারে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

এই দেখেই আমরা শিখি। সুতরাং কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে প্রথমেই ভাববার চেষ্টা করি আমার প্রিয় কোনো বড় অভিনেতাকে। মনে করতে চেষ্টা করি এরকম চরিত্রে তিনি কী-ভাবে অভিনয় করতেন, কী ক'রে কথা বলতেন, কী ক'রে চলাফেরা করতেন। একবার কল্পনায় এসে গেলেই, আমরাও সেই রকম ক'রে করবার চেষ্টা করি। এই হ'লো চালু প্রথা।

আর যাঁরা এভাবে করতে চান না, ভাবেন নিজের মতো ক'রে করবো, তাঁরাও ঐ পুরানো স্টক থেকেই ঝেড়ে-বেছে, পছন্দমত মুদ্রা ব্যবহার ক'রে চরিত্র-মাফিক লাগিয়ে দেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেন তিনি কারও নকল করেন না, চরিত্রকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তাতেও কোনো নতুন চেহারা প্রকাশ পেল না। পুরানোই—শুধু একটু রকমফের হয়ে প্রকাশ পেলো। ফলে সে সৃষ্টি মহৎ হয়ে উঠলো না।

কী ক'রে ভালো অভিনয় করা যায়—কী ভাবে অভিনেয় চরিত্রকে বিশেষ চরিত্র-রূপে প্রকাশ করা যায়, তা অংক কষে বলা সম্ভব নয়। কারণ ভালোভাবে অভিনয় করা, ভালোভাবে জীবন-যাপন করার মতই কঠিন; বহু সমস্যা, বহু জটিলতায় ভরা। তাই বোধহয় সকলের ওই সহজ হবার উপদেশ। গলা সহজ হবে, বলা সহজ হবে, চলা-ফেরা—সব কিছুই সহজ হবে। সহজ না হ'লে গভীরের সেই মন কিছুতেই নিজেকে এবং তার আসল আবেগকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে না—সে বড় লাজুক।

অভিনয়-চেষ্টার প্রথম পর্যায়ে আমরা না পারি নিজেকে প্রকাশ করতে, না পারি চরিত্রকে প্রকাশ করতে। নিজের ও অভিনেয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ধাক্কাধাক্কি করায় দু'টো-ই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে—ফলে অভিনয় জমে না, নিজেদেরও আড়ষ্ট লাগে। যে-গলা কল্পনা করি, আর যে-গলা বার হয়, তা এক নয়—যে আওয়াজ আসে সে যেন আমার নয়; নিজেকে অসহায় মনে হয়। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পুরো নাটক বুঝতে গিয়ে তল না পেয়ে, সব ছেড়ে নিজের অংশই তৈরি করার চেষ্টা করি। কিন্তু ক্রমশ সেখান থেকেও সরে আসি। টুকরো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে নিই—ব্যাস, সহজ হয়ে আসে। তখন বুঝতে পারি এবার আমার রাগ করার পালা, আর অপেক্ষা ক'রে থাকি সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্যে—যখন আমি রাগে চিৎকার ক'রে উঠবো। যখন দুঃখের অংশ আসে, অপেক্ষা করি সেই সময়ের জন্যে যখন দুঃখে ভেঙে পড়বো, হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠবো। আবার কোনো দৃশ্যে পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাসির প্রস্তুতিতে সমস্ত ক্ষণ প্রতীক্ষা করি। অভিনয়ান্তে ভাবি আমার সফল অভিনয়ের কথা, যাকে আমি বহু চেষ্টায় জীবন্ত ক'রে তুলেছি; কিন্তু হয়নি। অভিনয় দেখে সবাই বলে অসংলগ্ন, রক্তমাংসে গড়া কোনো মানুষ প্রকাশ পায়নি—কেবল প্রকাশের কায়দাটা প্রকাশ পেয়েছে। —শুনে রাগ করি আর বন্ধুজনেদের বোঝাবার চেষ্টা করি—ভালো অভিনয় সকলে বোঝে না। কারণ আমি যে অভিনয় বুঝি এবং তা করতে পারি—এ ধারণা আমার হয়ে গেছে—সুতরাং আমার সেই অভিনয় যদি কারো ভালো না লাগে, তার একটি মাত্র কারণ—সে

অভিনয় বোঝে না। এতে অপরের ওপর আস্থা কমে, কিন্তু নিজের ওপর বাড়ে—ফল তার যাই হোক।

আরও বিপদ আছে। ছোট ঘরে মহ্‌লা দিয়ে পার্ট তৈরি করি। মঞ্চে ঢুকে দেখি—অনেকটা জায়গা আমাকে হাঁটতে হবে। কিন্তু কী ক'রে হাঁটবো—সে চেষ্টা তো কোনোদিন করিনি। হাঁটার কথা যে ভাবতে হবে, জীবনে তা-ই কোনোদিন ভাবিনি। জীবনে কোনো কথা ভাবতে শেখার আগেই হাঁটতে শিখেছি। তারপর রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে কত যে হেঁটেছি, তার ইয়ত্তা নেই—যার হিসাব রাখলে হয়ত দেখা যেত উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু পর্যন্ত হাঁটা হয়ে গেছে। কিন্তু মঞ্চে ঢুকে কয়েক পা—এটাই যে প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে এ কোনোদিন ভাবিনি। মনে হয় কোনো রকমে গিয়ে কোথাও বসে পড়তে পারলে বাঁচি, আড়ষ্টতা কাটবে। আর হাত দুটো যে অভিনেতাদের বিব্রত করবার জন্যেই আছে, মঞ্চে ঢুকেই যেন বুঝতে পারি। তাকানোর কথা ছেড়েই দিলাম। কারণ আমরা বেশির ভাগ সময়েই সহ-অভিনেতার দিকে তাকাই না। বলতে একটু ভুল হ'লো, তাকাই, কিন্তু দেখি না।

হাত-পা, চোখ-মুখ বাদ দিয়ে আর যাই হোক, অভিনয় তো হয় না। সুতারাং এরা থাকবেই এবং এ সত্ত্বেও ভাবতে হবে কী ক'রে সহজ হয়ে ভালো অভিনয় করতে পারি—চরিত্রকে জীবন্ত করতে পারি।

আমার এতো কথা বলার একমাত্র কারণ যে, আমরা বেশির ভাগ সময়েই বুঝতে পারি না আমরা অসহজ কোথায়। আসলে বুঝতে পারি না জীবনে সহজতার সঙ্গে গভীরতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। যে কোনোদিন জীবনের গভীর সত্য উপলব্ধি করলো না, সে সহজ হবে কী ক'রে? আর সহজ না হ'তে পারলে গভীরতাকে প্রকাশ করবে কী ক'রে? আর সেই জন্যেই 'মুড'-এর দোহাই দিই। 'ইমোশনে'র কথা বলি। 'মুড' বা 'ইমোশন'কে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছি না—বলতে চাচ্ছি 'মুড'-এর প্রতীক্ষায় ব'সে থাকলে আমাদের এ স্বল্পমেয়াদী জীবনে কুলোবে না। আর কেবল 'মুড' বা 'ইমোশনে'র কাঁধে চড়ে জিতে যাবো—এ না ভাবাই ভালো। তার চেয়ে আমাদের মাথার ঘাম নিশ্চয় বেশি সাহায্য করবে। তাছাড়া 'মুড' বা 'ইমোশন' আসবে কী ক'রে, নিজের মনের গভীরতল সহজে এবং চেষ্টা করে নাড়া দিতে না পারলে?

যে নাটকে আমায় অভিনয় করতে হবে তা যখন আমার ভালো লাগে এবং যে চরিত্র আমাকে অভিনয় করতে হবে তাও যদি আমার পছন্দ হয়, তাখনই বুঝতে পারি আমার ভেতরের মনটা সায় দিয়েছে। অর্থাৎ আমি সে নাটকের ঘটনা এবং চরিত্র সত্য বলে মনে করছি। কখনো তার চেহারা স্পষ্ট

দেখতে পাই, কখনো অস্পষ্ট। তখন সহজ হবার পালা শুরু হয়। ভেতরের মনটাকে ছাড়ার প্রয়োজন হয়। এই বোঝাপড়ার চেষ্টা আবেগ বা অগভীর মন দিয়ে নয়—যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিযে। একেবারে টেকনিক্যাল লোকের মতো, কোনো অস্পষ্টতা না রেখে যদি প্রত্যেকটি স্তর দেখতে দেখতে যেতে পারি তাহলে সমস্ত ঘটনার জোড়গুলো নজরে পড়ে, বুঝতে পারি নাটক কেমন ক'রে অনিবার্য পরিণতির দিকে যাচ্ছে। যেখানে মেলাতে পারি না সেখানে ভাবতে হয়, আলোচনা করতে হয়, যে ক'রে হোক আমার মতো ক'রে নাটক বুঝতেই হয়, না হ'লে আমার কাজে ফাঁকি থাকবেই। ঠিক এমনি ক'রে চরিত্রটাও দেখতে পাই।

কিন্তু এ-তো গেল বুঝতে পারার কথা। বুঝতে পারলেই কি করতে পারি? তখন শুরু করি নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা। এখানেও শুরু হয় সেই টেকনিক্যাল লোকের মতো চেষ্টা। ব্যক্তিগত জীবনে তো আমি কখনো-সখনো প্রাণ খুলে হাসি, লোককেও তো হাসতে দেখি; তখন গলা থেকে ঠিক কোন আওয়াজটা বার হয় আমাকে ভেবে ভেবে সেটা বার করতে হয়। তারপর চেষ্টা ক'রে যদি হাসির সময় আমার গলাকে ঠিক সেই সেই পর্দায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে দেখি আমার প্রাথমিক কাজ হয়ে যায়। ঠিক এই রকম ক'রে প্রত্যেকটি পদে চেষ্টা করতে হয়। তারপর আসে জোড় মেলাবার পালা।

হাঁটা চলার ব্যাপারেও তাই। ঘরে বা রাস্তায় যখন চলাফেরা করি তখন আড়ষ্টতা বোধ করি না—কিন্তু মঞ্চে ঢুকেই আড়ষ্ট হয়ে যাই, কেন? ঘরে বা রাস্তায় যখন চলতে হয় তখন যে কারণে হাঁটি তা আমার কাছে স্পষ্ট থাকে। তাই চলার সময় হাঁটার কথাটা ভুলে যাই। হঠাৎ যদি দেখতে পাই রাস্তার সমস্ত লোকজন আমাকে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে যাই—সমস্ত চিন্তা সরে গিয়ে খালি মনে হয় আমাকে লোকে দেখছে, তখনি আড়ষ্ট হয়ে যাই। এরকমটাই হয় অভিনয়ে। মঞ্চে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাকে দেখছে—এই ভাবনা থেকেই আমার আড়ষ্টতা, যা কোনো সময়ে কাটতে চায় না। চলতে গিয়ে পা কাঁপে, সোজা হতে গিয়ে বেঁকে যাই, জোর ক'রে সহজ হতে গিয়ে আড়ষ্ট হই। আর বাড়ির অবাধ্য ছেলের মতো হাত দু'টোও যেন কিছুতেই কথা শুনতে চায় না। কখনো নড়ে ওঠে, কখনো বুকের কাছে বোতাম ধ'রে খোঁটে, কখনো বা পেছনে চলে যায়; সুযোগ পেলেই সে দুটোকে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। তাই যদি মঞ্চে ঢোকবার আগে যে কারণে এ দৃশ্যে আসছি সেই কারণটাতে সম্পূর্ণ মন দিতে পারি, তাহলেই সহজ হতে পারি। তখন আর বিচ্ছিন্ন ক'রে হাঁটার কথাটা মনে আসে না, তখন আমি একটা বিশেষ চরিত্র—অনিবার্য প্রয়োজনেই এখানে এসেছি, আর সেই প্রয়োজনের

তাগিদে চলা-ফেরা করছি, কথা বলছি, সমস্ত কাজ ক'রে যাচ্ছি—সেই চরিত্রের মতো করেই, তখন আর আড়ষ্টতা বোধ করি না।

অভিনয়ের আগে, দিনের পর দিন গলা তৈরি করেছি এই খেয়াল রেখে যে অন্তত আটশো লোককে কথা শোনানো চাই; বসা, চলাফেরা তৈরি করেছি যাতে সবাই দেখতে পায়; সমস্ত কথা মুখস্থ করেছি যাতে মঞ্চে ঢুকে ভাবতে না হয়। এ সমস্ত প্রায় অঙ্ক কষার মতো ক'রে চেষ্টা করেছি। মঞ্চে যখন প্রবেশ করি তখন অন্য সমস্ত কথা, ভাবনাচিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে সেই দৃশ্যে আসার কারণটাই খালি মনে রাখি। এক একটা ঘটনা ঘটে, আমিও সেইমত ব্যবহার কবি, কথা বলি। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটাই মুখে আসে, ঠিক কাজটাই ক'রে যাই—প্রত্যেকটা সময়ই নতুন ব'লে মনে হয়। আমি সহজ হয়ে যাই।

এ সব আমরা জানি—এর বাইরেও অনেক অনেক কিছু জানি কিন্তু কিছু করতে পারি না। পারি না, তার কারণ জীবন সম্পর্কে বোধ আমাদের কম। জীবনে গভীরতার চেয়ে সস্তা, ভাসা-ভাসা পথই আমরা বেছে নিই, তাতে কষ্ট কম কিন্তু সহজেই লোককে চমক দেওয়া যায়। হিসাব ক'রে পা ফেলি—যখন চুপ ক'রে থাকি তখনও। যখন চিৎকার করি তখনও নিজেকে উপলব্ধি নয়, প্রচারই হয় কাম্য।

মহলার সময়ও নিজেকে ছাড়তে পারি না—খালি মনে হয়, আমার হচ্ছে না—সবাই কী ভাবছে, হয়তো ঠাট্টা করছে—ঠিক যেমনটি হয় আমাদের ব্যবহারিক জীবনে। আমাদের ভয়: আমাদের মনের নানা ধরনের ভাব বা কথা যদি ঠিক ঠিক না বোঝাতে পারি, লোকে আমাকে বোকা মনে করবে—আর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে যাই। নিজেকে বোঝার এবং বোঝাবার ক্ষমতাটা না বাড়িয়ে গাম্ভীর্যের একটা মুখোশ টেনে দিই। লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে ভদ্রতা করি, পড়াশুনা করি, সবজান্তার ভান করি। ময়লা গেঞ্জির ওপর ধোপদুরস্ত জামা গায়ে দেবার মতো অসংস্কৃত মন এবং চেহারাটাকে কায়দা ক'রে ঢেকে রাখি। প্রতিপদে ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে, তাই প্রতিক্ষণে চেষ্টা করি নানান কায়দায় নিজেকে জাহির করার—ফলে আড়ষ্টতা বাড়তেই থাকে।

মানি, আর না-ই মানি, আমরা এগুলো জানি। আর যখন জানি একবার সহজ হবার চেষ্টা করতে দোষ কী? অভিনয় আমি করতে চাই, আমি ভালো অভিনয় ক'রে বাঁচতে চাই—তাই আমার ভালো লাগাটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমারই। চারপাশের সস্তা চমক লাগানো মোহ থেকে যত সরে আসতে পারি ততই মঙ্গল, লোককে এ-কথা যতই বোঝাতে পারবো, ততই আমার

ভালো, ততই আমাব কাজ কবাব ক্ষেত্র প্রসাবিত হবে। সেক্ষেত্রে যদি আত্মস্থ হযে বোজই চেষ্টা কবতে থাকি, পথ একদিন পাবোই। কতটা যেতে পাববো তা কেউ জানি না, কিন্তু যতটাই পাবি, ততটাই ভালো, ততটাই আমাব পবিচয—মানুষ এবং শিল্পী হিসাবে।

বচনাকাল: ১৯৬০
বহুৰূপী পত্রিকা/১১ সংখ্যা

আলাপরত: শম্ভু মিত্র, বিষ্ণু দে, অমব গঙ্গোপাধ্যায

আমাদের রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীর বছর এই ১৯৬১ সাল এবং এই জন্মশতবর্ষ পালন করবার জন্য লোকে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, কাগজে-পত্তরে মায় অপিসে-আদালতে পর্যন্ত এই এক আলোচনা। কোন গোষ্ঠী কোন নাটক করছেন, কোন ছোটো-গল্পকে নাট্যরূপ কে দিচ্ছেন, কে কোন কবিতা থেকে নাট্যসূত্র নিয়ে নাটক রচনা করছেন—এই রকম হাজারো খবর রোজ পাওয়া যাচ্ছে। এই উৎসব-পালন কেবল কলকাতা বা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই—সমস্ত ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে যেন এক জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

এত অসংখ্য অনুষ্ঠান দেখে কিন্তু কয়েক বছর আগেকার চেহারাটা আন্দাজ করা যাবে না। সাধারণ্যে রবীন্দ্রনাথ তখন এত জনপ্রিয় ছিলেন না। কিছু কিছু গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ-উপন্যাস বা নাটক সবাই পড়তেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য তা নিয়ে আলাপ আলোচনাও করতেন; কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই অন্তর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ও বিশেষ কেউ করতেন না। যা হতো তা শান্তিনিকেতনে এবং কিছু কিছু লোকের বাড়িতে বা ঘরোয়া আসরে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর বহু নাটকই অভিনীত হয়নি। কারণ রবীন্দ্রনাটক তার ধরনে এবং তার গঠনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চালু নাটক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল এবং সেই ধরনের সঙ্গে নাট্য-প্রযোজক এবং থিয়েটারের সাধারণ দর্শক কেউ-ই অভ্যস্ত ছিলেন না; আর তাই বলা হতো রবীন্দ্রনাটক দুর্বল—দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ নেই, সাংকেতিকতায় ভরা, অভিনয় ক'রে জমেনা, লোকের ভালো লাগে না ইত্যাদি হাজারো রকমের কথা। আবার যাঁদের মনে হতো রবীন্দ্রনাটক অশেষ গুণসম্পন্ন—তাঁরা আবার নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ফলে প্রযোজনা করতে পারতেন না এবং কখনো-সখনো করলেও তাঁদের প্রকাশ-ক্ষমতার অভাবে নাটকের সম্পূর্ণ চেহারা প্রকাশ পেতো না। শেষ পর্যন্ত ওই কথাই চালু হতো: রবীন্দ্রনাটক জমেনা, লোকের ভালো লাগেনা ইত্যাদি। আর তাই বহু নাটক থাকা সত্ত্বেও লোকের

কাছে 'বিসর্জন', 'চিরকুমার-সভা', 'শেষ রক্ষা', 'গৃহপ্রবেশ', 'রাজা ও রানী' 'ডাকঘর' এই রকম কয়েকটি নাটকই সুপরিচিত ছিল। এর মধ্যে আবার মাত্র কয়েকটিকেই মঞ্চসফল মনে করা হতো। দশ-পনেরো বছর আগে পর্যন্তও প্রায় এই অবস্থাই ছিল। আর আজ? রবীন্দ্রনাথের এমন নাটক খুব কমই আছে যা এ-বছর অভিনীত হবেনা। এর মধ্যে কিছু হুজুগ নিশ্চয় আছে, 'ভাদুরে দলের' সীমা-পরিসীমাও হয়তো নেই। কিন্তু তবু সবাই চেষ্টা তো করছে। সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই এই অদ্ভুত পরিবর্তন।

নতুন ক'রে নাটককে বোঝবার, জীবনের সঙ্গে তাকে মেলাবার যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এই শতকের চতুর্থ দশকে, তারই সিঁড়ি বেয়ে আজ আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এই প্রসঙ্গেই 'বহুরূপী'র রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের প্রচেষ্টা এবং তার অভিজ্ঞতা আলোচনা করা যেতে পারে।

দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৪৮ সালে পুরানো নাটক 'নবান্ন' পুনরাভিনয় করে, ১৯৪৯ সালে নতুন নাটক 'পথিক' করে আমরা পরিচিত হয়েছি, তারপর 'উলুখাগড়া'য় নাম হয়েছে এবং ১৯৫০ সালে 'ছেঁড়াতার' আমাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের প্রতিটি রবিবারের সকাল নিয়ে নিউ এম্পায়ারে নাট্যোৎসব করে 'বহুরূপী' প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাগজে-পত্তরে সর্বত্রই 'বহুরূপী'র প্রশংসা।

১৯৫১ সালে আলোচনা হয় রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' নিয়ে। ভাবতে নিজেদেরই চমক লেগেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা আর নাটক পড়া হয়েছিল। এই 'চার অধ্যায়' নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। এতে নাকি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি, তার নেতাদের প্রতি, কর্মিবৃন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ রয়েছে, যা দেশের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। আর তাই এযাবৎকাল 'চার অধ্যায়' কোণঠাসা হয়ে ছিল। যখন 'চার অধ্যায়' অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করি, আজও মনে আছে—সকলে বিরক্ত হয়েছিলেন। শুধু প্রবীণেরা নন, নবীন বন্ধুরাও। যাঁরাই কোনো না কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মনে হতো রবীন্দ্রনাথ এতে কেবলমাত্র তদানীন্তন আন্দোলনের অসারতার কথা বলেছেন। এ নাটক অভিনয় করা অন্যায়। তাছাড়া এর অভিনয় লোকের ভালো লাগবেনা—এ নাটক জমবে না। আর যাঁরা খালি সাহিত্যচর্চা করতেন তাঁরা বললেন: এর ভাষা কাব্যময়—এতে কোনো ঘটনা নেই, খালি কথা আর কথা; এ সব পড়ে লোকের যতোটা ভালো লাগে অভিনয় দেখে ততোটা ভালো লাগা সম্ভব নয়। তাছাড়া নাট্যরূপ কে দেবে? এ ধরনের বহু কথা উঠতে লাগলো। আমরা একটু বিব্রত বোধ করতে

লাগলাম। অথচ আমাদের মনে কিন্তু এসব প্রশ্ন জাগেনি। মনে হচ্ছিল না কোনো ভুল কাজ করছি। তবু সমস্যায় পড়লাম।

'চার অধ্যায়' অভিনয় করার কথা প্রকৃতপক্ষে মাথায় এসেছিল শম্ভুদার। যেমন তাঁর মাথায় এসেছিল 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা'র কথাও। 'চার অধ্যায়' নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে; আমরা এতে জীবন দেখতে পেলাম। মানুষের বাঁচা, তার আত্মসম্মান, তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ভালো-মন্দয় মেশানো তার দেশের লোক—সবই এতে স্পষ্ট। আর সবচেয়ে যা স্পষ্ট তা হ'লো—এরই মধ্যে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের গভীর ভালবাসা। একে রূপায়িত করার মধ্যে কোনো অন্যায় খুঁজে না পেয়ে আমরা হাজির হলাম মহর্ষির কাছে। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সেদিনকার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী তিনি, সাহিত্য এবং নাট্যাভিনয়ের সঙ্গেও দীর্ঘকাল ধরে সার্থকভাবে যুক্ত। সর্বোপরি তিনি 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। সুতরাং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমরা তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিন সব শুনলেন, দীর্ঘ সময় আলোচনা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন: 'করো করো, আমাদের কর্তব্যের খাতিরেই 'চার অধ্যায়' অভিনয় করা উচিত, অন্যায়ের কথা উঠতেই পারে না।' আমরা উৎসাহিত হলাম। নাট্যরূপের জন্য আমাদের ভাবতে হয়নি। কারণ, বিবরণ ও নির্দেশনা যা আছে তা বন্ধনীর মধ্যে নিয়ে গেলেই হবে—'চার অধ্যায়' সম্পূর্ণ নাটক আকারেই আছে। শুধু প্রথম ভূমিকাটুকু সূত্রধারের সাহায্যে যুক্ত করা হ'লো।

তারপর এলো সেই ১৯৫১-র ২১শে আগস্ট, 'চার অধ্যায়'-এর প্রথম অভিনয়-রজনী। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই। ১৯৫০ সাল থেকে আমরা 'অনুগ্রাহক-সদস্য'-প্রথা প্রবর্তন করেছি। যখনই আমরা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন বা নাট্যাভিনয় করি, তার প্রথম দিনেই আমরা 'অনুগ্রাহক সদস্য'দের ডাকি। তাঁরাই হন আমাদের অভিনয়ের প্রথম দর্শক। তাঁদের কাছ থেকে সমালোচনা নিয়ে, প্রয়োজন মতো সংশোধন ক'রে আমরা সাধারণ্যে অভিনয়ের ব্যবস্থা করি। সেই মতোই ২১শে আগস্ট শ্রীরঙ্গমে 'চার অধ্যায়'-এর প্রথম অভিনয়-দিন ধার্য হ'লো। 'অনুগ্রাহক সদস্য' সংখ্যার চেয়ে শ্রীরঙ্গমের আসন সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় আমরা অনুগ্রাহকদের বন্ধু এবং তাঁদের পরিচিতদের জন্যও কিছু টিকিটের ব্যবস্থা রাখলাম এবং সেই খবর যথারীতি তাঁদের জানালাম। খুবই আশ্চর্য হলাম, সমস্ত টিকিট এক-আধ দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হতে দেখে। প্রথম দিনেই এত উৎসাহ, কৌতূহল এবং টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি, এরপর মাত্র একটি নাটকেই দেখেছি, সেটা হ'লো 'রক্তকরবী'। 'পুতুল খেলা'তেও হয়েছে, তবে এত নয়।

একটা কথা চালু আছে—‘বাদুড় ঝোলা’। অস্বাভাবিক ভিড় বোঝাতে ওই কথা বলা হয়ে থাকে। ‘চার অধ্যায়’-এর দিনও সেই অবস্থা। অভিনয় আরম্ভের আগে রবীন্দ্ররচনাবলীতে ‘চার অধ্যায়’ প্রসঙ্গে যে কাহিনী রয়েছে সেটি পড়া হ’লো। তারপর সূত্রধারের ভূমিকা। সূত্রধারের পাঠে যেখানে এসে এলা এবং ইন্দ্রনাথের কথোপকথন শুরু হয় সেখানে সূত্রধারের পাঠ শেষ হয় এবং অদৃশ্য থেকে মাইকের সাহায্যে এলা এবং ইন্দ্রনাথের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের অভিনয় শুরু। সূত্রধার সরে আসে, পর্দা সরে যায়, দেখা যায়—কানাই গুপ্তর চায়ের দোকান। তারপর এলার ঘর। তারপর অতীনের গোপন ডেরা, পরের দৃশ্য এলার বাড়ির ছাদ। বাহুল্যবর্জিত দৃশ্য-সজ্জা। কিন্তু গভীর এবং ব্যঞ্জনাময়। এলার ঘরের দেওয়ালে সরু কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাকড়শার জাল আঁকা হয়েছিল। কয়েকটি অভিনয়ের পরেই সেটি অবশ্য বাহুল্যবোধে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের শেষে এবং তৃতীয় দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্যে যাবার সময় ও নাটকের শেষে গানের সুরের সঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি ও গুলির আওয়াজ দিয়ে নাটকের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা হ’লো। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে অবশ্য গানের শেষে সূত্রধারের সাহায্যে গল্পের খেই ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোটামুটি এই ভাবে প্রযোজিত হয়ে যখন অভিনয় শেষ হ’লো তখন লোকে প্রথমে কিছুটা চুপ—পরে গুঞ্জন ক’রে উঠলেন। কেউ বললেন ভালো, কেউ বললেন মন্দ, কেউ বললেন ঠিক নয়—সেই আগেরই সমস্ত কথা। কিন্তু অনেকেই বোধহয় ভেতরে ভেতরে গভীর নাড়া খেয়েছিলেন। তাঁদের সেই বিচলিত চোখ মুখ, গভীর সহানুভূতি দেখে আমরা বুঝলাম, আমাদের শ্রম একেবারে নিরর্থক হয়নি।

তারপর একে একে সমালোচনা পেতে লাগলাম। সমালোচনায় নাটক সম্পর্কেই আপত্তি বেশি, কিন্তু প্রয়োগ-কৌশল ও অভিনয়ের প্রশংসা হতে লাগলো। আমরা সাধারণের জন্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করলাম। সাধারণ লোক কিন্তু গভীর ভাবে মুগ্ধ হ’লো। তারা অতীন এবং এলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলো। মহৎ ট্র্যাজেডির শেষে মন যেমন নিছক বিষন্নতায় এবং করুণরসেই ভরে ওঠে না—বিষাদে হাহাকার ক’রে ওঠে, অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্তর আপ্লুত হয়ে যায়, ‘চার অধ্যায়ে’র শেষেও ঠিক সেই ভাবেই লোককে বিচলিত হতে দেখেছি। এ নাটক কলকাতায়, কলকাতার উপকণ্ঠে, দূর মফস্বলে এমনকি বাংলাদেশের বাইরেও বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি অভিনয় শেষে দর্শকদের এই বিচলিত অবস্থা লক্ষ করেছি।

'বহুরূপী'র এই প্রথম রবীন্দ্রনাটক অভিনয়, আর প্রথম অভিনয়েই রবীন্দ্রনাটকের সুষ্ঠু প্রয়োগপদ্ধতি, বাচনভঙ্গি এবং অভিনয়রীতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো লোকের মুখে মুখে। কাব্যময় ভাষা তার ব্যঞ্জনা নিয়েই সহজভাবে উচ্চারিত হতে থাকলো, তার গাম্ভীর্য নষ্ট হ'লো না, আবেগ থাকলো কিন্তু অত্যন্ত সহজ আর দৈনন্দিন ব্যবহার্যের ভাষাই মনে হতে লাগলো। দেশের সাধারণ লোক ও জীবন—এ দু'য়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোথায় এক যোগসূত্র পাওয়া গেল।

যারা 'চার অধ্যায়' লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই দোষারোপ করেছেন তাঁরা যে এ নাটক অভিনয় করার জন্য আমাদেরও তিরস্কার করবেন তার আর আশ্চর্য কী? কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রানুরাগী এবং যাঁরা প্রগতিবাদী তাঁরাও যখন একে মহত্তর প্রয়াসের অভাব বলেন, তখন গোলমাল লাগে। আজ দীর্ঘদিন হ'লো আমরা এ নাটকের অভিনয় ক'রে চলেছি—জানিনা তাঁদের মত আজ কিছুটা বদলেছে কিনা। এই হ'লো 'চার অধ্যায়' নাটকের অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এরপর প্রায় তিনবছর রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক অভিনয় ক'রে উঠতে পারিনি। মধ্যে অভিনীত হয়েছে 'দশচক্র', 'স্বপ্ন', 'এই তো দুনিয়া', 'ধর্মঘট' প্রভৃতি নাটক।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিক। 'বহুরূপী'তে মহলা শেষ হয়ে গেছে—সবাই বাড়ি চলে গেছে—কেবল আমরা এক-আধজন তখনো রয়েছি। নানান নাটক নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—হঠাৎ শম্ভুদা বললেন, 'রক্তকরবী' অভিনয় করলে বেশ হয়। আমরাও বাড়ি ফেরার পথে পা বাড়াচ্ছিলাম—নতুন নাটকের গন্ধ পেয়ে জমে বসলাম; শম্ভুদা বলে গেলেন তাঁর কী কল্পনা 'রক্তকরবী' সম্পর্কে। এ পর্যন্ত যত নাটক নিয়ে আলোচনা হয়েছে কোনোটার প্রয়োগ-পরিকল্পনা আমাকে এতটা মুগ্ধ করেনি। পুরো 'রক্তকরবী' স্পষ্ট হয়ে গেল। তার প্রত্যেকটি ঘটনা, তার প্রত্যেকটি চরিত্র, তার সমস্ত কথাবার্তা সবই যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো।—আজও মনে আছে, সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম গভীর রাতে। পরদিনই নাটক পড়া হ'লো; কিন্তু প্রয়োগ-পরিকল্পনার কথা কিছু আলোচিত হ'লো না। তার পরদিন আবার পড়া হ'লো—সকলেই উল্লসিত। এই নাটকই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো। কেবল 'চার অধ্যায়' থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তার ফলে এ নাটকের কথা আর বাইরে কোথাও আলোচনা করা হ'লো না এবং স্থির হ'লো—আগামী রবীন্দ্রজন্মদিনেই এ নাটক আমরা মঞ্চস্থ করবো।

চললো অভিনয়ের প্রস্তুতি। মাঝে মাত্র একমাস সময়। এই বছরেই জানুয়ারি মাসে মহর্ষির আকস্মিক মৃত্যুতে দলের ক্ষমতা কমেছে কিন্তু উদ্যম কেড়ে নেযনি উপরন্তু দায়িত্ববোধ বেড়েছে; সবাই মন-প্রাণ ঢেলে দিলো। কখনো সকালে, কিংবা দুপুরে, আবার সন্ধ্যায, কখনো বা সমস্ত দিন মহলা চলতে লাগলো। নাটক বোঝা হচ্ছে, মঞ্চসজ্জার কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, পোশাক কিংবা আলোর পরিকল্পনা চলছে—সে এক নেশার মতো। যারা অভিনয় করবে তারাই অন্য সমস্ত কাজ করবে, সুতরাং বিশ্রামের অবসর কোথায়? চললো হাড়ভাঙা খাটুনি, পুরো একটা মাস।

প্রস্তুতির প্রথমদিকে অভিনয় করতে সকলের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। নাটক এবং তার সমস্ত পাত্রপাত্রী, তাদের কথাবার্তা ভীষণ অসহজ মনে হচ্ছিল। তখনই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটক, গল্প, প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা শুরু হ'লো। একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথের লেখার ধরন, তাঁর নাটকের গঠন স্পষ্ট হতে থাকলো, তবু রবীন্দ্রভাষা উচ্চারণে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। কর্কশ হবেনা, আবার অহেতুক সুরের টান আসবে না, চরিত্রের জীবন্ত উত্তাপের পরিচয় থাকবে কথাবার্তার মধ্যে—এ এক আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অসম্ভবও প্রায় সম্ভব হতে থাকলো।

এরপরই এলো মঞ্চসজ্জা, আলো, পোশাক প্রভৃতির পরিকল্পনা। এ বিষয়ে এ পত্রিকারই পূর্ববর্তী কয়েকটি সংখ্যায় বিশদ আলোচনা হয়েছে, সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি করছি না। কেবল কয়েকটি সমস্যা আর কয়েকটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলি। সমস্যা হয়েছিল রাজার পোশাক নিয়েই বেশি। নন্দিনীর শাড়ির রঙও অবশ্য একটু চিন্তায় ফেলেছিল। নাটকে আছে অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে বলেন—'ওই দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?'

পুরাণবাগীশ—'একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড পরা।'

সুতরাং ধানী রঙের শাড়ি হবে বোঝা গেল। কিন্তু ধানী রঙ বলতে কী বোঝায়? কাঁচাধানের রঙ? না, পাকা ধান? দু'রকমেরই ব্যবহার দেখা যায়। নাটকে বারবার করে পাকা ধানের কথাই বলা আছে, সুতরাং আমরা শাড়ির রঙ কতকটা পাকাধানের মতোই করলাম।

আর অন্যান্য চরিত্রের পোশাকের চিন্তা আমাদের ততটা বিব্রত করেনি। কারণ সে সমস্ত চরিত্রের পোশাক-আশাক, নাটকের এবং তার প্রয়োগ-পরিকল্পনার মূল সুরের সঙ্গে এক করেই দেখতে পেয়েছিলাম। সর্দার কিংবা খোদাইকর, অধ্যাপক কিংবা পুরাণবাগীশ—এসব চরিত্রের চেহারা আমাদের কাছে স্পষ্টই হয়েছিল। বিশু মনে যাই হোক, সেও একজন খোদাইকর শ্রমিক, কিশোরও

তাই; ফাগুলালও তাই। সুতরাং পোশাক ভাবতে আমাদের সময় লাগেনি।

আর রূপসজ্জার মধ্যে প্রথম দু'টি অভিনয়ে গোঁসাই-এর লম্বা দাড়ি ছিল, তৃতীয় অভিনয়রাত্রি থেকে তা উঠে গেল—চাঁছাছোলা মুখ, কপালে তিলক, গায়ে নামাবলি, হাতে কণ্ঠির মালা। কয়েকটি অভিনয়ে বড় সর্দারের গোঁফ ছিল—পরে তাও গেল। আর অধ্যাপকের পরিষ্কার মুখে গোঁফ দাড়ি উঠলো কয়েকটি অভিনয়ের পরেই।

এরপর বলি রাজার কথা। রাজার পোশাক নিয়ে আমরা আকাশ-পাতাল চিন্তা করেছি। এ রাজাতো ঘোড়ায় চড়া মুকুটপরা রাজা নয় যে চিরাচরিত প্রথায় রাজা সাজাবো। কী পোশাক নিলে রাজার সঠিক চেহারাটা প্রকাশ করা যায় কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিলনা—এ রাজা বিজ্ঞানের প্রতিমূর্তি, কিন্তু এ রাজা আবার পূজায় যায়—'ধ্বজা-পূজা'। অবশেষে বহু ভেবে-চিন্তে এবং প্রায় কোনো কূল না পেয়ে গরদের ধুতি পরিয়ে এবং গায়ে চাদর দিয়ে রাজাকে প্রকাশ করা হ'লো। প্রথম দু'টি অভিনয় এই পোশাকেই হ'লো। তার পরের অভিনয় থেকেই শুরু হ'লো রাজার পোশাক বদল, একটার পর একটা। তার কারণ এবং বিবরণ পরে বলছি। রাজার রূপসজ্জার অবস্থাও তাই। প্রথম কিছুদিন রাজার গোঁফদাড়ি কিছুই ছিল না—পরে জমকালো গোঁফদাড়ি এলো নতুন পোশাকের সঙ্গে। আবার কিছু দিন পরে দাড়ি-গোঁফ ত্যাগ করা হ'লো; এখন সেই অবস্থাই চলছে অর্থাৎ রাজার মুখে দাড়িগোঁফ নেই। তাছাড়া আগে মঞ্চের আলোয় রাজাকে স্পষ্ট দেখা যেতো। আজকাল রাজার মুখে কোনো আলো দেওয়া হয় না।

এবারে নাটক সম্পাদনার ব্যাপারে দু'একটা কথা বলে নিই, তাহলে পরে অনেক ব্যাপার বুঝতে সুবিধা হবে। যাঁরা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা জানেন, প্রায় সমস্ত নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রেই একটু-আধটু কাটাকুটি করতে হয়, প্রয়োজন বোধে সকলেই এটা ক'রে থাকেন। আমাদেরও কিছু কাটাকুটির প্রয়োজন ঘটলো। কিন্তু এক-আধটা লাইনও আমরা নিজেরা তৈরি ক'রে বলিনি, এ ক্ষেত্রে সে কথাই ওঠেনা।

মাত্র একমাসের মধ্যেই সমস্ত তৈরি করতে হ'লো। যত কল্পনা ছিল সবটা করা হয়ে উঠলো না, অনেক কিছু বাদ গেল। ৮ই মে কোনো মঞ্চ খালি না পাওয়ায় ১০ই মে প্রথম অভিনয়-দিন ধার্য হ'লো। স্থান—শিয়ালদা ই. বি. আর. ম্যান্‌সন্ ইন্‌স্টিটিউট্। অভিনয়ের সাতদিন আগে যথারীতি 'অনুগ্রাহক-সদস্য'দের কাছে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হ'লো। এই প্রথম লোকে জানলো 'বহুরূপী' 'রক্তকরবী' অভিনয় করছে। লোকের কৌতূহল ছাপিয়ে

উঠলো। আগের যে-কোনো নাটকের চেয়ে উৎসাহের প্রকাশ বেশি ক'রে ঘটলো—'চার অধ্যায়'-এর থেকেও বেশি। 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে লোকের মন বিরূপ ছিল—'রক্তকরবী'তে তা নেই। 'রক্তকরবী' এর আগে কখনো অভিনয় হয়নি এবং এ নাটক অভিনয় করা যায় না ব'লেই লোকের ধারণা। সুতরাং এর সম্বন্ধে স্বভাবতই কৌতূহল বেশি। তাছাড়া এর আগের বিভিন্ন নাটকে 'বহুরূপী'র অভিনয়খ্যাতি, প্রয়োগ-পরিকল্পনার সুনাম ছড়িয়েছে এবং বিশেষ করে 'চার অধ্যায়' অভিনয় করার পব রবীন্দ্রভাষা উচ্চারণের খ্যাতি 'বহুরূপী'র তখন হয়েছে। এই সব নানা কারণে লোক ভেঙে পড়লো টিকিট সংগ্রহের চেষ্টায়। কিন্তু ১০ই মে ছিল আমাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান এবং ম্যান্সন্ ইন্স্টিটিউটে আসন সংখ্যা যথেষ্ট বেশি না হওয়ায় 'চার অধ্যায'-এর মতো আমরা বাইরের লোকের জন্য ব্যবস্থা করতে পারিনি। একথা জানাতে সেই দু'দিনের মধ্যেই বহুলোক 'অনুগ্রাহক-সদস্য' হয়ে গেলেন, তাঁদের অভিনয় দেখা চাই-ই। অভিনয়ের দিন সকালেও অনেকে মঞ্চে গিয়ে হাজির—'অনুগ্রাহক-সদস্য' হবার দাবি নিযে।

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে অভিনয় শুরু হ'লো। এবারেও অভিনয় আরম্ভের আগে ভেতর থেকে 'রক্তকরবী' নাটকের ভূমিকাটুকু পড়ে দেওযা হ'লো। তারপর আস্তে আস্তে পর্দা সরে গেল। একটানা অভিনয় চললো ২ ঘন্টা ১০মি:। মধ্যে কোনো ছেদ নেই, কোনো বিরাম নেই। উত্তেজিত খোদাইকরদের কণ্ঠে নন্দিনীর জয়ধ্বনি, লড়াইয়ের ডাকের মধ্যে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানের সঙ্গে শেষ পর্দা নেমে এসে মঞ্চ ঢেকে দিল। অভিনয় শেষ হ'লো। অভিনয়ান্তে শুভানুধ্যায়ীদের ভিড় জমলো সাজঘরে, সকলেই উত্তেজিত। কারো খুব ভালো লেগেছে, কেউ হতচকিত হয়েছেন, অনেকের কাছে ঠিক কী হ'লো বোঝবার আগেই নাটক শেষ হয়ে গেছে। বহু মানুষ উচ্ছ্বসিত, নানা ভাবে প্রশংসা করতে লাগলেন, অনেকে মঞ্চে ঢুকে পড়ে সমস্ত দেখতে লাগলেন, কেউ কেউ বললেন: 'রক্তকরবী'র এ চেহারা তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি—এতো আজকের দিনের সমস্ত ঘটনা। এখনকার লোকের চেহারা দেখতে পেয়ে তাঁরা বুঝতে পারছেন না—ব্যাপারটা কী হ'লো। কেউ অনুযোগ করলেন—গান কিছু বাদ গেছে ব'লে, কেউ বা বললেন—গানই তো এ নাটকের আসল, সুতরাং গান বাদ দেওয়াতে এর নিশ্চিত অঙ্গহানি হয়েছে। প্রথম দিনের আলোচনা-সমালোচনা এইভাবেই হতে থাকলো, কিন্তু সকলেই উত্তেজিত। উত্তেজিত আমরা, উত্তেজিত দর্শক, উত্তেজিত মঞ্চের কর্মীরা। বহু রাতে আমরা ফিরলাম। আমাদের অবস্থাও কতকটা হতচকিতের মতো। ঠিক কী করে ফেলেছি বুঝতে পারছি না, তবে কিছু একটা ঘটে গেছে তা স্পষ্ট হচ্ছে। এইভাবেই

সকলে 'বহুরূপী'তে ফিরলাম। কে কী শুনেছে সেই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, আবার আলোচনা, আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

১৪ই মে দিন ধার্য হয়েছে 'নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে' 'রক্তকরবী' অভিনয়ের। মধ্যে মাত্র তিন দিন সময়। এই তিন দিন কাউকে ছাড়া হ'লো না। প্রথম দিনের ত্রুটিগুলো ঠিক করতে সবাই উঠে পড়ে লাগলো—ঐ দিনেই প্রথম প্রকাশ্য-অভিনয়। আর তাছাড়া ইতিমধ্যেই খবর ছড়িয়েছে 'বহুরূপী' কী এক ব্যাপার করেছে 'রক্তকরবী' নিয়ে। সুতরাং মহাজাতি সদনে প্রচণ্ড ভিড়। একইভাবে এখানেও অভিনয় আরম্ভ হ'লো—শেষও হ'লো সেই একই ভাবে। কিছুক্ষণ কোনো আওয়াজ নেই, কিন্তু পরমুহূর্তেই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো; মুহূর্তের মধ্যেই সেই গুঞ্জন প্রায় কলরবে পরিণত হ'লো। 'অদ্ভুত', 'অপূর্ব'! কেউবা বললেন—এতদিনে 'রক্তকরবী'র পুরো চেহারা দেখা গেল। আবার কেউ বললেন—এটা আর যাই হয়ে থাক 'রক্তকরবী' হয়নি। অনেকে অভিযোগ করলেন—গান বাদ দেওয়া হ'লো কেন? কেউ বললেন—কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার নিশ্চিত হয়েই কেউ কেউ বললেন—নিজেদের মতো ক'রে কথা রচনা করা হয়েছে। বহু দর্শক বললেন—ন টকের শেষে গান আছে, 'বহুরূপী' তা বাদ দিলো কেন? আবার—এ কী পোশাক হয়েছে? খাকির পোশাক খোদাইকরদের গায়ে, এ কী রকম ধারা! বিশু বাউল—তাকেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের পোশাক পরানো হ'লো! এটি একটি পৌরাণিক নাটক—এতে এ পোশাক আসে কী করে? এটা সম্পূর্ণ রূপক—এতে সাজসজ্জা কথাবার্তা সবের মধ্যেই তার পরিচয় থাকবে। সব চেয়ে বড় কথা: 'বহুরূপী' রবীন্দ্রনাথকে কম্যুনিস্ট বানিয়েছে—যা করেছে তা 'রক্তকরবী'-তে নেই; আর যা নাটকে আছে, ঠিক ঠিক ভাবে তা করেনি।

তবু কিছু লোকের কাছে এ প্রযোজনা মহৎ শিল্প-প্রয়াস বলেই মনে হ'লো। তাঁরা যেন অধীর আগ্রহে এর-ই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নাটক রচিত হবার প্রায় ৩১ বছর পর এই প্রথম এবং সার্থক অভিনয়। তাঁরা এ নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আজকের দিনের আধুনিক সভ্যতার পুরো চেহারা দেখতে পেলেন। নাটকের ছত্রে ছত্রে যে সমস্ত কথা এতদিন লুকিয়েছিল তা যেন আজ এই নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

নন্দিনীর মধ্যে তাঁরা জীবন দেখতে পেলেন, রঞ্জনের মধ্যে যৌবন। সেই রঞ্জন মারা গেল—কিন্তু নন্দিনীর মতো তাঁরাও সকলের মধ্যে রঞ্জনের প্রকাশ দেখতে পেলেন। কয়েকটি গান বাদ দেওয়ায় তাঁদের কাছে নাটকের অঙ্গহানি মনে হয় নি। তাঁদের মন ভরে উঠেছে। তাঁদের কাছে এ নাটক

পৌরাণিক নয়—এ নাটক চিরকালের আধুনিক নাটক। এর ফলে যাঁদেব নাটক ভালো লাগেনি, আর যাঁদের ভালো লেগেছে তাঁদের মধ্যে বিরোধ লাগলো। আমরাও ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। বিদগ্ধ লোকেদের মধ্যে, কাগজে-কলমে, লোকের মুখে মুখে এ নিযে বিস্তর আলোচনা চলতে লাগলো। কোথাও সমালোচনা হল: " 'বহুরূপী'র হাতে 'রক্তকরবী' অপব্যাখ্যাত হয়েছে..... পরিচালনায় যথেষ্ট নতুনত্ব ও বলিষ্ঠতা দেখানো হয়েছে সত্য.... ঐ সব পোশাক পরে রবীন্দ্রনাথেব সাংকেতিক নাটকের সংলাপ আওড়ালে নিতান্ত অদ্ভুত শোনায।" আবার কোথাও এও লেখা হ'লো: " 'রক্তকরবী' দেখে খুশি হলাম..... আমরা ববীন্দ্রনাটককে 'সিম্বলিক' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। 'বহুরূপী'র অভিনয়ে নাটকত্ব চমৎকার ফুটে উঠেছিল অথচ সিম্বলটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। এই কার্যে বাহাদুরী আছে।" অন্যত্র লেখা হ'লো: "অভিনয়ে তাঁরা নিজেদের আগেকার সব কৃতিত্বকে ছাপিয়ে তো গিয়েছেনই, এমন কি স্মরণীয় কালের মধ্যেও এমন সুতীব্র অভিনয়-নৈপুণ্য অন্য কোনো নাটকাভিনয়ে দেখা গেছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা এঁরা প্রায় হুবহু-ই অনুসরণ ক'রে গিযেছেন, কিন্তু.... 'রক্তকরবী' থেকে এঁরা নাটকীয় উপস্থাপন-চাতুর্যে রক্ত ও করবীকে দু'টিতে ভাগ করে নিয়ে করবীকে দলিত করে রক্তের লালটাই দীপ্ত করে তুলেছেন'। সঙ্গে সঙ্গে আর এক সমালোচনা বার হ'লো: "রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র মৌলিক তাৎপর্য তো আর হাতসাফাইয়ের ম্যাজিক নয় যে, এক কথায় পাল্টে দেওয়া সম্ভব..... বিশুর এই শেষ দু'লাইন ছাড়া আর সবই 'বহুরূপী' অক্ষুন্ন রেখেছেন, শেষের গানটিও আছে।" এর আগে একজন লিখেছেন: "ইহার শেষ কথা (গান), 'ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে'—সেদিনকার অভিনয় শেষে এই কথাটি শুনি নাই"।

আর একটি লেখা: "......কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তটিতে হুঁশ যখন ফিরে আসে তখন হঠাৎ মনে হয় যে, এত কৃতিত্ব দেখিয়েও নাটক থেকে যেন রবীন্দ্রনাথকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা: "সমগ্র রক্তকরবী নাটকটির যে রূপ ফুটে উঠেছে তা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।..... অনেকে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীকে বহুরূপী বিকৃত করেছেন—সব থেকে আশ্চর্য হয়েছি এই কথা শুনে। কেননা, এই রকম কথা বললে অবিচার করা হয় বহুরূপী ও বহুরূপীর চেয়েও বেশি রক্তকরবীর স্রষ্টা সম্বন্ধে।.... যদি কেউ বলেন যে, বহুরূপীর প্রযোজনা উগ্রভাবে আধুনিক হয়েছে তাহলে সমালোচকদের বলবো, আধুনিকতা বাদ দিয়ে রক্তকরবীর যে কী অপরূপ রূপ দাঁড়ায় তা নিজেরা অভিনয় করে প্রমাণ করুন।".

একটি কাগজে যে সমালোচনা বেরিয়েছিল তা নিয়ে সামান্য বাদানুবাদ হয়; সমালোচনাটি হ'লো: " 'রক্তকরবী' নাটকের সার্থকতা যে কেবল পুঁথিগত নয়, অভিনয়েও যে এব রস অব্যাহত থাকতে পেরেছে, তার একমাত্র কারণ বহুরূপী সম্প্রদায়ের অদ্ভুত অভিনয়ের নৈপুণ্য।...... শোনা যায়, বিশ্বভারতীর সঙ্গীত সমিতির কতিপয় সদস্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন রক্তকরবীর এই ধরনের ইন্টারপ্রেটেশনে। তাঁদের উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথ যখন রক্তকরবী লেখেন তখন তাঁর কলম চেপে ধরা, কারণ রক্তকরবীর ছত্রে ছত্রে নিষ্পেষিত শ্রমিকদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। এই আর্তনাদের ভাষা বহুরূপী জোগাননি।" সঙ্গে সঙ্গে সেই কাগজেই আর একজনের লেখা প্রকাশ হ'লো: " 'বহুরূপী' সম্প্রদায় নাটকটিকে যে ইন্টারপ্রেটেশন দিয়েছেন তা কদাপি সত্য নয়। ...বহুরূপী সম্প্রদায় যেহেতু বামপন্থী সেই হেতু রক্তকরবীকে তারা বামপন্থী করে তুলেছে; কংগ্রেস সাহিত্যসঙ্ঘ ইচ্ছা করলে রক্তকরবীকে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মানুষের বিদ্রোহ বলে দেখাতে পারে।" কাগজের পক্ষ থেকে উত্তর গেলো: "কংগ্রেস সাহিত্যসঙ্ঘ রাজাকে ষ্টালিনের দোসরা করে রক্তকরবীর অভিনয় করুন। ভালো অভিনয় হ'লে তারও তারিফ করবো। এই খুদে মিডিল ক্লাস এবং খুদে কম্যুনিস্টের যুদ্ধের আওতার মধ্যে আমি কোনোদিনও ছিলাম না। আজও থাকছি না।" —এই হ'লো 'রক্তকরবী' অভিনয়ের প্রথম দিককার বিভিন্ন সমালোচনার মাত্র কয়েকটির কিছু কিছু অংশ। এ থেকেই সেদিনকার ঝড়ের একটু আভাস নিশ্চয় পাওয়া যায়। কিন্তু এতো গেল কাগজে-কলমে সমালোচনার ব্যাপার। তার বাইরেও যা চলছিল সেও কিছু কম নয়। বরং তার উত্তাপ ছিল অনেক বেশি।

যাই হোক, ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা আমাদের খুবই বিব্রত করেছিল। ব্যাপারটি হ'লো—আমরা মহাজাতি সদনে অভিনয়ের পর ১১ই জুলাই অন্য একটি সংস্থার আয়োজনে নিউ এম্পায়ারে 'রক্তকরবী'র অভিনয়ের ব্যবস্থা করি। কাগজ-পত্তরে যথারীতি বিজ্ঞাপিত হয়েছে, টিকিট বিক্রিও শুরু হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ 'বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি'র কাছ থেকে ৭ই জুন তারিখের লেখা একটি চিঠি পেলাম, যাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে—"প্রকাশ্যভাবে অভিনয় করিবার পূর্বে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত সমিতির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অভিনয় করিয়া অনুমোদন লওয়া আবশ্যক।" কিন্তু এর আগেই ৪ঠা মে এই নাটক অভিনয় করার সম্মতি তাঁরা দিয়েছেন এবং প্রতি অভিনয়ের জন্য দক্ষিণার পরিমাণও ঠিক হয়ে গেছে; কোন কোন ক্ষেত্রে সে দক্ষিণাও দিতে হবে না, তাও স্থির হয়ে গেছে। সুতরাং তারপরে আবার এই চিঠি স্বাভাবতই সকলকে বিস্মিত ও বিব্রত করে তুললো এবং এই চিঠির সূত্র ধরে দীর্ঘদিন

বহু পত্রালাপ, উৎকণ্ঠা এবং নানান অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকলো। মুখ্যতঃ অভিযোগটা ছিল পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সংলাপ-এর ব্যাপারে। এমন কথা উঠতে লাগলো যে, যা নাটকে আছে তা আমরা বলিনি, যা নেই তা আমরা বলেছি। যেমন, নাটকের শেষে যে গান আছে আমরা নাকি তা বাদ দিয়েছি, উপরন্তু 'আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল' কথাটা নাকি জুড়ে দিয়েছি। এ সমস্তই তারা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনেছিলেন এবং কিছু কিছু কাগজে পড়েছিলেন। ১১ই জুলাই যে অভিনয়ের দিন স্থির হয়েছিল তা নিয়েই অসুবিধা হতে থাকলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিউ এম্পায়ারে পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় হ'লো। আমরা ঐ দিনই 'রক্তকরবী'র শেষ অভিনয় ব'লে মনে করলাম। 'সঙ্গীত সমিতি'র সদস্যরাও আমাদের অভিনয় দেখলেন। সে এক স্মরণীয় দিন। দর্শকদের মধ্যেও অনেকে জানেন এই অবস্থার কথা; 'বহুরূপী'র সকলে তো জানেই। প্রত্যেকে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করলেন। এ-যেন এক বিরাট পরীক্ষা—পরীক্ষা দর্শকদের কাছে, পরীক্ষা নিজেদের কাছে। সেদিনের 'রক্তকরবী'র অভিনয় উৎকর্ষের চরমে উঠলো। ঐ দিনের মতো অভিনয় 'বহুরূপী' তারপর খুব কমই করতে পেরেছে। অভিনয়ের শেষে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে দর্শকদের আমাদের অসহায় অবস্থার কথা জানালাম এবং ঘোষণা করলাম—হয়তো এই অভিনয়ই 'রক্তকরবী'র শেষ অভিনয়। কিন্তু না—সে দিনই শেষ অভিনয় হ'লো না, যদিও বহুদিন ধরে বহু হাঙ্গামা চলেছিল, তবু 'রক্তকরবী'র অভিনয় বন্ধ হ'লো না। সাত বছর ধরে আজও তা চলছে সমান গৌরবে।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে প্রথম 'জাতীয় নাট্যোৎসব'-এর আয়োজন হয়। 'বহুরূপী'র আমন্ত্রণ আসে সেই উৎসবে যোগদানের জন্য এবং 'রক্তকরবী' অভিনয় করার কথা ওঠে। যদিও 'রক্তকরবী' অভিনয়ের অনুমতি নিয়ে তখনো অসুবিধা ছিল, তবু শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে আমরা রাজি হই।

ঠিক হয়, আমরা ওই উৎসবে শ্রী তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' অভিনয় করবো।

সেই উৎসবে যাবার আগে আমরা একবার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। কারণ বাংলাদেশ থেকে ভারতের 'জাতীয় নাট্যোৎসব'-এ যোগদান করার অর্থ বাংলাদেশের সম্মানের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া। সুতরাং যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, যাঁরা নানান সাহিত্য ও শিল্পকর্মে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রী নন্দলাল বসু ও শ্রী রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গে আলোচনা করতে শান্তিনিকেতনে যাই। দু'জনেই আমাদের সমস্ত কথা শুনলেন

এবং উৎসাহিত হলেন। শ্রী নন্দলাল বসু রাজার পোশাকের একটা আন্দাজ এঁকে দিলেন এবং পোশাকে বিজ্ঞানের একটি প্রতীক আঁকতে বললেন। আর বললেন নন্দিনীর শাড়ির ধানীরঙ, কাঁচাধানের বঙের অনুরূপ হওয়া উচিত। সর্দারের পোশাকে তাঁর কোনো আপত্তি নেই—কারো পোশাকেই তাঁর আপত্তি হ'লো না। গভীর আগ্রহের সঙ্গেই আমাদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘসময় 'রক্তকরবী' নিয়ে আলোচনা করলেন; আমরা উৎসাহ পেলাম।

দিল্লী পৌঁছালাম। স্বল্পপরিসর মঞ্চ। অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য সমস্ত নাটকের সঙ্গে আমাদের 'রক্তকরবী' ও 'ছেঁড়াতার' অভিনীত হ'লো। এবং তার ফলাফল অনেকেই জ্ঞাত আছেন। একাধিকবার বিভিন্ন কাগজে বিশদভবে তা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং তার বর্ণনা দিয়ে এর কলেবব আর বৃদ্ধি করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই—সেদিনকার 'ছেঁড়াতার' ও বিশেষ করে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 'বহুরূপী'র হাত ধরে যে সম্মান বাংলাদেশের ঘরে এসেছে, 'বহুরূপী' তাতেই নিজেকে সার্থক মনে করেছে।

কলকাতায় ফিরে দেখি 'রক্তকরবী'র প্রযোজনা সম্বন্ধে আর কারো বিশেষ আপত্তি নেই। থাকলেও তার চরিত্র বদলে গেছে। কারও কৌতূহল বাড়লো, কারও উৎসাহ, কারও বা শ্রদ্ধা হ'লো নতুন করে। আর যাঁদের মনোভাব অপরিবর্তিত রয়ে গেলো তাঁরাও প্রকাশ্যে এ-নিয়ে আলোচনায় মুখর হলেন না। ফলে একটা সুবিধা হ'লো—'রক্তকরবী'র অভিনয় আর ব্যাহত হ'লো না।

আমরাও এই নাট্য প্রযোজনা ক'রে নানাভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠলাম। প্রথমত, রবীন্দ্রভাষা উচ্চারণে এক নতুন পথ নির্ণীত হ'লো। ভাষা সহজ মাত্রা পেলো, তার জোরও থাকলো অথচ কাব্যগুণও ব্যাহত হ'লো না। আর দ্বিতীয়ত, নতুন ক'রে নাটক বুঝতে শিখলাম। এতো তর্ক-ঝগড়ার পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল যে আমাদের বারবার করে ভারতীয় নাট্যপদ্ধতি, তার প্রয়োগপদ্ধতি, গোটা পৃথিবীর আধুনিক ভাবধারা, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাট্যের বিশেষত্ব, তার গভীরতা ও দেশের নাড়ির সঙ্গে তার যোগসূত্র—সমস্ত খুঁজে পেতে বার করতে হয়েছিল। 'রক্তকরবী'কে মনে হয়েছিল এক মহৎ নাটক। এই মহৎ নাটককে বিরাট ক'রে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম এবং অনেকটা সার্থকও হয়েছিলাম। ওদিকে আমাদের কাছ থেকে দর্শক সাধারণের প্রত্যাশাও বেড়ে গেল। কিন্তু প্রত্যাশা বাড়লেও এ-রকম নাটক তো আর হামেশাই পাওয়া যায় না। ফলে একদিকে নতুন নাটকের খোঁজ চলতে লাগলো, আর অন্যদিকে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে

'রক্তকরবী'র অভিনয় ক'রে চললাম। বাংলায়, বাংলার বাইরে, সর্বত্রই তার জয়-জয়কার ঘোষিত হ'লো। এই ছিলো 'রক্তকরবী'র ঘটনা-বহুল প্রেক্ষাপট এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা—যার সামান্য কিছু অংশ এখানে বর্ণিত হ'লো।

আমাদের অভিনীত তৃতীয় রবীন্দ্রনাটক ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্তর্গত 'স্বর্গীয় প্রহসন'। অত্যন্ত স্বল্পায়তন একটি কৌতুক নাটিকা। এটি অভিনয় করি ১৯৫৫ সালের ২২শে মে। এ নাটিকার দৃশ্যসজ্জা, চরিত্রের পোশাক ও রূপসজ্জার প্রস্তুতিতে বেশ কয়েক ঘন্টা লাগতো, কিন্তু নাটকাভিনয়ে সময় লাগতো আধ ঘন্টারও কম। এ নাটিকা অভিনয়ের অনুমতির ব্যাপারেও দীর্ঘ পত্রালাপ চলেছিল এবং এই নাটকের প্রযোজনাতেও আমরা খানিকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলাম। দর্শকদেরও ভালো লেগেছিল। কিন্তু স্বল্পায়তন এ নাটকের অভিনয় বেশি হয়নি।

আমাদের চতুর্থ রবীন্দ্রনাটক বহুখ্যাত 'ডাকঘর'। এ নাটক অবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সুপরিচিত। 'বহুরূপী' এ নাটক নির্বাচন করায় সকলে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ এ নাটক বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ নাটক প্রযোজনা করেছেন এবং নিজে তাতে অভিনয়ও করেছেন। সেই নাটক 'বহুরূপী' অভিনয় করছে। সুতরাং আগ্রহের সৃষ্টি হ'লো। বলে নিই, এ নাটক অভিনয়ের অনুমতিপর্ব মিটতেও কম সময় লাগেনি—বেশ সময় লেগেছিল। যাই হোক, যথারীতি প্রথম ঘরোয়া অভিনয় হ'লো। তারিখটা ছিল ২৪শে ফেব্রুয়ারি '৫৭। 'বহুরূপী'র শিশু-শিল্পীদের অভিনয়-দক্ষতা এমন স্তরে পৌঁছালো যে অভিনয় জগতে তাঁরা বিশেষ মর্যাদা লাভ করলো। 'বহুরূপী'র রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের খ্যাতি আর একবার ঝল্‌সে উঠলো। কিন্তু এ নাটক এক ঘন্টায় শেষ হয়। থিয়েটারে লোকে এক ঘন্টার জন্য আসে না। সে অভ্যাস এখনো তৈরি হয়নি। সুতরাং ফল দাঁড়ালো এই—'ডাকঘর' অভিনয় করতে হ'লে সঙ্গে অন্য কিছু দিতে হবে। অর্থাৎ 'ফাউ' না দিলে এ জিনিস চলবে না। অথচ প্রযোজনার খ্যাতি মুখে মুখে, অভিনয়ের খ্যাতি সর্বত্র। এই হ'লো আমাদের অবস্থা।...

তারপর এলো 'মুক্তধারা': 'বহুরূপী'-অভিনীত পঞ্চম রবীন্দ্রনাটক। এ নাটকের অভিনয়-অনুমতিও সহজে পাইনি। 'মুক্তধারা' নাটক এর আগেও অভিনীত হয়েছে। 'বহুরূপী' এ নাটকে হাত দেওয়ায় দর্শক, বন্ধুবান্ধব 'রক্তকরবী'র প্রযোজনার কথা স্মরণ ক'রে সম্ভবত এতেও ভিন্ন কিছু প্রাপ্তির আশা করেছিলেন; আর আমাদের বিপদের সূত্রপাত বোধহয় সেইখানেই। আমরা এ নাটকে নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলাম—তাতে অনেক লোক লাগে, অনেক বড় মঞ্চ, অনেকের কণ্ঠে গান দরকার। ছোটো ছোটো অংশে অভিনয় করবার জন্যও অনেক ভালো

অভিনেতার প্রয়োজন ছিলো। সেই রকম বিরাট ক'রে না করলে এ নাটকের মূল চেহারা প্রকাশ পায় না। কিন্তু অত লোক কোথায় পাবো—যারা অভিনয়ও ভালো করবে আবার সমস্ত নিয়মকানুনও মানবে। অতবড় মঞ্চও নেই আমাদের এখানে। যে-মঞ্চ আমরা সহজে পেয়ে থাকি—নিউ এম্পায়ার—তার আয়তনও খুবই সাধারণ মাপের। তারপর অনেকের কণ্ঠে গান! দুরূহ ব্যাপার। যাই হোক আমরা এর মঞ্চসজ্জায় এক নতুন পরীক্ষা করলাম। দৃশ্য সজ্জায়, পোশাক এবং আলোতেও বহু রঙের ব্যবহার করা হ'লো। নানান রঙের, নানান আকারের পর্দা দিয়ে পাহাড়ের একটা রূপরেখা তৈরি করা হ'লো। এ নাটকে টুকরো টুকরো ঘটনা, স্বল্প কথার চরিত্র—সমস্তই অত্যন্ত দ্রুত তালে এবং অনিবার্য সমাপ্তিতে এগিয়ে যায়। তাই এ নাটকের প্রযোজনার মধ্যে সেই দ্রুত তালের মাত্রা থাকাটা আবশ্যিক শর্ত।

এ নাটকও স্বল্পায়তন। পুরো নাটকটায় দু-ঘন্টারও বেশ-কিছুটা কম সময় লাগে। কিন্তু লোকের কল্পিত চাওয়ার সঙ্গে সম্ভবত আমাদের দেওয়ার মিল ঘটলো না। আমাদের হাতে মঞ্চ নেই এবং স্থায়ী মঞ্চ থাকার যে সমস্ত সুবিধা তার কোনোটাই ছিল না। ফলে প্রথম রাতেই যদি প্রযোজনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে না পারি—এবং প্রায় প্রথম রাত থেকেই যদি দর্শক-পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ না পাই—তবে বেশি দিন কোনো নাটক অভিনয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক পরিশ্রম এবং বহু ব্যয়সাধ্য এই নাটক নিয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সুযোগ হ'লো না।

এই হ'লো আমাদের রবীন্দ্রনাটক অভিনয় করার ইতিহাস। আর যে সমস্ত ঘটনা ও শিক্ষা পেতে পেতে এই ইতিহাস তৈরি হয়েছে সেটাই হ'লো আমাদের অভিজ্ঞতা। আমরা রবীন্দ্রনাটকে যে গভীরতার সন্ধান পেয়েছি, খুব কম নাটকেই সে গভীরতা দেখতে পাই। সমস্ত চরিত্র মনে হয় জীবন্ত, সমস্ত ঘটনা মনে হয় আজকের, মনে হয় চিরকালের। মহৎ জীবনের, মহৎ মানুষের যেন স্পর্শ পাই; মনের গভীরের তারে কোথায় যেন সাড়া লাগে। তাঁর সমস্ত নাটকে সত্যের গভীরতর প্রকাশ দেখি। কিন্তু সেই সত্য উপলব্ধি করতে হ'লে আমাদের, অর্থাৎ প্রযোজকদের, অভিনেতাদের এবং দর্শকদেরও তাঁর লেখার ধরন, তাঁর ভাষা, তাঁর কাহিনী-বিন্যাসের রীতি স্বভাবতই বুঝতে হবে, না হ'লে রবীন্দ্রনাটক সু-অভিনয় করা যাবে না—দর্শকদেরও ভাল লাগবে না।

আর একটা কথা। আমরা নাটক প্রযোজনার সময় দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোক-সম্পাত, আবহ-সঙ্গীত—এ সবের সাহায্য নিয়ে থাকি নাটকেরই প্রয়োজনে, যাতে নাটকের মূল কথা স্পষ্ট হয়, নাটকত্বও থাকে, কাব্যও প্রকাশ

পায়। উদ্দেশ্য, আমার ভালো-লাগাটা দর্শকের মনে ঠিক মতো সঞ্চারিত করা। কিন্তু যদি প্রকাশের কায়দাটাই প্রাধান্য পায় তাহলে স্বভাবতই তার চাপে নাটক মার খায়। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই আমবা এখন যাচ্ছি। কে কত কায়দা করতে পারে—কে কত চমক দিতে পাবে—তাবই যেন একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা ফুটে উঠেছে। জীবনের কথা, বাঁচবার কথা, ছোটখাট তুচ্ছতার উর্ধ্বে বিরাট মহত্বের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি কবার কথা যদি নাটক থেকে সরে যায় তবে নাটক তার অস্তিত্ব হারাবে। আজ সময় এসেছে সমস্ত অন্তর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করার এবং এই উপলব্ধিব মধ্য দিয়েই তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন সার্থক হবে। 'বহুরূপী'ও তার সামান্য ক্ষমতা নিয়ে সেই চেষ্টাই কবছে—জীবনে গভীরতার সন্ধান ক'রে চলেছে।

রচনাকাল : ১৯৬১
বহুরূপী পত্রিকা / ১২ সংখ্যা
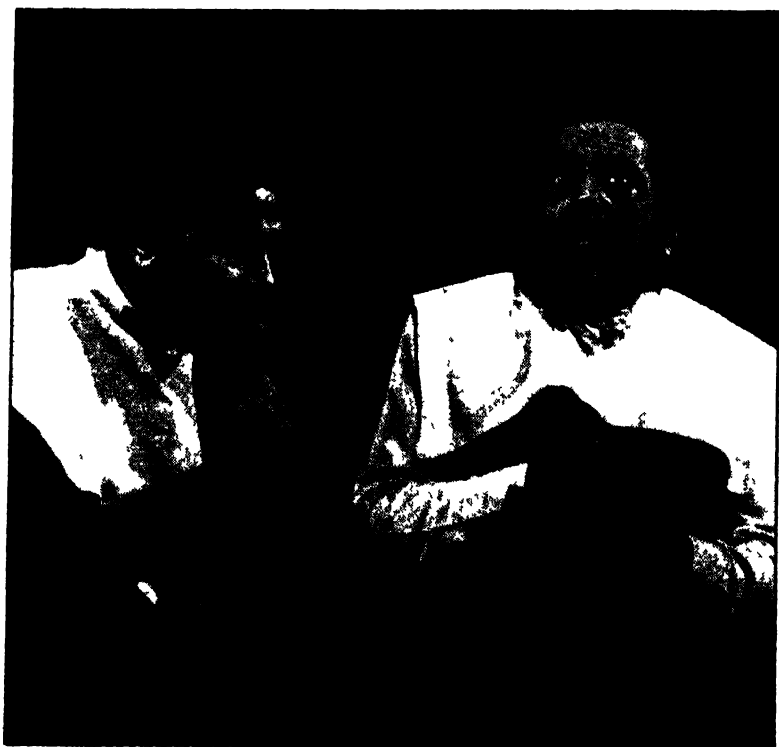
গ্যালিলেও : কালীপ্রসাদ ঘোষ, অমর গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের পূর্বসূরিরা

আমাদের রঙ্গমঞ্চ নিয়ে আমরা গর্ব ক'রে থাকি। এর ইতিহাস, এর সৃষ্টি, এর অগ্রগতি আমাদের আজ সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এই আধুনিক রঙ্গমঞ্চ—বর্তমানে আমরা যার উত্তরাধিকারী, মাত্র গুটিকয়েক তরুণ যুবকের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এরও পূর্বের ইতিহাস আছে এবং ঐতিহাসিকরা সে আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু বর্তমানে তার আলোচনার প্রয়োজন দেখিনা। আমাদের আলোচনা ১৮৬৮ সালের পুজোর সময় অভিনীত 'সধবার একাদশী' থেকে। কারণ আমরা যারা নাটুকে লোক তাদের মত হ'লো: রঙ্গমঞ্চে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে সেদিনের সেই অভিনয় থেকেই—আর সেই সৃষ্টির প্রধান-পুরুষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যাঁকে আমরা সকলেই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের জনক বলে শ্রদ্ধা জানাই। যে-যুগ সৃষ্টি হ'লো, এই শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তা উজ্জ্বল হয়ে রইল।

তারপর শুরু হয় আর এক পর্ব। নতুন এক ধারায় সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের রঙ্গমঞ্চ এই শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত দীপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী কালে শুরু হয় আর এক অধ্যায়।

প্রতি পর্বেই আমরা এমন কয়েকজন কৃতী-পুরুষ পেয়েছি যাঁদের অসামান্য কৃতিত্বে রঙ্গমঞ্চ মর্যাদা পেয়েছে এবং এঁরাই পথিকৃৎ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দীর্ঘদিনের এ ইতিহাস বহু স্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ—যার বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন—কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে কিছুতেই তা সম্ভব নয়। তাই তাঁদেরই মধ্যে মাত্র কয়েকজনের কর্মজীবনের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে তাঁদের কর্মকৃতিকে বোঝবার জন্য এই আলোচনার সূত্রপাত করছি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ :

স্বাভাবিক কারণেই নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে আসে। তাঁর জন্ম ১৮৪৪ এবং মৃত্যু ১৯১২ সনে। জন্ম এবং মৃত্যুর পথপরিক্রমণের প্রায় শেষ

দিন পর্যন্ত বহু আয়াস স্বীকার করে তিনি রঙ্গালয়কে মন্দিরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন।

একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, গিরিশচন্দ্রের জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে থেকেই কলকাতার বহু জায়গাতেই বিভিন্ন লোকের প্রচেষ্টায় বাঙলা নাটক অভিনয় করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে সবই বিত্তবান লোকেদের ঘরোয়া প্রচেষ্টা বা নিছক সখ বললেও অত্যুক্তি হয় না। শহরের ধনী এবং মর্যাদাসম্পন্ন লোকেদেরই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অধিকার থাকতো। সাধারণের কোনো প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না; প্রবেশ করলে অর্ধচন্দ্র-সহকরে বিদায় নিতে হতো। বাংলা ১২৮০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ 'সুলভ সমাচার'-এ একটি সংবাদ: 'পটলডাঙ্গা মল্লিক পরিবারে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ভদ্রলোককে দ্বারবানের গলা ধাক্কা খাইতে হয়।' —এই ছিল তখনকার অবস্থা।

এই অবস্থার মধ্যেই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়েই তিনি দল গঠন করেছেন। ১৮৬৮ সালের শারদীয়া পূজার সময় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়:

"—মদেমত্ত পদটলে,
নিমেদত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ
নব নটগুরু তার—" (অমৃতলাল বসু)

সেদিনেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু, সেদিনেই তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং অমৃতলালের যথার্থ মূল্যায়নে সেদিন থেকেই তিনি বাংলার নব-নটগুরু। স্মরণীয় নাট্যাভিনয়ে সেদিন যাঁরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হ'লেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী: বাংলা রঙ্গমঞ্চের আর এক দিকপাল।

কিন্তু এই সাফল্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দলের ভাঙনও শুরু হয়। বিরোধ বাধে যখন 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' 'ন্যাশনল থিয়েটার' নাম নেয়। 'ন্যাশনল থিয়েটার' নামকরণে গিরিশচন্দ্রের আপত্তি ছিল। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে বলেন—"সাধারণ্যে প্রকাশ হইবার মত আমাদের দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চ ও সরঞ্জাম কই?... ন্যাশনল বলিতে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু ইহাই কি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ? একেই তো বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকায়। আমাদের সিন ও স্টেজের এই দশা দেখিলে তাহারা কি না বলিবে? তাহারা কখনও মনে করিবে না আমাদের মত কয়েকটি যুবকের সামান্য চেষ্টায় থিয়েটার হইয়াছে।

তাহারা মনে করিবে এই জাতির নিকট হইতে আর কি বেশী আশা করা যায়? তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা কর। আরও উন্নতি করিয়া তবে করিব।'' কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও 'ন্যাশনল থিয়েটার' নামকরণ হয়। গিরিশচন্দ্র উক্ত সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করেন।

১৮৬৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বৎসর গিরিশচন্দ্রের সক্রিয় কর্মজীবন। বিভিন্ন ধরনের নাটক অভিনয় ক'রে, দলগঠন ক'রে, নাটক লিখে, অভিনয় শিক্ষা দিয়ে, থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ক'রে, তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

গিরিশ-অভিনীত নিমচাঁদ, উডসাহেব; একই নাটকে দ্বৈত ভূমিকায় রাম ও মেঘনাদ; দক্ষ, যোগেশ, বিদূষক, সীতারাম, করিম চাচা, করুণাময়, বীরেন্দ্র সিংহ, মিরজাফর তাঁর অভিনয়-দক্ষতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ, 'নীলদর্পণ'-এ উডসাহেব, 'প্রফুল্ল'তে যোগেশ, 'বলিদান'-এ করুণাময়, 'জনা'য় বিদূষক এবং আরও কয়েকটি চরিত্রে সে সময়ের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতারাও অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে নিমচাঁদ, যোগেশ, করুণাময় এবং বিদূষক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, দানীবাবু, অমর দত্ত এবং পরবর্তীকালে শিশিরকুমারও এই সমস্ত চরিত্রের কয়েকটিতে অভিনয় করেছেন—কখনো-বা প্রতিযোগিতা ক'রে, কখনো-বা বাধ্য হয়ে, কখনো-বা উৎসাহের বশে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অনন্য। এই রকম কয়েকটি অভিনয়ের বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা আছে—গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভাকে বুঝতে যা সাহায্য করে, সেগুলি উল্লেখ করছি:

১৮৯৪ খৃঃ 'জনা' নাটক প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। তখন 'বিদূষক'-এর ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করেন—এবং অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক রাত অভিনয় ক'রে মিনার্ভা থিয়েটার ত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র তখন এই চরিত্রে অবতীর্ণ হন। এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে অভিনয় করেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন—

''...অতঃপর এই ভূমিকায় গিরিশ স্বয়ংই অবতীর্ণ হন কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর এমনই জনপ্রিয়তা যে প্রথম দুই এক রাত্রি গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে না পারায় দর্শক এই পরিবর্ত্তনে সুখী হইতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে বিদূষকের প্রচ্ছন্ন ভক্তিরসের পরিচয় পাইয়া যখন ভূমিকার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিল, দর্শকের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সকলেই বুঝিতে পারিল গিরিশ ভিন্ন ভূমিকার যথার্থ রূপদান কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার পর আবার যখন অর্দ্ধেন্দুবাবু বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ

হইয়াছেন, দর্শক আর উহাকে পূর্ব্বের মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁহার অভিনয় যেন তরল মনে হইয়াছে।''

এরপর 'প্রফুল্ল'। এই নাটকে যোগেশ-এর ভূমিকায় প্রথমে অবতীর্ণ হন অমৃতলাল মিত্র। অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি এই চরিত্রে। পরে দুই থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে গিরিশচন্দ্রকে যোগেশের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। স্টার থিয়েটারে প্রতিযোগী ছিলেন অমৃতলাল মিত্র। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনা লেখেন। তিনি লেখেন—

"...প্রথম রাত্রে গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখিয়া যোগেশের এমন একটা ছাপ আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছিল যে, অমৃতলালের যোগেশ ইহার পূর্ব্বে আমাদের খুব ভাল লাগিলেও তাঁহার এবারের যোগেশ সেখানে স্থান পাইল না। অমৃতলালের ছবি গিরিশবাবু একেবারে বদলাইয়া দিলেন। অমৃতলালের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল— যাহা তাঁহার কণ্ঠেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত এবং সত্যই সেটি তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদই ছিল। তাহা নিতান্তই অননুকরণীয়। গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহাতে কোনও সুরের সংস্পর্শ তো ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গীতে, চাল-চলনে, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে, আকারে, গাম্ভীর্য্যে, গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যেন যথার্থই যোগেশ, আর একজন যেন যোগেশ সাজিয়াছেন; লিখিয়া আলোচনা করিয়া দুই অভিনেতার অভিনয়ের পার্থক্য কি তাহা ঠিক বোঝানো যায় না। কণ্ঠস্বর তো বর্ণনায় ফোটে না। 'একটা পয়সা দাও না'—ভিখারী যোগেশের এ উক্তি, এই হাত পাতিবার সময় তাঁহার মুখভঙ্গী, এতো আর কালি-কলমের সাহায্যে আঁকিয়া দেখানো যায় না। গিরিশচন্দ্র যোগেশ সাজিয়া যে দৃশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন, মনে হইত যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া খেলিয়া চলিয়া গেল। সে অভিনয়ের অপূর্ব্বত্ব ও বিশেষত্ব বিশেষ করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য তখন ছিল না। সে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাহবা দিবার অবসর তখন থাকিত না। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির বিচার করিবার স্পৃহা তখন কোথায় আত্মগোপন করিত তাহা দর্শক বুঝিতেও পারিতেন না। শুধু মনে হইত রঙ্গমঞ্চের উপর কি যেন একটা হইয়া গেল—যাহা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের স্পন্দন আপনি দ্রুততর তালে নাচিয়াছে, সহজ নিঃশ্বাস মুহূর্মুহু দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, কণ্ঠ কখন রুদ্ধ হইয়াছে, চক্ষে অবিরল জলধারা, জ্ঞান ও চৈতন্য যে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে! যেন যোগেশ, সকল দর্শকেরই অতি প্রিয়

যোগেশ—সকলের প্রাণে একটা হাহাকার তুলিয়া দুর্দ্দশার নিম্নতম স্তরে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছে। জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে 'মরচো মরো, আমিই তোমায় লাথি মেবে, মেবে ফেলেছি,' সমস্ত বিয়োগান্ত নাটক যেন এই কয়টি অক্ষবের ছাঁদে মূর্ত্তি লইয়া দর্শকেব সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইত। তাবপর 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' এই কথাব মধ্যে শোকের সে প্রবাহ কোথায় লুকাইয়া ছিল! শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতাব সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলেও আর এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না! হৃদয অককরুণার মাঝে করুণার ফল্গু এমনভাবে কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারে, তাহা যিনি গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখেন নাই, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। আমাব সাধ্যও নাই যে তাহাব কণামাত্র আভাস পাঠককে দিই। গিরিশচন্দ্রের এ অভিনযে একটা বিরাট অনুভূতির বিকাশ আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, কর্ম্মবীব, স্নেহপরায়ণ, ইংরাজী শিক্ষিত, ইংরাজী সভ্যতায় গঠিত মদ্যপের চূড়ান্ত পরিণামের সে ভয়োদ্দীপনকারী মূর্ত্তি সহানুভূতির কোমল প্রলেপে মমত্বপূর্ণ যে জটিল চিত্র অভিনয়ে জীবন্ত দেখিয়াছি তাহা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত মনে থাকিবে। এ বিচিত্র অভিনয়-প্রবাহে অমৃতলাল ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা অমৃতলালের গৌরব; কারণ গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিলে এ পর্য্যন্ত অমৃতলালের মত যোগেশ আর দ্বিতীয় দেখি নাই।...''

'বলিদান' নাটকে করুণাময় চরিত্রে প্রথম অভিনয করেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁরই পরামর্শে অর্ধেন্দুশেখরকে সকলে অনুরোধ করেন, অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করেন। এই অভিনয়েরও সমালোচনা লেখেন অপরেশচন্দ্র:

''গিরিশচন্দ্রের করুণাময় যাহা বলে, যাহা করে, তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণীর মত হইলেও সাধারণ কেরাণী বা সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মত নহে। সে করুণাময়ের বাক্যে ও কার্য্যে যেন অন্তর্নিহিত এমন একটা গভীর ভাব আছে, যাহা বাহিরে সহজে ধরা যায় না, কিন্তু মর্ম্মে অনুভব করা যায়। একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ, একটা প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব, একটা প্রচ্ছন্ন উদার হৃদয়, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা, একটা প্রচ্ছন্ন সত্যনিষ্ঠা, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান! —এই অভিমানকে, এই বিষাদক্ষিন্ন ভাবকে চাপা দিয়া করুণাময় অফিসে যায়, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরের বাপের দ্বারস্থ হয়, পণের টাকা সংগ্রহ করিতে বাড়ি বাঁধা দেয়, পাওনাদারের তাগাদা সহ্য করে, কিন্তু ইনসলভেন্ট কোর্ট-এ যায় না, আর মেয়েগুলোকে অনিচ্ছায় অপাত্রে দিয়া মর্ম্মের আগুনে গুমরিয়া পোড়ে। এ করুণাময়ের অন্তরে যৌবনের প্রথম দিনে যেন উচ্চাভিলাষের বহ্নি

জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু অঙ্গারের উত্তাপ দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষ রক্তকে শুকাইয়া দিতেছে। সাহেবের করুণাময় হইত ঠিক সাধারণ গৃহস্থ বাপ। মমতাকাতর, দারিদ্র্যে ম্রিয়মাণ কন্যাদায়ে উদ্বাস্তু এবং সংসার চক্রে নিষ্পেষিত সাধারণ মানব। সাহেবেব এ ভঙ্গীর অভিনয় দেখিয়াও দর্শক কাঁদিত এবং গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দেখিয়াও দর্শকের চক্ষে জল ঝরিত। কিন্তু এই দুই চোখের জলেরও প্রভেদ ছিল। সাহেবের অভিনয় দেখিয়া চোখের জল পডিত বটে, কিন্তু তাহাতে গলা শুকাইত না; মনে হইত না যে, বুকের মধ্যে সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; মনে হইত না—পরিচিতকণ্ঠে কে যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনরোল কানের কাছে তুলিয়াছে; মনে হইত না যে, কেহ যেন বক্ষের পঞ্জর একখানির পর একখানি করিয়া খুলিয়া লইতেছে। যে দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর মমতাবিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'এই যে, খুজে পাওয়া গিয়াছে! তাইত বলি, আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না' ইত্যাদি। এ ক্রন্দনে দর্শকও কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তার চক্ষে জল কোথায়! দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিত প্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলকনেত্রে জমাট বাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর! এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন অপরিজ্ঞাত শোক—কোথায় ছিল, কখন আসিল—দম্‌কা ঝড়ের মত অলক্ষ্যে, নিমিষে, সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল! গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দর্শককে অনুসরণ করিত। অভিনয়ান্তে— পথে, গৃহদ্বারে, অন্ধকার শয়নকক্ষে, আহারে, নিদ্রায় স্বপ্নে, অভিনয় দেখার দু-তিন দিন পরেও এ করুণাময়ের প্রভাব দর্শককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। সাহেবের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের প্রভাব দর্শককে আকুল করিয়া তুলিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে নাটকের সকল ঘটনা চাপা দিয়া মানসচক্ষে কেবল দেখা দিত—করুণাময়, বজ্রাহত তরুর ন্যায়, পত্রপুষ্পহীন, বিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত! গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এই দুই করুণাময় আলোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'করুণাময় যদি ও দৃশ্যে কাঁদে, তাহলে সে আর গলায় দড়ি দিতে পারে না।"

এই হলেন গিরিশচন্দ্র এবং এই হ'লো তাঁর অভিনয়। আমরা এঁদের অভিনয় দেখিনি। আমাদের জানার মধ্যে যে সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী এখনো আছেন তাঁদেরও স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বিশেষ করে অভিনয় দেখা এক, আর তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আর এক; সে ক্ষমতা সকলের থাকে না। তাই সে সময়কার লেখার ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশি। অপরেশচন্দ্র নিজে

নাট্যকার, অভিনেতা এবং অভিনয়-শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন, তিনি গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলালের সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন ; তাঁর সমালোচনা অধিক গ্রাহ্য।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক' কথাটা অত্যন্ত গোলমেলে। অনেকের সম্পর্কেই দেখি ওই বিশেষণ যোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'স্বাভাবিকতা' কোন স্বাভাবিকতা? আবার কোথাও কোথাও দেখি তিনি নাটকে সুরেলা অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। মানুষ যখন তার গভীরে নাড়া খায়, যখন তার অন্তরের অতলান্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে, তখন তার আবেগ ঠিক কোন 'স্বাভাবিকতা'র মানদণ্ডে ধরা যাবে? মানুষের কথায় সুর তো থাকতে বাধ্য। প্রত্যেকের নিজস্ব ধরনে নিজস্ব সুর। 'নিমচাঁদ' দুঃখ বা আনন্দ পেলে যে কথা বলে, যেভাবে বলে, 'যোগেশ' তা বলে না। 'দক্ষে'র কথা বলার সুর নিশ্চয় 'রাবণে'র থেকে পৃথক। তারপর আছে অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র এবং ঘটনার বিশ্লেষণ। তাই অত সহজে এবং ফর্মুলায় ফেলে মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি বিচার করা যায় না।

এবং এই অসামান্যতার জন্যই গিরিশচন্দ্র চিরকাল অবিসংবাদিত প্রশংসা পেয়েছেন, তাঁর ক্ষমতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে কোনোদিন কোনো প্রশ্নই কেউ তোলেননি। কেবল এই শতকের প্রারম্ভে, তাঁর প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দেখি, কীর্তিমান তরুণ নট অমর দত্ত তাঁর সঙ্গে বিবাদে অবতীর্ণ হন—যা অশালীন পর্যায়েই পৌঁছেছিল। যেমন, ১৯০০ সালে গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন জেনেও তিনি একই সঙ্গে নিজের থিয়েটারে উক্ত নাটকে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করার কথা বিজ্ঞাপিত করেন এবং হ্যাণ্ডবিলে ঘোষণা করেন: 'ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে'। বলা বাহুল্য অমর দত্ত তখন ক্লাসিকে ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'নট, নর্ত্তক ও নাপিত—এই তিন, চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।' শুধু তাই নয়, গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে নানাপ্রকার ছড়া কেটে হ্যাণ্ডবিল ছাপানো শুরু হয়। সঙ্গে নানারকম ব্যঙ্গচিত্রও বের হতে থাকে। গিরিশচন্দ্র এবং মিনার্ভার স্বত্বাধিকারীকে ব্যঙ্গ করে তিনি 'থিয়েটার' নামে এক কৌতুক-নাট্য রচনা করেন এবং অভিনয়ও করেন। অবশ্য কিছুদিন পরেই তিনি ঘোষণা করেন:

> '...নটকুলচূড়ামণি পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, বাংলায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ

স্থাপিত হইয়াছে, সকল গুলিরই সৃষ্টিকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই—'গিরিশচন্দ্রে'র শিক্ষায় গৌরবান্বিত! তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম।...'

কিন্তু গিরিশচন্দ্র এ সমস্তের ঊর্ধ্বে ছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নাটক লিখেছেন, অভিনয় করেছেন, অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন। অভিনয়ের কথা স্মরণ ক'রে নতুন ছন্দে নাটক লিখেছেন। অমিত্রাক্ষর কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধরন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে অনেক উপহাস সহ্য করতে হয়েছিল, যেমন মাইকেলকে ব্যঙ্গ ক'রে এক সময়ে লেখা হয়েছিল 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য'! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবি নাট্যকারেরা গিরিশের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রবর্তিত ছন্দের প্রভাব পরবর্তী নাট্যসাহিত্যকেও প্রভাবিত করে।

আজ পর্যন্ত আর কোনো নট বা নাট্যকারের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলি গুণের এত সার্থক প্রকাশ দেখা যায় নি। কিন্তু আজ যখন অভিনয় সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা ওঠে, তখন দেখি, উদাহরণ খুঁজতে আমাদের প্রায়ই পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকাতে হয়—অতীতে তারা কী করতো, এখনই বা তারা কী করে। যত বিশদভাবে বিদেশকে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে, সে দেশের অভিনয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে কি তার একাংশও করা হয়েছে? কিন্তু অপরেশচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা কি আমাদের কোনো সূত্র দেয় না? সহজ অথচ গভীর অভিনয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণের চেষ্টাই তো বিভিন্ন স্রষ্টা তাঁদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে করেছেন। গিরিশচন্দ্রের চেষ্টাও ওই পথেই সার্থকতা লাভ করেছিল। তাই শুধু কথায় কথায় নামোল্লেখ না ক'রে যদি তাঁর অভিনয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে অভিনয়-রীতির নিশ্চিত একটা পথ পাওয়া যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। অমৃতলাল মিত্রকে তিনিই যোগেশের চরিত্রে শিক্ষা দিয়েছিলেন—অমৃতলালের অভিনয়ও অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু যখন তিনি নিজে অভিনয় করলেন তখন তাঁর মধ্যে আর এক যোগেশ-এর চেহারা দেখা গেল—যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চরিত্র। কী ক'রে সেটা সম্ভব হ'লো? অভিনয় একটি শিল্প—সেটা ভোজবাজি নয়, সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে। এই অনুসন্ধানের ফলেই সেই মহান শিল্পীকে বুঝতে পারবো, নাহ'লে বিপদে পড়ে 'হরি'র নাম স্মরণের মতোই তাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করা হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না, তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে; ইতিহাসকে আমরা নষ্ট ক'রে ফেলবো।

১৯১১ সালের ১৫ই জুলাই এক স্মরণীয় দিন। মেঘলা আকাশ, মুষলধারায় বৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ। কিন্তু 'বলিদান' অভিনয়ে দর্শক এসে হাজির। গিরিশচন্দ্র

সাজবেন করুণাময়। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দর্শকদের ফিরিয়ে দিলেন না—কারণ তাঁরা জল-ঝড় উপেক্ষা ক'রে তাঁরই অভিনয় দেখতে এসেছেন। সেই দুর্যোগভবা রাতে তিনি জীবনেব শেষ অভিনয় করলেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন ভুগে ১৯১২ সালেব ৮ই ফেব্রুয়ারি জীবনের পাদপ্রদীপের সামনে থেকে সরে গেলেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ সেদিন পিতৃহীন হ'লো।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী :

শোনা যায়, 'ঠাকুরবাড়ি'র মতে নাকি অর্ধেন্দুশেখরই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ভিন্ন মত পোষণ ক'রেও বলতে পারি—অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত অর্ধেন্দুশেখর যে-কোনো দেশের যে-কোনো যুগের প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে তুলনীয় অভিনেতা।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় তিনি গিরিশচন্দ্রের যোগ্য সহযোগী ছিলেন। বয়সে কিছু ছোটো কিন্তু কর্মোদ্যোগে সমান উৎসাহী। তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি দেখে মনে হয় হাস্যরসাত্মক এবং লঘুচরিত্রেই তিনি সম্ভবত বেশি অবতীর্ণ হতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ে.ব সিরিয়াস চরিত্রেও তিনি বহুবার অভিনয় করেছেন এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাকে সার্থক ক'রে তুলেছেন। গিরিশচন্দ্রের কথায়—'অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন তাহাই অননুকরণীয় হইয়া উঠিত।'

অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্রের প্রদত্ত ভাষণে অর্ধেন্দুশেখরকে বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। গিরিশচন্দ্র বলেন :

> "...কৃতবিদ্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সম্প্রদায়ের 'সধবার একাদশী' অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর জীবনচন্দ্রের ভূমিকা (পার্ট)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author, আমি এবার 'সধবার একাদশী'র নূতন সংস্করণে 'অটলকে লাথি মারিয়া গমন' লিখিয়া দিব।'..."

> "...এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম : কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম 'সধবার একাদশী'তে দারোয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়া ছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাষ্টার—একথা সর্ব্বত্র প্রচার; প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণিত

হইতে পারে না। তাঁহার দীক্ষার পরিচয় সুযোগ্য ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শুনিতে পাই 'বিশ্বকোষে' বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, 'এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটি রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।' লেখকের মতে দুইটির মধ্যে একটি অর্দ্ধেন্দুবাবুর রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া লেখেন নাই। তিনি অর্দ্ধেন্দুর অভিনয ও দীক্ষাপ্রণালী বোঝেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে জানাইবার চেষ্টা করিব। যাঁহারা natural কথাটি কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা—আমি অর্দ্ধেন্দুব যে পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কিনা জানি না। যিনি পাশ্চাত্য অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন যে অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই— অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (Part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে—দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় দেবকার্সন নামক এক ইংরাজ এই উচ্চশক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজ মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়া ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ—দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন—

'হাম বড়া সাব্ হ্যায় দুনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ'।

ঐ অভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুকে লোকে 'সাহেব' বলিত। Album of amusement এ ইংলণ্ডের এক কলাবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলো পিস্‌বোর্ডের নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন। সেই পিস্‌বোর্ডে নির্ম্মিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটি মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গীপূর্ব্বক সেই মুণ্ডের অনুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড যাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক—নিজে সেই কল্পিত প্রকৃতির অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হাস্যে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যাইত। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তাঁহার প্রশংসা ধরে না। এ ব্যক্তিরও শক্তি অর্দ্ধেন্দুর শক্তির নিকট নিম্নস্তরের। ইংলণ্ডের John Lawrence Tool এই শক্তির পূর্ণবিকাশ। পূর্ব্বে বলিয়াছি,

অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশ বা ঐ অংশ এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দুবাবু চমৎকার—এই কথা।

অর্দ্ধেন্দুব এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন, প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বোধ হয়) অর্দ্ধেন্দুব এই স্বরূপ বর্ণনায় কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। এই রূপ মনে কবা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলা বিদ্যা, স্বভাব নয। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিযা, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যে রূপ মনের ভাব হইয়াছিল সেই ভাবটি যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art gallaryতে Approaching storm অর্থাৎ ঝড আসিতেছে এই নামে একখানি চিত্র আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষসকল স্পন্দনহীন, পশুপক্ষী ভয়াকুল, ঝড়ের পূর্ব্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিযাছেন। ঝড আসিবার পূর্ব্বে যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাব অঙ্কিত মেঘ ও স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু উচ্চ কলা বিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশ চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট কবিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching Storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি, কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনয়ে 'Natural' কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, তাহার দৃশ্যগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। অঙ্কিত দৃঢ় দুর্গ বাতাসে নডে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছেন, 'এই দৃঢ় দুর্গ কামানের গোলায় ভেদ করিতে পারিলাম না।' অভিনেতা তাহার শক্তির দ্বারা দর্শকের মনে প্রকৃত ঘটনায়, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ খেদ করিয়াছে, সেই ভাব উদ্রেক করিয়া দেয়। এই পর্য্যন্ত অভিনয়ের শক্তি।"

"...অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের পার্থক্য কি? তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। লোকে গ্যারিকের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত, 'হ্যামলেট্' চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় একরূপ। উল্লিখিত John Lawrence Tool নামক অভিনেতার দর্শক মনমোহন অভিনয় অন্যরূপ। এই কলা-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতকে দেখিয়া দর্শক সেই পণ্ডিতেরই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না।"

"...রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু রিহর্স্যালে বসিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এ কোণে কেহ কাহারও নিকট একটি পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেই দিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহাকে বলিলেন, 'থাম বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শেষ হোক তাহার পর কার্য্য হইবে।' কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি বলিলেন, 'স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তারপর নিশ্চিত হ'য়ে কার্য্য আরম্ভ করি।' "

"...Variety Theatre অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুক-কলাপ হইয়া থাকে এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে, অর্দ্ধেন্দু একক অল্প সাহায্য লইয়া দেবকার্সনের ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাবভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যা বিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীল দর্পণে 'গোলক বসুর' অভিনয় হইতেছে, তাহাতেও একটু 'অর্দ্ধেন্দুরী' টিপ্‌নি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটি মশা মারিল, এটি 'অর্দ্ধেন্দুরী'। 'রডা' ও 'উড' সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট।

...অর্দ্ধেন্দু চলিয়া গেলেন...কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কি তাঁহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন? কখনও না! দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যদ্যপি তিনি ভোলেন, যতদিন বাঙ্গালার রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্ধেন্দুশেখর অমর!"

সহ-অভিনেতার প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা!

'নবীন তপস্বিনী'তে জলধর, 'নীলদর্পণ'-এ উডসাহেব, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ধনদাস, 'জনা'য় বিদূষক, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগ্‌গজ তুলনারহিত। তিনি 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ এবং 'বলিদান' নাটকে করুণাময় চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং অসামান্য খ্যাতিও পেয়েছেন।

আমরা জানি বেশির ভাগ অভিনেতাই কেবলমাত্র নাটকের সংলাপের ওপরই নির্ভর ক'রে থাকেন। সংলাপের চাপে পীড়িত অভিনেতারা কোনো রকমে সংলাপ ব'লে দেওয়াটাই কর্তব্য মনে করেন। অপেক্ষাকৃত ভাল অভিনেতারা সহজ ও সরস ক'রে সংলাপ ব'লে চরিত্র বোঝাতে চেষ্টা করেন। বড় অভিনেতাদের কাছে সংলাপ ভার নয়, চরিত্র-প্রকাশের একটা মাধ্যম। নাটকে যা বলা থাকে তার চেয়ে না-বলা অংশ অনেক বেশি। মহৎ শিল্পী এই বলা ও না-বলার সেতুবন্ধন ক'রে থাকেন। সংলাপের মধ্য দিয়ে, মুদ্রা ও ভঙ্গি দিয়ে, কখনও বা চুপ ক'রে থাকার মধ্য দিয়ে তিনি চরিত্র প্রকাশ ক'রে থাকেন। অর্ধেন্দুশেখর

অভিনয়ের মধ্যে এই মিলন ঘটাতে পারতেন।

অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ের বিবরণ দিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন:

"...একবার একটা কথা বড়ই মনে পড়িতেছে—সেটা আলবার্ট হলে। তিলক আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আলবার্ট হলে সভা হইয়াছে, স্টেজ হইয়াছে, নানারূপ আমোদপ্রমোদ ও কৌতুক হইতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই একটি ডিস্পেন্সরী সাজিয়াছেন। অতি কাতর স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁচিঁ করিতে করিতে ডাক্তারের কাছে গিয়া আপনার কষ্টের কথা বলিতেছেন; আবার ডাক্তার হইয়া ভঙ্গী করিয়া রোগী দেখিতেছেন, রোগীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর টেবিল হইতে কাগজ লইয়া প্রেস্কৃপ্সন লিখিতেছেন; আবার কম্পাউণ্ডার হইয়া 'এস' বলিয়া রোগীকে ডাকিতেছেন আর ঔষধ দিতেছেন—বলিতেছেন, 'এ কাগজখানি হারিও না, আবার যখন আসবে কাগজখানি হাতে করে এস।' ঔষধ দিতেছেন কিন্তু সেই এক ক্যাষ্টর অয়েল। একজন রোগী চীৎকার করিতে করিতে আসিল, দাঁত কটকটানিতে সে মারা যাইতেছে, সে কখন মুখে হাত দেয়, কখন কাঁদে, কখন যন্ত্রণায় বসিয়া পড়ে। ডাক্তার হাত দেখিলেন, পেট টিপিলেন আর ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবস্থা করিলেন। কম্পাউণ্ডার বলিলেন—এস। খানিক ক্যাষ্টর অয়েল একটা শিশিতে ঢালিয়া দিলেন। রোগী বলিল, 'আমার হয়েছে দাঁতে শূল, আপনি জোলাপ দিলেন যে?' কম্পাউণ্ডার খাদে গলা তুলিয়া বলিলেন, 'ওতেই আরাম হবে।' এইরূপ কত রোগী আসিল—সবই একসুর, একই রকম চিকিৎসা, একই রকম ঔষধ। হলসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির।..."

অক্ষয়কুমার মৈত্র অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন:

"...'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে ধনদাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর যে সকল অভিনয় কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা একালের পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যকাব্যের বাক্যাবলীর মধ্যে যাহা অনুক্ত থাকিয়া যায়, তাহা ধরিয়া লইয়াই অভিনয় করিতে হয়। জলধরের ন্যায় সুপণ্ডিত অনায়াসে কবিতা রচনা করিতে পারিলে, কবির চরিত্র চিত্রাঙ্কন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িত। অভিনয় কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভাবে কবিতা রচনার প্রয়াস এবং প্রক্রিয়া প্রদর্শিত করিতেন, তাহা কেবল হাস্যোদ্দীপক নহে—প্রত্যুত প্রকৃত অভিনয়কলার উৎকর্ষজ্ঞাপক—অভিনেতার অসাধারণ প্রতিভাব্যঞ্জক—কবিবাক্যের বিশদ ভাষ্যরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এরূপ অভিনয়-কৌশল অর্দ্ধেন্দুশেখরই প্রথমে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনদাসের ভূমিকা ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। যে দৃশ্যে হৃতসর্ব্বস্ব ধনদাস ছিন্নবস্ত্রে মলিনবদনে রাজপথপার্শ্বে উপবিষ্ট, তাহার অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর কোনরূপ বাক্যব্যয় ও অঙ্গচালনা না করিয়া, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, কেবল

সাত্ত্বিকাভিনয়ে দর্শকচিত্ত অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে মানব প্রকৃতির কিরূপ অন্তস্থলদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার অভিনয়ে নিয়ত অভিব্যক্ত হইলেও, এই উপলক্ষে তাহা বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইযাছিল। সেরূপ অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকটেও আর কখন দর্শন করিতে পারি নাই। যাহা কবির প্রাপ্য, কেবল সেইটুকু ব্যক্ত করিয়াই, অভিনেতা প্রশংসালাভ করিতে পারেন। যাহা কবি লিখিয়া ব্যক্ত করেন নাই, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলে, অভিনেতার গৌরব কত অধিক হইয়া পড়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অনেক বার তাহা দেখাইযা গিয়াছেন।...''

গিরিশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অক্ষয়কুমার মৈত্র-র লেখা থেকে অর্ধেন্দুশেখরকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। সম্পূর্ণ দেহ মন দিয়ে অভিনয় করা, অভিনয়ের যা প্রধান কথা, তারই প্রকাশ দেখি অর্ধেন্দুশেখরের মধ্যে। ভঙ্গি-নির্ভর অভিনয়ে তাঁর তুলনা ছিল না। তাই তাঁর অভিনয় সহজ মনে হতো, স্বাভাবিক মনে হতো অথচ তাতে গভীরতারও আমেজ থাকতো।

আমরা আজকের দিনেও এর চেয়ে বেশি কী করতে পারছি? বেশি করা তো দূরের কথা, সহজ অভিনয়ই কি করতে পারছি? সহজ অভিনয় করতে গিয়ে কোনো গভীরতা প্রকাশ পায় না—বরং নিজের অক্ষমতাকে দেখি সহজতার ছাপ দিয়ে চালিয়ে দিতে। দৃশ্যপট নেই, সাজসরঞ্জাম নেই, এমন কি বিশেষ সংলাপও নেই—অথচ একা মঞ্চে অভিনয় ক'রে লোককে মুগ্ধ করতে হ'লে ক্ষমতার প্রয়োজন। আবার দৃশ্যপট, সাজসরঞ্জাম এবং সুনির্দিষ্ট সংলাপের মধ্যে দিয়ে জীবন প্রকাশ করা, কাব্য প্রকাশ করা— আর এক ক্ষমতার প্রয়োজন। অর্ধেন্দুশেখর তা-ও করেছেন।

নিজেদের রঙ্গমঞ্চকে বুঝতে হ'লে, আধুনিক অভিনয়ের ধারা এবং চেহারা বুঝতে হ'লে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরকেও বুঝবার চেষ্টা করতে হবে, না হ'লে অপূর্ণতা থেকে যাবে।

গিরিশচন্দ্রের মতো অর্ধেন্দুশেখরের শেষ অভিনয়ও স্মরণীয় হয়ে আছে। ৯ই আগষ্ট, ১৯০৮ সাল। কোহিনূর থিয়েটারে 'নবীন তপস্বিনী' এবং 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় হবে। অর্ধেন্দুশেখর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অথচ জলধর এবং যোগেশে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়ে গেছে। সকলে তাঁকে নিষেধ করেন—কিন্তু থিয়েটার-পাগল অর্ধেন্দুশেখর কারো কথা শুনলেন না। অসুস্থ শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। পরদিন সকালে উত্থানশক্তি রহিত হলেন, জীবনে আর পাদপ্রদীপের সামনে আসতে পারলেন না। অবশেষে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ বাংলা রঙ্গালয়ের ইন্দ্রপাত হ'লো; অর্ধেন্দুশেখর চলে গেলেন।

রচনাকাল: ১৯৬৩

বহুরূপী পত্রিকা / ১৭ সংখ্যা

গোড়ার কথা

ডাকবিভাগের যে ছেলেটি চিত্তবাবুর চিঠিটা দিয়ে গেল তার চেহারাটি বেশ, মনে হ'লো তাকে দিয়ে অভিনয় করানো যায়, 'রক্তকরবী'তে কিশোর। নাম জিজ্ঞাসা করলাম—কখনো অভিনয় করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম; করেনি—করবার কথা কখনো মাথায়ও আসেনি। বয়স বললো চব্বিশ। বিয়ে করেছে—সংসার আছে ইত্যাদি নানা খবর দিয়ে একটু হেসে চলে গেল। এ ছেলেটি যখন পৃথিবীতে আসেনি—এর মতো বহু কোটি লোকই যখন পৃথিবীতে ছিল না, সেই সময়েই আমরা কয়েকজন লোক ১১-এ, নাসিরুদ্দিন রোডে জড়ো হই, তারপর দেখতে দেখতে চব্বিশটা বছর পার হয়ে গেল। অথচ মনে হচ্ছে এইতো সেদিন—সেদিন কোথাও কিছু ছিলনা—থিয়েটার করার ইচ্ছেটা ছাড়া—কয়েকটি লোক মিললো, কয়েকদিন গল্পগুজব আর আড্ডা হ'লো, জন্ম নিলো একটা দল—পরে যার নাম হ'লো 'বহুরূপী'। তারপর প্রায় সিনেমার মতো শট্ বদল করতে করতে পঁচিশ বছরের ঘটনায় চলে এলো। সিনেমার সঙ্গে তফাৎ হ'লো তাতে কাহিনী-চিত্রনাট্য সব ঠিক থাকে—এখানে কিছু ছিল না—খালি ইচ্ছাটা ছাড়া। ঘটনাগুলো যখন ঘটেছিল, কাজ যখন করা হয়েছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে গল্প করার মতো ক'রে ঘটেনি। যেমন ধরা যাক, 'বহুরূপী'র জন্মদিন যে ১লা মে, ১৯৪৮—এটা কে বললো? সেটা কবে ঠিক হয়েছে—১লা মে, ১৯৪৮ সালেই কি? না, জন্মদিন যে ১লা মে সেটা ঠিক হয়েছে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে!

এতে অবাক হবার কিছুই নেই। মানুষের জন্মের কথাই ভাবা যাকনা—রাত বারোটা বেজে তেরো মিনিটে একজন জন্মেছে; যে যার নিজের ঘড়ি দেখেছে কি দেখেনি এবং শেষ পর্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডাতে কর্তাস্থানীয় লোকেরা ঠিক ক'রে দিয়েছেন বারোটা বেজে তেরো মিনিটে। মানুষের জন্মক্ষণের ব্যাপারে দিনক্ষণ দেখার রেওয়াজ আছে, দলের জন্ম তো তা নয়। সুতরাং ১৯৫০ সালের কিছুদিন এদিক-ওদিকের হিসাবের গড় ক'রে ঠিক করা হ'লো, আমরা ১লা মে-তেই জন্মেছি। ১লা মে তো বিশেষ একটা দিন।

কী ক'রে ধীরে ধীরে দলটা গড়ে উঠলো, কী ক'রে অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ হ'লো এবং কী ক'রে সে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠলো সে সব গল্প বলার মতো। কতো ঘটনা চোখের সামনে চলে আসছে তার একটাও বাদ দিতে ইচ্ছে হয়না—আমার দৃঢ় বিশ্বাস সব না বললে কিছুতেই 'বহুরূপী'কে বোঝানো যাবেনা এবং এ-ও জানি সে সব কাহিনী লোকের শুনতেও ভালো লাগবে। কিন্তু এটা বোধহয় তার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তাই ডালপালা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত ক'রে কিছু কিছু বলার চেষ্টা করছি।

নিজের কথা দিয়েই শুরু করি, কারণ সব তো নিজের স্টক-রেজিস্টার থেকেই বার করতে হবে। ১৯৪৮ সালের একেবারে গোড়ার দিকে বাড়ি থেকে চলে আসি কলকাতায় থিয়েটার করতে। কিন্তু থিয়েটার করা তো দূরের কথা—পেট চালাবারও কোনো ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না। একটা অফিসে একজন কর্মী ছুটিতে যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য আমি চাকরি পাই—সেখানে একই ভাবে কলিম শরাফীও এসে হাজির হয়। অফিসে কাজ যতো করতাম, তার চেয়ে থিয়েটারের গল্প করতাম অনেক বেশি। কলিমের সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্বে দাঁড়ালো। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে কলিমই নিয়ে গেল ১১-এ, নাসিরুদ্দিন রোডে। সেখানকার ফ্ল্যাটে তখন মাত্র দু-জন লোক বাস করছেন—শম্ভু মিত্র আর কলিম শরাফী। বৌদি (তৃপ্তি মিত্র) তখন সেখানে নেই—শাঁওলীর 'মর্ত্যে আগমন'-এর জন্য স্থানান্তরে।

আলাপ হ'লো শম্ভুদার সঙ্গে। সে যেন এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর প্রচণ্ড শক। যে পরিমাণ নাম শুনেছিলাম তাতে অল্প বয়সের অভিজ্ঞতায় ভেবেছিলাম বয়সেও নিশ্চয় প্রবীণ, এবং আচার-আচরণ-কথাবার্তাও নিশ্চয় গুরুগম্ভীর হবে এবং কিছুটা বক্তৃতা-উপদেশের পর থিয়েটার সম্পর্কে কিছু মুষ্টিযোগের আভাস মিলবে। কিন্তু না—পাজামা-পাঞ্জাবি-পরা অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক কোনো বক্তৃতা-উপদেশে বা গম্ভীর কথাবার্তার মধ্যেই গেলেন না। একেবারে যাকে বলে সাদামাটা কথা, তাও অত্যন্ত সহজ এবং ঘরোয়াভাবেই বলতে লাগলেন। মেহের বলে একটি ছেলে কাজ করতো তখন, সে তিন কাপ চা নিয়ে এলো—অতো হাল্কা চা আমি কখনো খাইনি—কাউকে খেতেও দেখিনি। সেই চা খেতে খেতে নানা কথা। এমনকি, আমার বাড়িতে কে কে আছেন—আমার বাবা কী করেন—দাদা কী করেন ইত্যাদিও। এভাবে যখন আড়ষ্টতা প্রায় কাটিয়ে উঠেছি শম্ভুদা জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি আবৃত্তি করেন ?'

আমি সব ছেড়েছুড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় আসার আগে বাইরে নানা জায়গায় অভিনয়, আবৃত্তি করেছি। লোকের কাছে যতো প্রশংসা পেয়েছি, তা

১৮-১৯ বছরের বাস্তবতাজ্ঞানহীন একটা ছেলের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভাবখানা হয়ে উঠেছিল, যেন শিশিরবাবুর পরেই আমি! সমবয়সী অনেকের চেয়ে অনেক বেশি থিয়েটার করেছি, দেখেছি—নিজের ওপর অগাধ আস্থা। এহেন আমাকে এই প্রশ্ন! ক্ষমতা প্রকাশের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, বললাম—'হ্যাঁ, নিশ্চয়'। শম্ভুদা বললেন—'একটা আবৃত্তি শোনান তো'।

গলাটলা ঝেড়ে শুরু করতে যাবো, এমন সময় কী যেন একটা মনে হ'লো, বললাম—'আপনি আগে শোনান'। জীবনে যে ক'দিন বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করেছে সেদিনের সন্ধ্যা তার মধ্যে একটা। আর দ্বিতীয়বার বলতে হ'লো না—গলা ঝাড়লেন না, নড়ে চড়ে বসলেন না—যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি শুরু ক'রে দিলেন: 'ফাল্গুন মাধুরী তার.....' আবৃত্তি শেষ হ'লো। উনি একটু হাসলেন, ভাবখানা—'এই আর কী—!' আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই রইলাম। যে-কোনো বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। আমার কল্পনার ভিত নড়ে গেল। এরকম ক'রে কবিতা আবৃত্তি করা যায় আমি ভাবতেই পারিনি। চুপ করেই রইলাম। শম্ভুদা বললেন—'কই, আপনি করুন'। বললাম—'আমি অনেকদিন আগে করেছি, সম্প্রতি করিনি'। শম্ভুদা হেসে বললেন—'আপনার আর অনেকদিন আগে কী?' বললেন, কিন্তু আর জোরও করলেন না।

তারপর নানা কথা হতে থাকলো। থিয়েটারের দল গড়ার কথায় বললেন—'দেখা যাক। আসুন তো আগে, গল্পগুজব করা যাক, তারপর যদি সবার মনে হয় তখন করা যাবে। জোর ক'রে তাড়া ক'রে লাভ কী?'

যেতে থাকলাম প্রায় রোজই—কারণ আমার যে অন্য কোথাও বিশেষ কিছু করার নেই তা-ই নয়, এখানে সকলে মিলে দল তৈরি করতে পারলে থিয়েটার করার সম্ভবনা আছে। আর শম্ভুদাও বাড়ি থেকে বিশেষ বার হন না। রোজই যাই—গল্প হয়—বাংলাদেশের আগেকার থিয়েটার—এখনকার থিয়েটার—বিদেশের থিয়েটার—সব নিয়েই আলোচনা হয়। ক্রমে ক্রমে ঘরটা ভরতে লাগলো। শম্ভুদার পুরানো পরিচিতদের মধ্যে এলেন মহর্ষি, গঙ্গাদা, বিজনদা, সত্যজীবন, ইসরাইল, রবীন মজুমদার, জলদবাবু, ললিতাদি প্রভৃতি। মহর্ষি আনলেন কালী সরকার মশায়কে—বিজনদা আনলেন ঋত্বিক ঘটককে। আর নতুনদের মধ্যে আমি ছাড়া এলো শোভেন মজুমদার, জ্যাকেরিয়া, অশোক মজুমদার, অরীন্দ্রজিৎ, নৃপেন প্রভৃতি। মেয়েদের মধ্যে বৌদি, ললিতাদি তো ছিলেনই—মুক্তি গোস্বামী এলো। গীতা তখন বৌদির কাছেই থাকতো—সেও দলের আশেপাশে রইল। একদিন বটুকদা, জর্জদাও এলেন। এতো লোক যাতায়াত করতে লাগলো, কিন্তু যাকে বলে একটা সংঘবদ্ধ দল গড়ে ওঠা, তা হ'লো না। প্রায় সকলের যাতায়াতই

ছিল অনিয়মিত। নিযমিতদের মধ্যে আমি আর জ্যাকেরিয়া। ঠিক হ'লো: সকলে মিলে 'নবান্ন' করা যাক—তারপর দেখা যাবে।

সকলেই জানেন 'বহুরূপী'তে অভিনয় কবে কুড়ি বছর কেউ কোনো টাকা পায়নি। মাঝে-মধ্যে কাউকে কাউকে বিশেষ কাবণে কিছুদিনেব জন্য কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো এতোই বিশেষ এবং সীমিত ছিল যে সেগুলো কিছু না দেওয়ারই শামিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর থেকে 'বহুরূপী'তে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তো জানেনই না, যাঁরা আগেকার তাঁরাও বেশির ভাগই ভুলে গেছেন যে দলেব কাজ কিন্তু শুরু হয়েছিল কতকটা পেশাদারি ভিত্তিতে। ঠিক হয়েছিল 'নবান্ন' তিন রাত অভিনয় করতে যা খরচ হবে, সেটা চাঁদা দিয়ে করা হবে এবং যে যা পারে দেবে। বুকিং অফিস থেকে টিকিট বিক্রি করা ছাড়াও প্রত্যেককে নিজের নিজের পরিচিত লোকেদের কাছেও টিকিট বিক্রি করতে হবে। শেষে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যে যা চাঁদা দিয়েছে, সেটা আগে ফেরৎ দেওয়া হবে এবং তারপর যা থাকবে তা পারিশ্রমিক হিসাবে সকলকে দেওয়া হবে। পারিশ্রমিকের হার ঠিক করার জন্য সকলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: যাঁরা প্রায় একেবারে নতুন, যেমন—জ্যাকেরিয়া, শোভেন, মুক্তি প্রভৃতি; যাঁদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, যেমন—আমি, সত্যজীবন ইত্যাদি; আর যাঁরা অভিজ্ঞ, যেমন—মহর্ষি, কালীবাবু, শম্ভুদা, বিজনদা প্রভৃতি। কেউ খোলাখুলিভাবে বলেনি—কিন্তু সকলেরই আন্দাজ ছিল 'নবান্ন'র পরেও যদি কিছু করা যায় তাহলেও এই ভাবেই হবে।

যতদূর মনে আছে, ১৩, ১৪ এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর, '৪৮ সালে রঙমহলে 'নবান্ন' অভিনীত হ'লো। দল ঠিক সংঘবদ্ধ না হওয়ার ফলে মহলা থেকে শুরু ক'রে প্রচার, মঞ্চসজ্জার কাজ, আলোক-সম্পাতের কাজ প্রভৃতি সবই শম্ভুদাকেই করতে হ'লো। আমরা দু-একজন শুধু গায়ে-গতরে খাটলাম এবং রঙমহলে গিয়ে পালা করে টিকিট বিক্রি করলাম। মহলা চলাকালীন এবং অভিনয়ের সময়ে আমার শিক্ষা, উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার আলোচনায় এখন যাচ্ছিনা, কারণ তার ক্ষেত্র এটা নয়।

অভিনয়ান্তে আয়-ব্যয়ের হিসাব ক'রে দেখা গেল কিছু লোকসান হয়েছে। চাঁদা সকলে দিতে পারেনি—আমরা কয়েকজন কুড়িটাকা ক'রে দিয়েছিলাম, আর শম্ভুদা দিয়েছিলেন তিনশো টাকা। একদিনের টিকিট বিক্রির হিসাবেও দেখা গেল আশি টাকার গোলমাল। সেদিন যিনি টিকিট বিক্রি করেছিলেন, তিনি সে টাকা জোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু আমরা তাতে রাজি হইনি। তিনিও 'বহুরূপী'তে আর বেশি দিন থাকেননি এবং পরে চিত্রজগতে খুবই নাম করেন।

যাই হোক, পারিশ্রমিক কেউ-ই পেলেন না এবং কয়েকজনকে চাঁদার টাকা ফেরৎ দিতে পারলেও শম্ভুদা সমেত আমরা এক-আধজন লোকসানটা ব্যক্তিগত বলেই মেনে নিলাম।

একে কিছু কিছু লোকের মধ্যে বোঝাপড়ার গোলমাল গোড়া থেকেই ছিল এবং অন্যদের মধ্যেও বোঝাপডা ভালো ক'রে গড়ে ওঠেনি, তারপর অভিনয় ক'রে টাকাও পাওয়া গেল না—১১-এ, নাসিরুদ্দিন রোডে লোকের যাতায়াত কমতে লাগলো।

মহর্ষির কথাই ছিল উনি কম আসবেন। কালীবাবু তখনো দলের প্রতি সেভাবে আকৃষ্ট হননি, গঙ্গাদা কাগজের অফিস এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত, বিজনদার আসা বন্ধই হয়ে গেল; রবীন মজুমদার, জলদবাবুর কোনো খবরই রইলো না। তুলনায় যারা অল্পবয়সী, তাদের মধ্যে সত্যজীবন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, অশোক সংসার নিয়ে। অশোকের কথা অবশ্য একটু আলাদা ছিল। ও যখন আসে তখনই সংসারের অসুবিধার কথা বলেছিল এবং নিজেও কোনোদিন অভিনয় করেনি, করার ইচ্ছাও সেরকম ছিল না। থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসার জন্যই ও আসতো এবং পরেও দীর্ঘদিন নিয়মিতই এসেছে। শোভেন, ঋত্বিক এদের আসাও কমে গেল। ঠিক সেই সময়ে 'দক্ষিণী' শুরু হয়েছে, কলিম সেখানে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে শম্ভুদা, বৌদি, গীতু ছাড়া, আর আমি। আর মাঝে মাঝে সিউড়ি চলে গেলেও, জ্যাকেরিয়া। এভাবে লোকজন উবে যাওয়ায় আমি পীড়িত বোধ করলেও শম্ভুদা অবাক হননি—কারণ পুরোটা না হ'লেও অনেকটা ওঁর অঙ্কের মধ্যেই ছিল। তবে এই সময়টা আমার কাজে লেগেছিল। প্রত্যেকদিন গল্পগুজব ছাড়া পড়াশুনা, গলা তৈরি, হাঁটা-চলা-বলা-বসা-প্রভৃতির অভ্যাস ঠিকই চলছিল। এই হ'লো ১৯৪৮ সালের মোটামুটি ঘটনা।

কী করে দল সংঘবদ্ধ হতে লাগলো সে কথা বলি। 'নবান্ন'র যখন মহলা চলছিল তখনি শুনি তুলসী লাহিড়ী মশায় একটা নাটক লিখেছেন—মহর্ষির ভালো লেগেছে। শম্ভুদা নাকি একদিন নাটকটা শুনেও এসেছেন। 'নবান্ন'-র যেদিন শেষ অভিনয় সেদিনই ঠিক হয় পরের রবিবার সকালে শম্ভুদার বাড়িতে নাটক পড়া হবে।

নাটক পড়ার দিন পুরানো-নতুন অনেকেই হাজির। তুলসীবাবু দুটো বাঁধানো লম্বা খাতা বার করলেন—চোখে প্যাঁশনে আঁটলেন, তারপর সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। নাটকের নাম 'পথিক'। দু-অঙ্কের নাটক। পড়া শেষ হ'লো। মহর্ষি, কালীবাবু, গঙ্গাদা— সকলেই খুব প্রশংসা করলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ওঁরা একে একে চলে গেলেন। ঠিক হ'লো শম্ভুদা পরে যোগাযোগ

করবেন। বড়োরা চলে যাবার পর শম্ভুদা আমাদের নিয়ে পড়লেন—'তোমাদের কেমন লাগলো?' যেই একজন ভালো বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টের উকিলের মতো প্রশ্ন—কেন ভালো, কী ভালো? আবাব যদি-বা কেউ বলে ভালো লাগেনি, তাকেও প্রশ্ন—কেন ভালো লাগেনি, কোথায় ভালো লাগেনি? প্রশ্নের পব প্রশ্ন—প্রায় পাগল ক'রে দেবার মতো! কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস বেরিয়ে এলো—প্রায় সব নতুনদেরই প্রথম অঙ্ক খুব ভালো লেগেছে, দ্বিতীয় অঙ্ক একেবারে ভালো লাগেনি। শম্ভুদা খুবই হাল্কাভাবে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত যেন একটু বিস্মিতই হয়ে পড়লেন এবং বললেন—'ঠিক আছে, মহর্ষিকে বলবো। তোমরা ঠিকই বলেছো, দ্বিতীয় অঙ্ক আমারও ভালো লাগেনি'। অথচ যারা থিয়েটারের পুরানো লোক তাদের সবটাই ভালো লেগেছে। আসলে তখন নতুন ভালো নাটকের অভাব এতো বেশি ছিল যে নাটকের ধরনটা ভিন্ন হওয়ার ফলেই ওঁদের সকলের ভালো লেগেছিল।

মহর্ষির সঙ্গে কথা হ'লো। সবটা শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন—'এ-ই হয়'। শম্ভুদাকে বললেন—'তুমি তুলসীবাবুর সঙ্গে কথা বলো'। তুলসীবাবু এলেন। শম্ভুদা অনেকটা বাঁচিয়েই বললেন। তুলসীবাবু হেসে কথা শুরু করলেও শেষে চুপ ক'রে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণ পরে বললেন—'ঠিক আছে—তাহলে চলি'। তুলসীবাবু রাগ ক'রে, হাত ঝেড়ে চলে গেলেন। আর তাঁর দেখা নেই—সেই সময় থেকেই ক্রমে ক্রমে সকলের আসা কমতে থাকে।

আমরা কয়েকজন ব'সে রোজ গল্প করি—কী ক'রে দল গড়ে তোলা যায়, কী ক'রে নতুন নাটক যোগাড় করা যায়; অভিনয়, প্রযোজনায় আধুনিক রূপ কী হবে—সেইসব কথাই ভাবি। রোজ নানা রকম আলোচনা করতে করতে মনে হয়—শম্ভুদাই বলেন—যদি নতুন ক'রে কিছু করতে হয় তাহলে দলের চেহারা এবং ভিত্তি প্রচলিত পেশাদারি-রীতির অনুসরণ করলে হবে না। কারণ, তাহলে অর্থ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় দর্শকদের পছন্দ-মাফিক নাটকই করতে হবে, তারা যে পদ্ধতি দেখে অভ্যস্ত সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে; বড়ো জোর আলগা চটক হিসাবে এখানে-সেখানে একটু চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা যেতে পারে—তাতে কোনোদিনই ভালো নাটক ভালো ভাবে করা যাবে না।

হঠাৎ প্রায় মাস দুই পর একদিন তুলসীবাবু এসে হাজির। নাটক অদলবদল করেছেন। প্রথম অঙ্কের পর আর একটি নতুন অঙ্ক সংযোজন ক'রে নাটককে তিন অঙ্কে ভাগ করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কটা আমাদের অপূর্ব লাগলো। সবাই হৈ-হৈ ক'রে উঠলো। তুলসীবাবু খুবই সন্তুষ্ট হয়ে হাসতে লাগলেন এবং আমাদের

সকলের সঙ্গে স্নেহের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের কী হবে? ওটা যে ঠিক ওভাবে নাটকেব সঙ্গে যাচ্ছে না—যথেষ্ট বাঁচিয়েই শম্ভুদা সেকথা বললেন। তুলসীবাবুব হাসি বন্ধ হয়ে গেল। বললেন 'আচ্ছা'। আমাদের দিকে তাকালেনও না—আবাব হাত ঝেড়ে চলে গেলেন। শুনেছি পেশাদারি মঞ্চেও এ নাটক কবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

অবস্থাটা আবার যে-কে সে-ই। তবে এই সময়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি আমরা তৈরি করেছিলাম—একক, দ্বৈত এবং সমবেত কণ্ঠে। এই প্রসঙ্গে তিনটি মেয়ের কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন: শম্ভুদার সুবাদে আমাদের সকলের বড়দা শ্রী প্রবোধ মিত্রর মেয়ে সুলেখা, জ্যোতিনাথদার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষ) মেয়ে প্রভাতী আর ভারতী। ওদের ঐ বয়সের আবৃত্তি যাঁরা শোনেন নি, তাঁদের জন্য দুঃখ ছাড়া আর কিছু করার নেই। এদের মতো আবৃত্তি তার আগে এবং পরে আমি কখনো কোনো মহিলা-কণ্ঠে শুনিনি। বড়দা এবং শম্ভুদার কাছে এরা আবৃত্তি তৈরি করতো এবং 'বহুরূপী'তে প্রায়ই আসতো। সেই সময়ে বড়দা নানা কবিতা থেকে নানা অংশ বেছে মাঝে মাঝে একটা সম্পূর্ণ গাথা তৈরি করতেন—এবং সেগুলো আমরা আবৃত্তি করতাম। অংশ-বিশেষে কখনো একা, কখনো দু'জনে, কখনো সকলে মিলে আবৃত্তি করতাম। এই সময়েই আমাদের দিয়ে শম্ভুদা সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' ('ওগো সন্ন্যাসী কী গান ঘনাল মনে...') কবিতা তৈরি করান। ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে বালিগঞ্জ ইন্‌স্টিটিউটের অজয় সিংহের ব্যবস্থাপনায় কয়েকটি জায়গায় এরকম আবৃত্তি করতে শুরু করি। তারপর ক্রমশ এটা বাড়তে থাকে। ছেলেদের মধ্যে বেশির ভাগ সময় আমি আর জ্যাকেরিয়া, এবং পরে কখনো অশোক, আর মেয়েদের মধ্যে সুলেখা, প্রভাতী আর ভারতী, মাঝে মাঝে শম্ভুদা এবং কখনো-সখনো বৌদিও থাকতেন। পরে অবশ্য অনেকেই এতে অংশ নিতে থাকে।

তুলসীবাবু রাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন, আবার বেশ কিছুদিন পরে হাসিমুখে নাটক বগলদাবা ক'রে এক সন্ধ্যায় এসে হাজির। নাটকে আবার কিছুটা অদলবদল করেছেন। ততোদিনে তুলসীবাবুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং আর এক ধরনের আকর্ষণ জন্মে গেছে। ওঁর রাগ ক'রে চলে যাওয়াটাও যেমন সত্যি ছিল, আবার ফিরে আসাটাও—খালি হাতে নয়, কিছু কাজ ক'রে। কিছু কিছু রদবদলের প্রয়োজন বোধ করলেও নাটক এবার আমাদের ভালো লাগলো এবং ঠিক হ'লো—মহলা শুরু করা যাক, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন-মাফিক অদলবদলও চলবে। তুলসীবাবু খুব খুশি। এই সময়েই তুলসীবাবু জহর রায় বলে একটি ছেলেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন।

এই নাটক সম্বন্ধে একটা কথা বলে নিই। এটা Petrified Forest ব'লে একটা নাটকের অনুসরণ ছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ই প্রথম একথা বলেন। তবে এ নাটকের বাউডিদেব চবিত্র, সম্পূর্ণ দ্বিতীয় অঙ্ক এবং রাসু ধবের অপূর্ব চরিত্র তুলসীবাবুব সৃষ্টি।

এতোদিন পরে ঠিক হ'লো সকলকে চাঁদা দিতে হবে। নানা আলোচনার পর ঠিক হয় এক টাকা করে মাসিক চাঁদা দিতে হবে—পরে অবশ্য সেটা আট আনা করা হয়েছিল। জ্যাকেরিয়াকে দেওযা হ'লো হিসাব-নিকাশের ভার। আমার ভার মহলার। মোটামুটিভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে আমি আর শম্ভুদাই দলের নিয়মকানুনগুলো ঠিক করতাম। কিন্তু কালীবাবুকে চাঁদার কথা বলায় তিনি পরম বিস্ময়ের সঙ্গেই মহর্ষিকে বললেন: 'হ্যাঁ মশায়—এরা বলে কী? গোঁফ ওঠার পর তো কোনোদিন চাঁদা দিয়ে অভিনয় করিনি—বরং অভিনয় করে টাকা পেয়েছি। এখানে টাকাতো পাবোই না, আবাব চাঁদাও দিতে হবে।' মহর্ষি হাসলেন; কিন্তু সকলে চাঁদা দিতে শুরুও করলেন।

মহলা শুরু হ'লো, আবার এক এক ক'রে লোক আসতে শুরু করলো। বেশির ভাগ জায়গাতে কে কী চরিত্র করবে তাই নিয়ে অনেক সময়ে মনোমালিন্য হয়—সকলেরই দৃষ্টি থাকে বড বড পার্টের দিকে। কিন্তু এখানে এতোদিনের মেলামেশা এবং রাতদিন গল্পগুজবের ফলে একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, যাতে বড়ো পার্টের চেয়েও সকলে বেশি ভাবতো যে-কোনো পার্ট ভালো ক'রে অভিনয় করার কথা। একটা কথা প্রায়ই বলতাম, পার্ট বড়ো নয়, শিল্পী বড়ো কিনা সেটাই আসল কথা। শম্ভুদা বললেন—এ নাটকে তিনি অভিনয় করবেন না, লোক না পাওয়া গেলে তৃতীয় অঙ্কে 'সিংড়া সিং' ব'লে একটা চরিত্র ছিল সেটা করবেন। নায়ক 'অসীম রায়'-এর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তাঁর এক পুরানো বন্ধু শ্রী বিশ্বনাথ মিত্রকে দলে আনলেন এবং তাঁকেই অভিনয় শেখাতে শুরু করলেন।

নাটকের মহলাও চলছিল, কাটাকুটিও চলছিল এবং এখানে সেখানে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করছিলাম। কিন্তু ভালো ক'রে তখনো জমছিল না। '৪৯ সালের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে একদিন আমরা 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার অভ্যাস করছি—ইসরাইল নিয়ে এলো সবিতাব্রত দত্তকে। ইসরাইলের পুরানো বন্ধু—ভালো ক'রে অভিনয় শিখতে আর করতে চায়। প্রায় সেই সময়ই, একদিন ঋত্বিকের সঙ্গে এলো কুমার রায়। এলো, গল্প করলো, চলে গেল। এর আগে একদিন কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে শম্ভুদার সঙ্গে কুমারের আলাপ করিয়ে দেয় ঋত্বিক। কিন্তু সেদিন বা যেদিন দলে এলো ওই দিন, কুমার নিজে থেকে দলে আসার বা অভিনয় করার

ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। ঋত্বিক তখন একটা পার্ট করলেও, দলে তার হাজিরা ছিল অনিয়মিত। একদিন ঋত্বিক আসেনি—আসার কথাও নেই—কুমার এলো ঋত্বিকের খোঁজে। ঋত্বিক নেই শুনে একটু ইতস্তত ক'রে চলে গেল। শম্ভুদা বললেন—'ও ঋত্বিকের খোঁজে আসেনি—নিশ্চয় দলে আসতে চায়। অমর ওকে একটু কালচার করো'। কালচার করার ফল সবাই জানেন।

ঋত্বিকের মাধ্যমে কুমার এলো, কিন্তু ঋত্বিক চলে গেল। ও তখন ফিল্মে কাজ করার চেষ্টা করছিল, মহলায় আসতে প্রায়ই গোলমাল হ'তো, ফলে কাজের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। ওকে বলা হ'লো—ও চলে গেল।

'নবান্ন' অভিনয় করার প্রায় এক বছর পর 'পথিক' মঞ্চস্থ করা সম্ভব হ'লো। আমাদের তখনকার অবস্থায় 'পথিক' যেভাবে মঞ্চস্থ করা হয়েছে সে এক কাহিনী। দলের নিজস্ব কোনো রোজগার নেই—আমরা প্রায় প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক—অনেকের একেবারে কোনো রোজগার ছিলনা, আর যাদের ছিল তাদের সংসার চালিয়ে অভিনয়ের জন্য খরচ করার মতো উদ্বৃত্ত কিছুই থাকতো না। অথচ মঞ্চসজ্জা—যা ধরনে নতুন হলেও, বেশি খরচ পরিহার ক'রে মঞ্চস্থ করার কথা ভাবা হচ্ছিল। পোশাক-আশ ক—তা-ও খুব সাধারণ কিন্তু আলো ও অন্যান্য আহার্য-উপকরণ—এ সবে., জন্যও তো কিছু টাকার প্রয়োজন—তাছাড়া আছে মঞ্চভাড়া। কিন্তু টাকা কোথায়? ঠিক হয় কার্ড বিক্রি করে টাকা তুলবো আর তাই দিয়েই খরচ মেটানো হবে। মঞ্চ ভাড়ার জন্য যে-টাকাটা অগ্রিম দিতে হয়, সেটা আর কিছুতেই জোগাড় করতে পারছিলাম না। কালী সরকার মশায়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীজ্যোতির্ময় কুমার তখন কালিকায় অভিনয় করতেন এবং শেয়ালদা ই.বি.আর. ইন্স্টিটিউটের তদারক করতেন। কালীবাবুর মাধ্যমে তাঁর সাহায্য নিই—তিনিই প্রদেয় অগ্রিম টাকাটা বাকি রাখার ব্যবস্থা করে দেন; ফলে আমরা কার্ড ছাপাতে পারি এবং টাকা তুলে সব শোধ করি।

এতদিনের আগ্রহ, অপেক্ষা আর উৎসাহ—এসবের অবসান ঘটিয়ে ১৬ অক্টোবর, '৪৯-এ 'পথিক' প্রথম মঞ্চস্থ হ'লো। ছেলেমানুষি আর উৎসাহের বশে কত কাণ্ড যে করেছিলাম তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যাই হোক, প্রথম অভিনয়ের দিনই দল স্বীকৃতি পেল—নাট্যকার ও 'বহুরূপী'র বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শচীন সেনগুপ্ত মশায় এর একটা সুন্দর সমালোচনা লেখেন। আর একটা বড়ো ঘটনা ঘটলো—সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে প্রায় তিনশো টাকা বাঁচানো গেল—সেটা হ'লো আমাদের প্রথম রোজগার এবং মূলধন।

আর একটা কথা উল্লেখ করি। সে-সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা যাঁদের মনে আছে তাঁদের ভালো লাগবে—অন্যরাও এখনকার অবস্থার সঙ্গে

মিলিয়ে নিতে পারবেন। সাধারণ দর্শক এবং পরিচিত অনেকের 'পথিক' খুব ভালো লাগলেও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত কিছু কিছু লোকের তা ভালো লাগেনি। তাঁদের মনে হয়, যখন দেশ 'লাল' হয়ে গেছে, তখন নাটকে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হবার পর্যায় পর্যন্ত কেন দেখানো হ'লো—সম্পূর্ণ জয় কেন দেখানো হ'লোনা। এতে নাকি আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে পেছনে পড়ে গেছি এবং আমরা যে প্রতিক্রিয়াশীল তা প্রমাণ করেছি। আরো একটা কথা উল্লেখ করি—যাঁরা এ সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে টাকা তোলার জন্য আমাদের দিয়ে এই নাটক বহুবার অভিনয় করিয়েছেন! এটা যেমন এক ধরনের সমালোচনা ছিল তেমনি আবার কিছু লোকের মনে হ'তে লাগলো—আমরা উগ্র বামপন্থী, তাই এই নাটক করেছি।

এ-সময়কার দলের টাকার অভাব, লোকজনের অভাব, ভালো সমালোচনার অভাব, টিকিট বিক্রি করার অসুবিধার যে সমস্ত স্মৃতি মনে ভাসছে তারই সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কালের বহু ছবিও মনে আসছে। যেমন ১৯৫০ সালেই নিউ এম্পায়ারে 'ছেঁড়াতার' কিংবা '৫১ সালে শ্রীরঙ্গমে 'চার অধ্যায়'-এর প্রথম অভিনয়ের দিনের কথা। লোকমুখে শুনে শো-এর কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বহু দর্শক টাকা নিয়ে এসেছেন অভিনয় দেখতে এবং স্থানাভাবে ফিরে গেছেন। 'রক্তকরবী'র প্রথম অভিনয়ের দিনেও তাই—ম্যান্‌সন্‌ ইন্‌স্টিটিউটে আর আসন খালি নেই, তবু লোকে টাকা দিয়ে 'অনুগ্রাহক সদস্য' হয়ে গেছেন যাতে পরের অভিনয় দেখতে পান। এ কাহিনী এখানেই থেমে যায়নি—বারবার ঘটেছে। নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হবার আগেই তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ এসেছে। বহু নতুন নতুন লোকজন এসেছে, আর আমাদের বার বার বাছাই করতে হয়েছে—যাতে দলের সংহতি বজায় থাকে। যাঁরা আসতে চেয়েছেন তাঁরাও যাতে নিছক নাম, পয়সা বা অবসর বিনোদনের মোহে এসে আমাদের এবং তাঁদের নিজেদের সময় নষ্ট না করেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। সমালোচনার অভাবও ঘটেনি। কটু সমালোচনাও যেমন অনেক পেয়েছি, বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনাও মিলেছে বহু বিস্তর।

ম্যান্‌সন্‌ ইন্‌স্টিটিউট ছাড়াও আরও দু'এক বার অভিনয় হ'লো এবং মাঝে মাঝে অভিনয়ের কথাও হচ্ছে, কিন্তু দল আবার খালি হতে শুরু করলো। আর ঠিক সেই সময়ে বেশ কিছুদিনের জন্য শম্ভুদাকে বোম্বে যেতে হ'লো একটা ছবির কাজে। তখনই সবিতাব্রতর মাধ্যমে আসে নির্মল চ্যাটার্জী; মহর্ষি আনেন তাঁর বড় ছেলে শঙ্কর ভট্টাচার্যকে। কিন্তু তখন অভিনয় হচ্ছিল খুবই কম, ফলে বেশির ভাগ সদস্যরই আসা-যাওয়া অনিয়মিত হতে লাগলো এবং এরই মধ্যে

কুমারকেও চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যেতে হ'লো কয়েক বছরের জন্য। পাকাপাকি ভাবে কুমার ফিরে আসে আবার ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

কিছুদিন পর শম্ভুদা ফিরে এলেন। তা'তে একদিক থেকে পবিস্থিতির উন্নতি হ'লেও নতুন নাটকের অভাব, টাকা পয়সার অভাব, নাটক আর তার প্রযোজনার ভালো সমালোচনার অভাব—আমাদের খুবই বিব্রত করতে শুরু করলো। নিজেদের মঞ্চ তো দূরস্থান, কোনো মঞ্চই নিয়মিত না পাওয়ায় একবার অভিনয় ক'রে যে আবহাওয়া তৈরি হয়, দীর্ঘকাল পরে অন্য কোথাও সেই অভিনয়ের আয়োজন করার সময় তার আর কোনো রেশই অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া অভিনয়ের পর তো সকলেব বাড়ি গিয়ে গিয়ে সমালোচনা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়—যদিও সে চেষ্টা বহুবার করা হয়েছে। যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, যাঁদের ভালো লাগে তাঁরাও পুরোটা বিশ্লেষণ করেন না, আর যাঁদের ভালো লাগে না, তাঁরা তো আরো-ই করেন না। এইসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমাদের মনে হয়—যে-কোনো উপায়ে যদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাট্যরসিক বহু লোককে দলের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হ'তে পারে। ওই সব ব্যক্তি দলের কারো না কারো সঙ্গে প্রত্যক্ষভা্ব পরিচিত হওয়ার সুবাদে আমাদের সমালোচনা সংগ্রহ করতে সুবিধা হবে বং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে পুরো সমাজের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারা যাবে। তাছাড়া অভিনয় দেখার জন্য তাঁদের কাছ থেকে আগাম টাকা সংগ্রহ করতে পারলে আমাদের প্রযোজনার সুবিধা হবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক লোককে উৎসাহিত করতে পারলে যে নাটকই করি না কেন প্রথম অভিনয় করা যাবে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। এইসব ভেবে '৫০ সালের গোড়ার দিকে পুরো বছরের একটা কার্যসূচি তৈরি করি। ঠিক হয় আবৃত্তি, গান ইত্যাদির অনুষ্ঠান ছাড়াও বছরে অন্তত চারটে নতুন নাটক অভিনয় করবো এবং 'অনুগ্রাহক সদস্য' হিসাবে নাট্যরসিক দর্শকদের দলের সঙ্গে যুক্ত করবো—তাঁরা চাঁদা দেবেন বছরে বারো টাকা কিংবা আট টাকা। তাঁরাই হবেন আমাদের প্রথম দর্শক, প্রথম সমালোচক। তাঁদের সমালোচনা এবং প্রতিক্রিয়া বিবেচনা ক'রে প্রয়োজন বোধ করলে অদলবদলও করবো এবং তারপর হবে সাধারণের জন্য অভিনয়।

তিনটে নাটক আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ক'রে ফেলি। শ্রীসঞ্জীব (শম্ভু মিত্র)-এর 'উলুখাগড়া', তুলসীবাবুর 'ছেঁড়াতার' এবং শ্রীকানাই বসু-কৃত রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র নাট্যরূপ। চতুর্থ নাটক পরে ঠিক করা হবে স্থির হয়। একটি ফোল্ডার ছাপিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য বলা হয়: 'আমরা ভালো নাটক ভালোভাবে করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস আছে....' ইত্যাদি। দলের কোনো কোনো শিল্পীর নামও তাতে থাকে।

এতদিন দলের কোনো নাম ছিল না। এই সময়ে নামকরণ করা হয়। নামকরণ এতদিন ইচ্ছা করেই করা হয়নি। কারণ, দেখেছিলাম যে বহু দলই বেশ রাশভারী নাম রেখে, মহৎ সব উদ্দেশ্য ঘোষণা ক'রে কাজ আরম্ভ করে; কিন্তু তাদের জন্মদিন আর মৃত্যুদিনের মধ্যে প্রায় কোনো ব্যবধানই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ঠিক হয়, আগে দেখা যাক আমরা কিছু করতে পারি কিনা—পারলে তখন একটা নাম ঠিক করা যাবে। প্রচুর অসুবিধার মধ্যে 'পথিক' করার পর মনে হ'লো আমরা কাজ করতে পারবো এবং সেই কাজের সুবিধার জন্যই একটা নাম স্থির করা প্রয়োজন। যথারীতি বহু লোক বহু নাম প্রস্তাব করলো। শম্ভুদা বললেন—'শিল্পায়নিক' নাম রাখলে কেমন হয়?' ইসরাইলের পছন্দ হ'লো না—ও নাম নিয়ে রসিকতা করতে লাগলো। মহর্ষি বললেন—'আরে আমরা তো সব বহুরূপীর দল—ওই নামই রাখো'। তা-ই হলো, আমরা হয়ে গেলাম 'বহুরূপী'।

একটা কথা এখানে বলে নিই। ঠিক হয়েছিল—শম্ভুদা পরিচালনা করবেন 'উলুখাগড়া' আর 'ছেঁড়াতার', কালীবাবু করবেন 'কাবুলিওয়ালা'। শেষপর্যন্ত 'কাবুলিওয়ালা' আর হ'য়ে ওঠেনি।

'নবান্ন' দিয়ে কাজ শুরু করলেও 'পথিক'-এ যেমন দল প্রথম স্বীকৃতি পায়, তেমনি অনুগ্রাহক-প্রথা প্রবর্তন ক'রে নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং নামকরণের পর দল সংহত হয়, সংগঠনের পূর্ণ-মর্যাদা পায় এবং ক্রমশ নিজের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে থাকে।

পরের কাহিনীতে যাবার আগে দু-একটা খবর দিয়ে দিই—অনেকের মজা লাগবে। কাজ আরম্ভ করার পর চব্বিশটা বছর কেটে গেছে। চল্লিশের দশকের শেষের দিক থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত 'বহুরূপী'র যা কাজ, তা বাংলাদেশের থিয়েটারে তো বটেই, ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসেও মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং ভারতের বাইরেও 'অল ইণ্ডিয়া ড্রামা ফেসটিভ্যাল' এবং 'দি ওয়ার্ল্ড থিয়েটার কনফারেন্স'-এর মাধ্যমে 'বহুরূপী' আজ একটা বিশেষ নাম। তাই যে-দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি তা জানতে লোকের ভালো লাগবে।

অনেকেই জানেন, বহুবার অর্থের লোভনীয় প্রস্তাবের বিনিময়েও অভিনয় করার আমন্ত্রণ আমরা নানা কারণে গ্রহণ করিনি। কিন্তু অভিনয় করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত অভিনয় না ক'রে ফিরে আসতে হয়েছে এরকম ঘটনাও আছে। প্রথমটা ঘটে '৫০ সালের সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে। কসবার একটি সংস্থা, কসবা সিনেমা হল 'পূর্বাশা'য় 'পথিক' অভিনয় করার জন্য আমাদের অনুরোধ করে। অভিনয় বাবদ দক্ষিণা ১০১ টাকা মোট খরচ হিসাবে তখন আমরা নিতাম। সকাল ১০টায় অভিনয় হবে, যাতে দ্বিপ্রাহরিক সিনেমা প্রদর্শনীতে কোনো অসুবিধা না হয়।

অভিনয়ের দিন সকাল সাতটা আন্দাজ শম্ভুদার বাড়ি এসেছি, একসঙ্গে যাবো। আমরা বার হবো এমন সময়ে অশোক মজুমদার হন্তদন্ত হ'য়ে হাজির হ'লো। বাতে সিনেমার পর্দা সবাবার কথা ছিল, যাতে মঞ্চসজ্জা, আলো প্রভৃতির কাজ রাত্রেই শেষ ক'রে রাখা যায়---কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনো কিছুই করেনি। আমাদের লোকেবা সারারাত অসহায়ের মতো বসে মশার কামড় খেয়েছে—সকালে উদ্যোক্তাদের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে অশোক এসেছে আমাদের খবর দিতে। তাড়াতাড়ি গেলাম। সিনেমার পর্দা সরিয়ে মঞ্চ, আলো প্রভৃতি সব ঠিক ক'রে অভিনয় শুরু করতে করতে প্রায় বেলা বারোটা। যখন দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় চলছে সিনেমা কর্তৃপক্ষের তাগাদা প্রবল হয়ে উঠলো---ওদের দ্বিপ্রাহরিক সিনেমা প্রদর্শনের গোলমাল হবে। আমরা উপায়ান্তর না দেখে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ ক'রে অভিনয় বন্ধ করলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটে রঙমহলে। সম্ভবত শ্রী এন.সি. গুপ্ত তখন রঙমহলে রিসিভার। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতি রবিবার সকালে আমরা অভিনয় করবো স্থির হয়। মঞ্চ, প্রচার এবং টিকিট বিক্রির ভার নিলেন উনি, আর আমরা অভিনয়ের। কিন্তু একদিনের এক লাইনের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ছাড়া প্রচার বলতে আর কিছুই হ'লো না। আমাদের তখন কিছুটা নাম হয়েছে। তাছাড়া নাটকে মহর্ষি, তুলসীবাবু, কালীবাবু, শম্ভুদা, গঙ্গাদা প্রভৃতি অভিনয় করবেন—যাঁদের ব্যক্তিগত নাম বেশ ছিল। কিন্তু সকালে গিয়ে ওখানকার অবস্থা দেখে কেমন সন্দেহ হ'তে লাগলো। নাটকের প্রথমেই যাঁদের মঞ্চে যেতে হবে তাঁরা মেকআপ নিতে শুরু করলেন। হঠাৎই একজন খবর দিল—বুকিং অফিস বন্ধ ক'রে দিয়েছে—যে দু-চার জন লোক সামনে ছিল, তাদের টিকিটের পয়সা ফেরত দিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর এন.সি. গুপ্ত মশায় এলেন, বললেন—টিকিট বিক্রি বিশেষ হয়নি বললেই হয়, এ অবস্থায় অভিনয় হ'তে পারেনা ভেবে যে দু-চার জন টিকিট কিনেছিল তাদের টাকা ফেরত দিতে এবং বুকিং বন্ধ করতে তিনিই বাড়ি থেকে নির্দেশ দিয়েছেন। বললেন—তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। লোকে ভালো জিনিস নেয় না ব'লে খুব দুঃখ প্রকাশও করলেন। আসলে, শম্ভুদার সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করার পরই তিনি কোনো কারণে মন বদলেছিলেন। সম্ভবত অন্য উপায় না দেখে এই পথই বেছে নিয়েছিলেন। আমরাও মেকআপ তুলে বেরিয়ে পড়লাম সোজা মহর্ষির বাড়ি।

অনুগ্রাহক-প্রথা প্রবর্তন করার সময় যেমন আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের দর্শকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা ভেবেছিলাম, তেমনি ভেবেছিলাম এমন সব নাটক একের পর এক করার কথা, যাতে সমাজ-সভ্যতার নানা দিক বিভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করা যায়। 'পথিক' করার সময় অবশ্য ভাবনাটা

এ ভাবে ছিল না, কারণ তখন এতো কথা ভাবার মতো অবস্থাই দলের ছিল না। কিন্তু '৫০ সালে যখন পুরো বছরের কর্মসূচি তৈরি ক'রে কাজ আরম্ভ করা হয়, তখন থেকেই এ ভাবনা এসেছে এবং সেইভাবেই একটার পর একটা নাটক করার চেষ্টা করেছি। যেমন 'পথিক' নাটকের পশ্চাৎপট হ'লো বাংলাব কয়লাখনি অঞ্চল—সেখানকার শ্রমিকরাই এ নাটকে মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে থাকে, বলা যায় এটা তাদেরই নাটক। তারপরেই উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত লোকেদের নিয়ে লেখা নাটক 'উলুখাগড়া' এবং পববর্তী নাটক উত্তরবঙ্গের চাষীদের জীবন নিয়ে লেখা 'ছেঁড়াতার'। এগুলো ঘটনাচক্রে ঘটেনি, এ রকম করেই ঘটানো হয়েছিল।

আর এক ধরনের ভাবনা কাজ করতো—যাতে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা, বিদেশী মহৎ নাটকের রূপান্তরের কথা, দেশের প্রবীণ এবং প্রথিতযশা নাট্যকার এবং তরুণ ও নবীন নাট্যকারদের কথাও থাকতো। '৫০ থেকে '৫৩ সাল পর্যন্ত 'বহুরূপী'র কাজের মধ্যেই আমাদের এসব ভাবনার প্রয়োগ দেখা যাবে। এসব নিয়ে 'বহুরূপী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বহুবার লেখা হয়েছে, তাই সেইসব বিবরণের মধ্যে না গিয়ে আমাদের তখনকার চিন্তা এবং কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত শুধু দিলাম।

নামকরণ এবং অনুগ্রাহক-প্রথা প্রবর্তনের পর 'উলুখাগড়া' করি। 'বহুরূপী'র এই নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনার খুব প্রশংসা হয়। কিন্তু নামকরণের পর প্রথম বড়ো ঘটনা হ'লো 'বহুরূপী'-আয়োজিত প্রথম নাট্যোৎসব এবং 'ছেঁড়াতার'-এর প্রযোজনা।

'ছেঁড়াতার' নাটকের কাহিনীর কাঠামো একদিন তুলসীবাবু আমাদের এসে শোনান। আমরা সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠি—বিশেষ করে বৌদি তাগাদা দিতে থাকেন তুলসীবাবুকে। তুলসীবাবুও উৎসাহিত হয়ে 'ছিন্নতার' নাম দিয়ে নাটক লিখে আনেন—সেই নাটকই আমাদের হাতে হয় 'ছেঁড়াতার'। আমাদের খুব ভালো লাগে, সঙ্গে সঙ্গে মহলার ব্যবস্থা হয়—তুলসীবাবু সকলকে 'বাহে' ভাষা তোলাতে থাকেন।

মহলা চলছে কিন্তু ভালো ক'রে হচ্ছে না। নাটকে একটি ছোটো ছেলের চরিত্র আছে: 'বসির'। সেই চরিত্রে অভিনয় করার ছেলে কিছুতেই যোগাড় করতে পারা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে 'উলুখাগড়া' হয়ে গেছে—'কাবুলিওয়ালা' হবার সম্ভবনাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না। হঠাৎ একদিন শ্রী সলিল চৌধুরী এসে অনুরোধ করে 'পীস কনফারেন্স'-এ অন্তত আধঘণ্টার জন্য নতুন কিছু প্রোগ্রাম করতে। হাতে সময় মাত্রই কয়েকদিন ছিল, নতুন কিছু করা সম্ভব

হচ্ছিল না, অনেক ভেবে বলা হয়—'ছেঁড়াতার' থেকে একটা দৃশ্য করা যায়, কিন্তু ছোটো ছেলের অভাবে তাও করা যাবে না। ও উৎসাহিত হয়ে বলে ছোটো ছেলে যোগাড় করে দেবে। তার পরদিনই শ্যামল ব'লে একটি ছেলেকে নিয়ে আসে। ছেলেটি খুবই সপ্রতিভ এবং মহলা দিয়ে দেখা গেল অভিনয়ও বেশ করে। ভবানীপুরে স্মাটা গ্রাউন্ডে প্রায় দু-হাজার লোকের সামনে আমরা 'ছেঁড়াতার'-নাটকের 'তাল্লাক'-এর দৃশ্যটি অভিনয় করলাম। সে এক অপূর্ব ঘটনা! একই দৃশ্যে প্রায় সাত-আটবার হাততালি দিয়ে দর্শক অভিনন্দন জানালো। লোকের মুখে মুখে এ নাটকের প্রচার শুরু হ'য়ে গেল। সবাই বুঝতে পারলো শিল্পগত সাফল্য ছাড়াও এ নাটকে বাণিজ্যিক সাফল্যও আসবে। তা-ই হ'লো। 'রক্তকরবী' হওয়ার আগে পর্যন্ত 'ছেঁড়াতার'-ই সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ছিল। এ নাটক 'বহুরূপী'কে সম্মান দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে এবং আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিতি দিয়েছে।

'পথিক' হয়েছে, 'উলুখাগড়া' হয়েছে—কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে কয়েকবার অভিনয়ও করেছি। কাগজে-পত্তরে ছাড়াও লোকের মুখে মুখে প্রশংসাও ছড়াতে শুরু করেছে—দলেও নিত্য নতুন লোকজন আসছে, কিন্তু তবু আমরা যেন ঠিক খুশি হতে পারছিলাম না।

আমরা যখন প্রথম কাজ শুরু করি, তখনকার বাংলাদেশের থিয়েটারের সামগ্রিক চেহারাটা মনে করা যাক: তখনো নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস, নাট্যসম্রাজ্ঞী প্রভাদেবী, সরযূদেবী, সর্বস্নেহধন্যা রাণীবালা ছাড়াও মহর্ষি, রবি রায়, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি নাট্য-ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা বিভিন্ন মঞ্চে কেউ নিয়মিত কেউ অনিয়মিত ভাবে যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু হচ্ছিল না। তখন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে দর্শক আকর্ষণের একমাত্র পন্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল প্রথিতযশা বিভিন্ন শিল্পীদের সমাবেশ ঘটিয়ে বর্ধিত হারে টিকিট বিক্রি করা। মাঝে মাঝে কোনো কোনো রঙ্গালয়ে যেসব নতুন নাটক হচ্ছিল, সেগুলোর বেশির ভাগ শুধু নামেই নতুন। নাটকের দিক দিয়ে বা অভিনয়, প্রযোজনার দিক দিয়ে তা সার্থক হয়ে উঠছিল না। বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পরসিক দর্শক ছাড়াও থিয়েটারগামী সাধারণ দর্শকও থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছিল। প্রায় প্রতিটি রঙ্গালয়েরই তখন এই অবস্থা। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের বাইরেও তখন কোনো উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রচেষ্টা ছিল না। কয়েক বছর আগে 'ভারতীয় গণনাট্য'র প্রযোজনায় এবং শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যর পরিচালনায় 'নবান্ন' এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলেও তারপরে আর সেরকম কিছু করতে না পারায় সেটা একক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হ'তো। তখন বাংলাদেশের নাট্যক্রিয়াকর্মে

'গণনাট্য সংঘ'র সে-রকম বিশেষ ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা তখন সবাই 'গণনাট্য সংঘ'র বাইরে।

এই পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ শুরু করি। 'পথিক' এবং তারপর 'উলুখাগড়া' নাট্যরসিক মহলে প্রচুর প্রশংসা, আলোচনা এবং উৎসাহ সঞ্চার করলেও থিয়েটারের প্রতি সাধারণ ভাবে সকলের যে আগ্রহ কমে গিয়েছিল তার প্রভাব কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না।

নিজেদের কোনো মঞ্চ না থাকায় এবং পেশাদারী রঙ্গালয়ে নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট দিন না পাওয়ায় আমরা নিয়মিত অভিনয় ক'রে যেতে পারছিলাম না—ফলে নানা শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা বেড়ে উঠছিল না এবং একটি অভিনয় ক'রে যে আবহাওয়া তৈরি হচ্ছিল, বহুদিন বাদ দিয়ে অন্য একটা মঞ্চে গিয়ে দ্বিতীয় অভিনয় করার সময় তার কোনো রেশ অবশিষ্ট থাকছিল না। তখন ঠিক করি—কোনো একটা মঞ্চে প্রতিটি নাটক কয়েকবার ক'রে নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় করবো। যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে লোকে আকর্ষণ বোধ করবেই এবং শেষপর্যন্ত থিয়েটারের প্রতি সকলের আগ্রহ নতুন ক'রে গড়ে উঠবে।

কিন্তু কোনো রঙ্গালয়ই পাওয়া গেল না। তখন শম্ভুদাই প্রস্তাব করেন নিউ এম্পায়ার-এর কথা। এ সমস্ত আলোচনার প্রাথমিক পর্বে প্রবীণেরা কেউ-ই ছিলেন না। শম্ভুদার এ প্রস্তাবে আমরা যেন চমকে উঠলাম। নিউ এম্পায়ারে ভাড়া বেশি, তাছাড়া সাধারণ কোনো দলই সেখানে বিশেষ অভিনয় করে না। পেশাদারি রঙ্গালয়ের একটা সুবিধা সেখানে সপ্তাহে তিনদিন নিয়মিত অভিনয় হওয়া ছাড়াও অন্যান্য শৌখিন বা অফিসের নাট্যদলগুলি অন্যান্য দিন অভিনয় করে এবং সেখানে দর্শকদের নিয়মিত যাতায়াতের ফলে প্রচারের জন্য কাগজ এবং দেওয়ালে পোস্টার-এর ওপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু অসুবিধা হ'লো নিজেদের পছন্দ মতো পর পর কয়েকটা দিন কোনো রঙ্গালয়েই পাওয়া যাচ্ছিল না—উত্তর কলকাতায় সকালে অভিনয় করা তখন অসম্ভব ছিল বললেই হয় এবং মঞ্চ-মালিক থেকে শুরু ক'রে সেখানকার সমস্ত বিভাগীয় কর্মীর আচার-ব্যবহার এবং সহযোগিতা নতুনদের প্রতি যে সন্তোষজনক ছিলো—একথা বলা চলে না।

নিউ এম্পায়ার-এর মঞ্চ-প্রেক্ষাগৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো বটেই, সামগ্রিক ব্যবস্থাও ভালো এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে হওয়ার ফলে সব দিক থেকেই দর্শকদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। তার থেকেও বড় কথা নিজেদের পছন্দমত দিন পাওয়া যাবে। সব দিক ভেবে আমরা এইখানেই অভিনয় করবো বলে স্থির করি। একদিন

সকলের সঙ্গে বসে আলোচনা করা হ'লো—সকলেই খুব খুশি কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে লোকসান হবার আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগলেন সবাই। শুধু আমরা ক'জন ভীষণই উৎসাহিত—মনে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা লাগতে শুরু করেছে। পরে নানা আলোচনা ক'রে ঠিক হয়—কয়েকটা দিন নিয়ে প্রথামাফিক পর পর একই নাটকের অভিনয় না ক'রে যদি কয়েকটি নাটক নিয়ে উৎসবের মতো আয়োজন করি তাহলে নিশ্চয় ভালো হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

'পথিক', 'উলুখাগড়া' তৈরি ছিল এবং 'ছেঁড়াতার'-এর মহলা চলছিল। ঠিক হ'লো— '৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রতি রবিবার এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম রবিবার সকালে আমরা অভিনয় করবো। সকলের সঙ্গে কথা বলা শুরু হ'লো—কাগজের লোকেদের সঙ্গেও এক সন্ধ্যায় একটি হোটেলে মিলিত হ'য়ে বলা হ'লো আমাদের উদ্দেশ্য। সেই প্রথম কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়া নানা রং-এর পোস্টার ছাপানো হ'লো, হোর্ডিং তৈরি করা হ'লো—তারপর মহলা-শেষে সকলে মিলে বেরিয়ে পড়া হ'তো সেই পোস্টার বিশেষ বিশেষ জায়গায় লাগাবার জন্যে—হোর্ডিং টাঙানোর জন্য। সব কাজই আমাদের করতে হ'তো—কারণ এসবের জন্য পয়সা খরচ করা সম্ভব ছিল না। ক্রমে ক্রমে শহরের সাধারণ লোকদের মধ্যে এই নাট্যোৎসব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এই উৎসবেই হ'লো 'ছেঁড়াতার'-এর প্রথম অভিনয়।

যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে ফল বেশি পাওয়া গেল। 'উলুখাগড়া'য়, বিশেষ করে 'পথিক'-এ বিক্রি ভালো হ'লেও 'ছেঁড়াতার' হ'লো পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে। প্রতি রবিবার লোক আসছে—ভিন্ন ধরন, ভিন্ন গঠনের নাটক দেখতে এবং অভিনয় শেষে ভেতরে এসে অকুণ্ঠ অভিবাদন জানিয়ে যাচ্ছে। দেড় মাস ধরে এই ঘটনা চলতে লাগলো। যে-আবহাওয়া দু-আড়াই বছরে গড়ে তোলা যায়নি, তা এই দেড়মাসে তৈরি হ'লো। সমস্ত কাগজপত্রে 'বহুরূপী'র প্রশংসা, লোকের মুখে মুখে 'বহুরূপী'র নাম। কেউ বলে 'পথিক' অপূর্ব, কেউ বলে 'উলুখাগড়া' ভালো, কেউ বলে 'ছেঁড়াতার'-এর তুলনা হয়না! 'উলুখাগড়া' করার পর ধরন সামান্য বদলালেও মোটামুটিভাবে যাঁরা প্রশংসা করতেন, তাঁদের প্রশংসার মধ্যে কোথায় যেন একটু সহানুভূতি মেশানো থাকতো। কিন্তু এই 'নাট্যোৎসবে'র পর আলোচনা-প্রশংসার ধরনই বদলে গেল। সমস্ত সমালোচনা-প্রশংসার মধ্যে সম্মান আর মর্যাদার ছাপ প্রকাশ পেলো। উৎসবের সমস্ত নাট্যাভিনয় পর্যালোচনা ক'রে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন: 'যদি এক হাজার লোক একশ ক'রে টাকা দেয়, কিংবা একশ লোক এক হাজার ক'রে টাকা দেয় তাহলেই 'বহুরূপী'র অভিনয়ের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করা যেতে পারে।'

এতো হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু হিসাবের খাতায় শেষপর্যন্ত দেখা গেল কিছু

লোকসান হয়েছে। টিকিট বিক্রি ভালোই হয়েছিল কিন্তু খরচ হয়েছিল তার থেকে বেশি, প্রায় সমস্ত খাতেই। আমবা যে-কজন একটু বেশি উৎসাহ নিয়ে জোর করেছিলাম, একটু সঙ্কোচ বোধ করতে শুরু করলাম। দলেব অনেকে খরচ-খরচার ভয় আগে থেকে দেখালেও 'নাট্যোৎসব' হয়ে যাবার পর সকলেই খুব খুশি—সর্বত্র 'বহুরূপী' নিয়ে আলোচনা—দলের প্রবীণদের মধ্যেও কাজের উৎসাহ বেড়ে গেছে। আমরা কয়েকজন আবার বসলাম, অনেক আলোচনা ক'রে ঠিক করলাম—লোকসানের কথা এখনি সকলকে বলা হবে না, কাজেব প্ল্যান এমনভাবে করবো যাতে সমস্ত টাকা তুলে দিতে পারি—তখন বললেই হবে। আমি, সবিতা প্রভৃতি কয়েকজন 'নাট্যোৎসবে'র প্রস্তুতিপর্বে কিছু টাকা দিয়েছিলাম, ওগুলো রয়েই গেল। কিছুদিন পরে যখন দলের আর্থিক সংগতি বাডতে লাগলো তখন বছরের শেষে সকলকে বলা হ'লো। অনেকেই বললেন যে তাঁদের আন্দাজ ছিল যে কিছু লোকসানই হয়েছে, কিন্তু ছোটোরা যখন চিন্তা এবং কাজের ভার নিয়েছে, তাঁরা কিছু বলতে চাননি—এখন সবাই খুশিই হলেন। এই 'নাট্যোৎসবে'র পর থেকেই 'বহুরূপী'র কাজ বাড়তে লাগলো—সম্মান, প্রতিষ্ঠাও বাড়তে লাগলো।

কাজ শুরু করা হয় ১৯৪৮ সালে, নামকরণ হয় ১৯৫০ সালে, আর সরকারি কানুন মতে তাকে সমিতিবদ্ধ করা হয় ১৯৫২ সালে। আইন-মাফিক প্রয়োজন, দলের উদ্দেশ্য, নিয়মকানুন সব লেখা হ'লো, টাইপ করা হ'লো। কিন্তু সব সাধ, কল্পনা বা কর্মপদ্ধতি কি লিখেই ঠিক ক'রে বোঝানো যায়? তাই টাইপ করা মেমোরেন্ডাম আর রুল্‌স্‌ দেখে 'বহুরূপী'র চেহারা কেউই ভালো ক'রে বুঝতে পারবেন না। আসলে, 'পথিক'-এর মহলা চলার সময় থেকেই প্রতিদিনের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত নিয়মকানুনও যেমন তৈরি হতে হতে যাচ্ছিল, তেমনি আমাদের সমস্ত সাধ, কল্পনাও স্পষ্ট চেহারা নিচ্ছিল। সেদিনের সব কাজ-কর্মই ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যেই করা হতো। নাটক, অভিনয় নিয়েও যেমন আলোচনা করতাম, বোঝাবার চেষ্টা করতাম, তেমনি প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিষয়ে ভালো ক'রে জানবার চেষ্টাও করতাম—ক্রমে ক্রমে সেটা একটা বড়ো পরিবারের আকার ধারণ করলো। তাই বহুদিন পর্যন্ত কোনো গোলমাল হ'লে বা বির্তক হ'লে আমরা আমাদেরই অনুসৃত পদ্ধতি উল্লেখ করতাম এবং তারই ভিত্তিতে কথা বলতাম—এতে আলোচনারও সুবিধা হতো।

কয়েকটা নিয়মকানুন এবং 'কমিটি' কী করে তৈরি হ'লো, বলি। ১১-এ, নাসিরুদ্দিন রোডে শম্ভুদা, বৌদি, গীতু—এঁরা থাকতেন। সুতরাং যে যখনি যাকনা কেন—এঁরা হাজির। আমাদের কয়েকজন—যেমন আমি আর জ্যাকেরিয়া, সবিতা আসার পর সে এবং মাঝে মাঝে অশোক, অফিস থেকেই সোজা চলে আসতাম ছ'টার মধ্যেই। যারা অফিস থেকে বাড়ি ঘুরে আসতো তাদের আসতে সাড়ে

ছ'টা-সাতটা হয়ে যেত এবং মাঝে মাঝে অনুপস্থিতও হয়ে যেত। আর কিছু লোকের আসা-যাওয়াটা একটু বেশি অনিয়মিত ছিল। ফেরবার ব্যাপারেও তাই। সকলের আসা এবং যাওযার সমযের গবমিলের ফলে কাজের খুবই অসুবিধা হতো। তখন ঠিক হ'লো—মহর্ষি, তুলসীবাবু, কালীবাবু আর গঙ্গাদা ছাড়া সকলকেই রোজ আসতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে সকলকেই উপস্থিত থাকতে হবে, আর সেই 'নির্দিষ্ট সময়টা' যতো বেশি হয় ততো ভালো। সময় ঠিক হ'লো সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে রাত ন'টা। আগে আসা কিংবা দেরি ক'রে যাওয়া সকলের ইচ্ছাধীন। একটা খাতা করা হ'লো, তাতে রোজকার তারিখ দিয়ে সময়ে এবং অসময়ে আসা সকলের নাম দুই ভাগে লেখা হতে থাকলো।

প্রথম প্রথম সবার ভালো লাগলো, মজাও লাগলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই যাঁরা মাঝে মাঝে দেরি করতেন, তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সদ্ভাবে একটু চিড় খেতে লাগলো, কারণ তদারকিটা আমিই করতাম আর খাতাটাও আমিই রাখতাম। আবার সকলে বসা হ'লো, ঠিক হ'লো—একটা কমিটি করা যাক—আলোচনা ক'রে সমস্ত সিদ্ধান্ত সেই কমিটি নেবে। আমি, ইসরাইল, অশোক, সবিতা আর জ্যাকেরিয়া সেই প্রথম কার্যকরী সমিতির সভ্য হলাম। শম্ভুদা কমিটিতে থাকলেন না, কিন্তু প্রায় সব মিটিংয়েই তাঁকে আমরা পরামর্শদাতা-উপদেষ্টা হিসাবে ডাকতাম। দ্বিতীয় বছর থেকে বৌদিও সেই কমিটির সভ্য হলেন। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো: আমরা কয়েকজন রোজই যেতাম অনেক আগে, থাকতামও পরে অনেকক্ষণ—যার ফলে বহুদিনই বৌদিকে বকে-বকে আমাদের ঘর-ছাড়া করতে হতো। তাছাড়া ছুটির দিনে প্রায় দু-বেলাই যেতাম। গল্পগুজবের মধ্যেই সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করতাম। এই ব্যবস্থা করার ফলে কোনো সিদ্ধান্ত কারো পছন্দ না হলে সে আর কারো ওপরে ব্যক্তিগতভাবে রাগ করতে পারতো না এবং আমরাও—হয় কমিটি থেকে যে কোনো একজন বা সমবেতভাবে—তার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঠিক ক'রে নিতাম। অনেক সময়ে 'তাকেই' বলতাম ভিন্ন কোনো প্রস্তাব করতে যাতে কাজের সুবিধা হয়। আমাদের সকলেরই বয়স তখন অনেক কম এবং অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা সমস্ত আলোচনা-তর্ক সহজভাবেই করতে পারতাম—কোনো সঙ্কোচ, ভয় বা লজ্জাবশত কোনো কিছু পরিহার ক'রে চলতাম না। সব সময়ে সর্বসম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্ত নিতাম, অধিকাংশের ভোটে নয়। অনেক সময় বহু লোকের বিভিন্ন প্রস্তাব নাকচ হয়ে গিয়েছে, এমনকি শম্ভুদারও—কিন্তু কোনো দিন সেগুলো তিক্ত-আবহাওয়া সৃষ্টি করেনি।

মহর্ষি ছিলেন সভাপতি। কমিটিতে যারা ছিল তাদের মধ্যে ইসরাইল বয়েসে বড় এবং সাংগঠনিক কাজেকর্মে বোধবুদ্ধিও ছিল প্রখর। আমি তখন মাঝে মাঝে

বেকারি দশার মধ্যে পড়লেও ইসরাইল ছিল সম্পূর্ণ বেকার। নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হতো তাকে, ফলে আমাদের মতো সময় দিতে পারতো না। অশোকও ছিল আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। অভিনয় করতে না পারলেও শিল্পসাহিত্যেব প্রতি অনুরাগ এবং দলের প্রতি ভালবাসা ছিল গভীব। ওকে করা হ'লো সেক্রেটারি—যাকে মহলায় সব সময়ে আটকে থাকতে হয় না, বাইরে ঘোরাঘুরির কাজকর্মে মন দিতে পারবে। আমাদের মধ্যে দুর্বলদেহী জ্যাকেরিয়া ছিল ভালোমানুষ, আর ভীষণ খুঁতখুঁতে। চলা-ফেবা-বসা সে এমনভাবে করতো—যাতে জামাকাপড়ের ভাঁজ নষ্ট না হয়। সব থেকে পরিষ্কার গ্লাসে জল এনে দিলেও সে তার থেকে ময়লা আবিষ্কার করতো! মনে হ'লো ওর হাতে হিসাবপত্রের ভার দিলে ও স্বভাব অনুযায়ী হিসাবপত্রও ঠিক ক'বে রাখবে—ওকে করা হ'লো ট্রেজারার। আমার আর সবিতার ওপর ভার পডলো মহলা তদারকি করার।

নানা দল-ভাঙার ঘটনা আমরা তখন দেখছিলাম। অনেক লোকের কাছে নানা কথাই শুনতাম: কোনো দল হয়তো তখনো ভাঙেনি—তবু সেখানকার নানা লোকজন দলে দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করতো—সব সময়ে যে ক্ষোভ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করতো তা নয়, তবু আলোচনা করতে করতে ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়তোই। এই সব দেখে এবং নিজেরাও কাজ করতে করতে মনে হ'লো আমরা এ-ধরনের ব্যাপাবকে প্রশ্রয় দেবো না। কারণ ক্ষোভ সংক্রামক এবং ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ছোটো ছোটো দলে আলাদা হয়ে আলোচনা করতে থাকলে দলে ভাঙন ধরবেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম: খারাপ হোক ভালো হোক, সবই আমরা 'বহুরূপী'তে-ই আলোচনা ক'রে নেবো এবং যতক্ষণ না সবাই সন্তুষ্ট হয় ততক্ষণ আলোচনা চালাবো—যাতে তিক্ততার রেশ না থেকে যায়। ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ ব্যবস্থার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি—তারপর একটা বড়ো ঘটনা ঘটে, যার রেশ বহুদিন চলে এবং দলের চেহারা প্রায় বদলে যাবার মতো হয়। বহুদিনের বহু আলোচনা, তর্ক, ঝগড়ার অন্তে একরকম ক'রে আমরা সামলে উঠি—কী মূল্য দিতে হয়েছিল এবং পুরো ব্যাপারটার জটিলতাই বা কী ছিল সে সব এখানে উহ্য রাখছি।

আমরা যে সকাল-সন্ধ্যায় আসতাম এবং গল্প-আলোচনা করতাম তা আমাদের খুবই কাজে লাগতো। এই বাড়তি সময়ে আমরা বেশ কয়েকটা কাজ করেছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা দলকে বড়ো হবার পক্ষে খুবই সাহায্য করেছে। অনুগ্রাহক প্রথা, প্রথম নাট্যোৎসব, 'বিভাব', 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা' —এসবই ঐ বাড়তি সময়ের গল্প-গুজবের ফল।

ভালো নাটকের অভাব বহু দলের মতো আমাদেরও বার বার বিব্রত করেছে।

সবে 'ছেঁড়াতার' করেছি—খুবই নাম হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গেই লোকে নতুন নাটকের জন্য তাগাদা দিতে শুরু করেছে। একটা কথা ভীষণভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল, আমরা খালি সিবিয়াস নাটকই কবি, হাল্কা হাসির নাটক করতে চাই না। তখন আমরা কোনো নাটকই পাচ্ছি না—সে সিরিয়াস নাটকই হোক আর হাল্কা হাসির নাটকই হোক। নানা ধরনের থিয়েটারের কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে একদিন রাত্রে 'কাবুকি' থিয়েটারের কথা ওঠে। শম্ভুদা বললেন—এক কাজ করা যাক, বসে না থেকে একটা আইডিয়ার কাঠামো ঠিক ক'রে নিয়ে কাজ শুরু করা যাক। যে যার কথা বানাবে। সেট, ড্রেস কিছুই থাকবে না। বলতে বলতে শম্ভুদা আন্দাজ দেখালেন: যেমন চেয়ার নেই, চেয়ারে বসা হবে, সত্যি না দৌড়ে দৌড়ানোর ভঙ্গি করা হবে, অথচ যাকে 'মাইম' বলে তা নয়। আমরা উৎসাহিত হয়ে শুরু কবলাম। শম্ভুদা বৌদি আর আমি।

শম্ভুদা যেন আমার বাড়িতে এসেছেন হাসির নাটকের খোরাক সংগ্রহ করতে। খালি মঞ্চে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন—আমি কাল্পনিক জানলা খুলে দিয়ে চেয়ারে বসলাম—বৌদি চা আনার অভিনয় করলেন—তারপর আমরা কত কিছু কাণ্ড ক'রে হাসির খোরাকের সন্ধান করতে লাগলাম। একজন কথা বললে অন্যজন উত্তর দেয়—কিন্তু নানা কসরৎ করেও আমরা যেন সত্যিকার হাসির সূত্র ধরতে পারছিলাম না—তখন আমি আর শম্ভুদা আমার ঘর ছেড়ে যেন রাস্তায় মুক্ত আকাশের নিচে বার হলাম—যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে হাসির উৎস খুঁজে পাই। কিছুই নেই, অথচ ট্রাম-বাস-রিক্সা-মোটর চলাচলের ইঙ্গিত দিই। কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় এই পর্যন্ত বেশ হ'লো। আমরা সকলেই উৎসাহিত, উত্তেজিত—যারা চেষ্টা করছি তারাও, যারা দেখছে তারাও। কিন্তু আর এগোয় না—খালি কথার পিঠে কথা চলতে থাকে, কিছু হয় না। যখন কোনো কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমরাও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছি, এমন সময়ে কাগজে একদিন খবর বার হ'লো—আগরতলায় একটা মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি চলেছে। সস্তায় চাল পাওয়ার দাবিতে মিছিলটা বার হয়েছিল।

এই নিয়ে কথা বলছি, হঠাৎ শম্ভুদা বললেন—'এই তো পাওয়া গেছে'! আমরা যখন হাসির উৎস সন্ধানে রাস্তায় হিমশিম খাচ্ছি তখন একদিক থেকে মিছিল আসবে অন্যদিক থেকে পুলিশ। মিছিল চাল কাপড়ের দাবি জানাতে জানাতে আসবে, পুলিশ তাদের বার বার ফিরে যেতে বলবে। শেষে পুলিশ গুলি চালাবে—মিছিলের কিছু লোকজন মারা যাবে, পুলিশ চলে যাবে। মৃতদেহের কাছে এসে এই আমি যখন দেখবো, শম্ভুদা জিজ্ঞাসা করবেন—এবার হাসি পাচ্ছে কী না! একবার কল্পনায় এসে যাবার পর আর দেরি হ'লো না—পর পর সাজিয়ে নিলাম, শুধু শম্ভুদা হাসির সন্ধানে আমার বাড়ি আসার আগে

একটা উপক্রমণিকা জুড়ে দিলেন: কেন আমরা এটা করছি—এর পশ্চাৎপট কী—দেশে বিদেশে এর কোনো সূত্র আছে কি না। বক্তৃতার আকারে এটা থাকলেও এটাই প্রধান এবং এই উপক্রমণিকা ছাড়া 'বিভাব' নাটক বোঝা যাবে না। এ এক অপূর্ব ব্যাপার!

ঠিক হ'লো অনুগ্রাহকদের জন্য আমরা অভিনয় করবো। এর অভিনয় করতে মাত্র কুড়ি মিনিট সময় লাগবে। তাই সঙ্গে আবৃত্তি এবং গানের আয়োজন করা হ'লো। রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা থেকে অংশবিশেষ বেছে নিয়ে গাথা তৈরি ক'রে একক, দ্বৈত এবং সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (বটুকদা), দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জদা) প্রভৃতি বটুকদারই নবজীবনের গানের কিছু অংশ গাইবেন বলে ঠিক হ'লো।

২৯শে এপ্রিল, '৫১, শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তার বাড়িতে প্রথম অনুষ্ঠান হ'লো। সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে 'বিভাব' হৈ-হৈ সৃষ্টি করলো। প্রথম সারিতে এক মহিলা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন। আমরা যখন বসার ভঙ্গি করি তখন তিনি আর আগ্রহ চেপে রাখতে পারেন নি—হেঁট হয়ে দেখতে গেলেন আমরা সত্যি ভঙ্গি করছি, না কোনো কিছুর ওপর ভর দিয়ে আছি। হেঁট হতে হতে পিছলে একেবারে মাটিতে! তখন মঞ্চের ভেতরে এবং বাইরে দু-জায়গাতেই হাসির উৎস তৈরি হয়ে গেল!

'বিভাব'—'বহুরূপী'র এক অসাধারণ সৃষ্টি। বিশেষ কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হবে না; দৃশ্যসজ্জা, আলো, পোশাক বা কোনো আহার্য-উপকরণ কিছুরই প্রয়োজন হবে না। আলোর মধ্যে—গুলি চলার পর মঞ্চে যা আলো থাকে তার কিছু নিভিয়ে দিয়ে বাকি আলোর সামনে লাল সিলোফেন কাগজ লাগিয়ে দিলেই হ'লো। আর থাকার মধ্যে পুলিশের ক্রস বেল্ট, মোটর-বাস ইত্যাদির ছবি এবং গুলির আওয়াজ।

ভারতবর্ষের নানা ধরনের দর্শকদের সামনে আমরা 'বিভাব' অভিনয় করেছি—এর আকর্ষণ সর্বত্র সমান। 'ছেঁড়াতার'-এর পর 'বিভাব' নিশ্চিতভাবে 'বহুরূপী'কে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।

আমাদের যে কেবল নিজস্ব মঞ্চ ছিলনা তা-ই নয়—কাজ করার জন্য পয়সা খরচ ক'রে লোক রাখাও সম্ভব হতো না—আমাদেরই সব কাজ করতে হতো। সময়ের অভাবে এবং দৈহিক পরিশ্রমের জন্য অসুবিধা বা কষ্ট খুবই হতো। কিন্তু সব কাজ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে দলের সকলে নানা কাজ শিখতেও লাগলো। মঞ্চসজ্জা, আলো, সাজসজ্জা, মেকআপ—সবই নিজেদের করতে হতো। তাই দলে যখনি নতুন ছেলে আসতো, আমরা বলেই দিতাম—অভিনয়

ছাড়াও সমস্ত কাজ-কর্মেই যুক্ত হতে হবে। বলাই বাহুল্য, সবাই রাজি হ'তো, কিন্তু কাজ শুরু ক'রে কেউ কেউ নানা উপায়ে তা এড়াবারও চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে আমরা রাগ করলেও মজা লাগতো। এবকম এক-আধটা উদাহরণ দিই। একবার আসানসোলে গেছি অভিনয় করতে। ফেরবার সময় ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছি, সঙ্গে সব মালপত্র। উদ্যোক্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ রয়েছেন। গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মালপত্রে হাত লাগালো। সকলে যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন দেখা গেল প্ল্যাটফর্মের একটা অন্ধকার জায়গায় গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে একজন চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে! জ্যাকেরিয়া দেখতে পেয়েই ধমকে উঠলো: 'এই, ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছো—শিগগির হাত লাগাও'। সে একগাল হেসে এগিয়ে এসে বললো: 'বাবাঃ, কী শ্যেন দৃষ্টি! অন্ধকারে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে আছি তা-ও নজর এড়ায়না'!—সে এগিয়ে এলো—সব থেকে ছোটো জিনিসটা নিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িতে গিয়ে উঠলো!

দ্বিতীয় ঘটনাটা বেশি মজার। 'নাট্যোৎসব'-এ 'ছেঁড়াতার'-এর প্রথম অভিনয় হবে। তখন 'ছেঁড়াতার'-এ বেশি কাটাকুটি করা হয়নি—অভিনয়েব আগের দিন মনে হ'লো সামান্য কিছু কাটাকুটি করলে ভালো হয়। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন রহিম গ্রামে ফিরে আসে, তখন গাঁয়ের একটি লোক এসে কিছু আনাজপত্র দিয়ে যায় এবং সামান্য কয়েকটা কথাও বলে। মনে হ'লো এই অংশটা সহজেই বাদ দেওয়া যায়। যিনি এই চরিত্রটি অভিনয় করছিলেন তাঁর যাতায়াত ছিল একটু অনিয়মিত এবং দলে এসেও অন্যান্য কাজকর্মে মন দেওয়ার চেয়ে বড়োদের সঙ্গে গল্পগুজবেই মন দিতেন বেশি। তিনি অভিনয়ের আগের দু-একদিন আসেননি। ঠিক হ'লো অভিনয়ের দিন সকালে যখন তিনি আসবেন, তখন এই কাটাকুটির কথাটা বলে দেওয়া হবে। তিনি এই চরিত্র ছাড়াও অন্য জায়গায়—যখন গ্রামের লোকেরা ভিড় করে আসে—তাতেও অভিনয় করছিলেন। অভিনয়ের আগের রাত্রে আমরা সবাই মঞ্চে কাজ করছি—সকালেই নাটকের প্রথম অভিনয়—আমরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। তিনি এলেন দেরি ক'রে এবং সোজা গিয়ে মেকআপ করতে বসে গেলেন। আমরাও ভুলে গেলাম ওঁকে বলতে যে ওঁর ঐ অংশটা বাদ গেছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় হয়ে চলেছে—যথাসময়ে তৃতীয় অঙ্ক এলো—উনি নিজেই খোঁজখবর ক'রে আনাজপত্র যোগাড় ক'রে একটা ধামায় নিয়ে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই দৃশ্যটি এলো, হয়েও গেল, উনি দাঁড়িয়েই আছেন! পরের দৃশ্যে যাবার জন্যে আমরা তৈরি হয়ে এসেছি—ওঁরও যাবার কথা—ওঁকে তাড়া দিলাম। উনি একটু যেন বিব্রত হলেন; বললেন: 'আরে, আমার আগের ঢোকাটাই যে এখনো হয়নি—বুঝতে পারছি না কী হ'লো—কী করবো বুঝতে পারছিনা'। তখন ওঁকে

বললাম সবটা। উনি ছুটলেন—পোশাক বদল করতে। তখন আমরা খুব রাগারাগি করেছি, কিন্তু পরে খুব হেসেছি। গল্প না-ক'রে যদি নাটকে এবং মহলায় মন দিতেন, তাহলে আর এতটা অপেক্ষা করে থাকতে হতোনা।

'নাট্যোৎসব'-এর পর থেকেই নিজেদের ব্যবহারের জন্য মঞ্চ তৈরি করা বা যোগাড় করার কথা আমরা ভাবতে থাকি। 'রক্তকরবী' হয়ে যাবার পর আমরা একটু বেশি সচেষ্টও হযে উঠি—নানা জায়গায় জমি দেখতে থাকি—নানা লোকের সঙ্গে কথা বলতে থাকি—এবং তারও কিছু পরে একটা 'বিল্ডিং কমিটি'ও তৈরি করি। নানা অসুবিধার সঙ্গে কিছুটা নিজেদের স্থির সিদ্ধান্তের অভাবও ছিল—কিছুই হয়ে ওঠেনি। 'মিনার্ভা' থিয়েটারও আমাদেরও হাতে আসে এবং বেশ কিছুদিন কথাবার্তা বলার পর মোটামুটি ভালো ভাবেই পাবার ব্যবস্থাও হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত নেওয়া হয় না—তখন আমরা 'লিট্‌ল্ থিয়েটার'কে খবর দিই।

এতক্ষণ যা বললাম তার সবটাই 'বহুরূপী'র গোড়ার দিককার কথা। তখন দেশের অবস্থাও ভিন্ন ছিল এবং থিয়েটারের অবস্থা তো একেবারেই অন্যরকম ছিল। 'নবান্ন' নাটক এবং তার প্রযোজনা-অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারের যে নতুন ধারা বইতে শুরু করেছিল, বিভিন্ন দলের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা-ই গভীরতর আকার পেতে থাকলো। আমরা কাজ শুরু করার পর ক্রমে ক্রমে আরো কিছু দল কাজ করতে আরম্ভ করে এবং বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকেরও প্রযোজনা হতে থাকে। শ্রী সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' এই রকমই এক উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। থিয়েটারের এই নতুন প্রকাশ ক্রমশ স্পষ্ট চেহারা পেতে পেতে ১৯৫৪ সালে 'রক্তকরবী' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর ব্যাপ্তি পায় যা থিয়েটারের পুরানো-ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তো বটেই, এমনকি তা 'নবান্ন'-কৃত উপলব্ধি এবং প্রকাশ থেকেও বহুমাত্রিক চেহারা নেয়।

কিছু কিছু কথা বলা হ'লো কিন্তু বহু কথা অনুক্ত রয়ে গেল। দলে কত লোক এসেছে, কত চলে গেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। কারো কারো চলে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছে—যারা গেছে তাদের পক্ষেও যেমন, দলের পক্ষেও ঠিক তেমনি। বহুবার দল প্রায় ভাঙতে বসেছিল। ১৯৫২ সালের পর থেকে একবার নয়, বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে। কেন তাদের যেতে হয়েছে, দল-ই বা কী করেছে, সে আর এক কাহিনী। কখনো ঠিক করেছি, কোথাও হয়তো ভুলও করেছি; অনিবার্য কারণে ঘটনার স্রোত ঠেকাতে পারিনি। আবার জোর করতে গিয়ে হয়তো ভিন্নপথে চলে গেছি—নানাভাবে চেহারা বদলাতে বদলাতে পঁচিশ বছরের দুয়ারে এসে আজ পৌঁছেছি। অনেক ক্ষুদ্রতা, আত্মকেন্দ্রিকতা যেমন দেখেছি, তেমনি অনেক উদারতা, স্বার্থত্যাগ, গভীর নিষ্ঠাও দেখেছি—এ-ই

হয়; 'বহুরূপী'তেও তা-ই হয়েছে। তাই রজতজয়ন্তীবর্ষে আশা করবো এবং যতোটা সম্ভব চেষ্টা করবো—থিয়েটার যাতে বদ্ধজলায় আটকে না যায়; জীবনের নতুন উপলব্ধিতে, থিয়েটারের নতুন প্রকাশে, আমরা যেন সমান জোর নিয়েই কাজ করে যেতে পারি।

রচনাকাল: ১৯৭২
বহুরূপী পত্রিকা / ৩৮ সংখ্যা

দশচক্র: হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার রায়

অহীন্দ্র চৌধুরী

'দেহপট সনে নট সকলি হারায়' : কথাটার মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে, এ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, অভিনেতাদের (বিশেষ করে মঞ্চাভিনেতাদের) সঙ্গে দর্শকদের সম্পর্ক নগদ বিদায়ের। অভিনয় ভালো লাগলে দর্শক যেমন অকুণ্ঠ প্রশংসায় মেতে ওঠে, খারাপ লাগলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নাকচ ক'রে দিতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করে না। তাই যে মনোভাব থেকে 'দেহপট সনে...' কথাটা এসেছিল সেই মনোভাব থেকেই বলা যায়-ভালো অভিনয় করার ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা মঞ্চ থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গেই '.... নট সকলি হারায়।' ইতিহাসে দেখি—অসাধারণ ক্ষমতাশালী জনপ্রিয় দানীবাবু পর পর মাত্র দু'টি নাটকে (আলেকজান্ডার ও ললিতাদিত্য) নিজ ক্ষমতানুযায়ী কিংবা দর্শকের প্রত্যাশানুযায়ী অভিনয় করতে না পারায় কিভাবে দর্শক-সমালোচক কর্তৃক উপহসিত হয়েছিলেন। হয়তো এই অবহেলা-লাঞ্ছনার মধ্যেই তাঁকে বিদায় নিতে হতো, যদি না অপরেশবাবু তাঁকে আবার আর্ট থিয়েটারে এনে পুরানো নাটকের পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। 'চাণক্য' আবার তাঁকে নিজ মর্যাদায় ফিরিয়ে আনে, তাঁকে দর্শকপ্রিয় ক'রে তোলে, বহু পুরানো এবং নতুন নাটক তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই চলতে থাকে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যতম নেতা নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীও নি:সন্দেহে এক বিরাট অভিনেতা। মঞ্চ থেকে অবসর নেবার পরও তিনি দীর্ঘকাল দেহ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু ২৫-৩০ বছর বয়সের ক'জন তাঁকে জানেন? মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁরা অবশ্যই তাঁর নাম জানেন; সভা-সমিতি কিংবা রবীন্দ্রভারতীতে মাঝে মধ্যে দেখেও থাকবেন—কিন্তু কেবল সেইটুকুই। জন-মানসে নটসূর্য অস্তমিত হয়েছিলেন দীর্ঘকাল আগেই—দেহপট থাকা সত্ত্বেও, মঞ্চ থেকে অবসর নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তবু চলচ্চিত্র তাঁকে ধরে রেখেছিল আরো কিছুদিন, যা সেই যুগের বহু শিরোমণিকে রাখেনি।

অনেকের মতো আমিও অহীনবাবুকে বেশি করে দেখেছি, জেনেছি প্রথমে চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই; মঞ্চে দেখার সংখ্যা বেড়েছে অনেক পরে। 'কণ্ঠহার',

'দক্ষযজ্ঞ', 'অবতার' কবে দেখেছি মনে নেই। মনে আছে খালি অহীনবাবুকে, দীর্ঘ বলশালী চেহারা, বড় বড় চোখ আর যাদু-মুগ্ধ ক'রে রাখার মতো অভিনয়। যখন ভালো ক'রে নাটক এবং অভিনয় বুঝবারও ক্ষমতা হয়নি, যখন নিজে কোনোদিন অভিনয় করবো—এ কল্পনাও মাথায় আসেনি, তখন থেকে দেখেছি অহীনবাবুকে; দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি।

চল্লিশের দশকে যখন নিয়মিত থিয়েটার দেখা শুরু হ'লো তখন একে একে সে যুগের সকল কৃতী অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে পেলাম। দুর্গাদাস তখন সবে গত হয়েছেন। বহু অভিনেতার মধ্যেও তখন একদিকে শিশিরকুমার অন্যদিকে অহীন্দ্র চৌধুরী সকলকে ছাপিয়ে মাথা উঁচু ক'রে রয়েছেন। একজন নাট্যাচার্য, অন্যজন নটসূর্য।

'মিশরকুমারী', 'সাজাহান', 'কেদার রায়', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'তটিনীর বিচার'—এই রকম বহু নাটকই অনেকের মতো আমিও একাধিকবার দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তখন বিভিন্ন মঞ্চে যতো নাটক দেখেছি বেশির ভাগই নাটক-হিসাবে বলা যায় দুর্বল, অতিনাটকীয় কিংবা বিন্যাসে শিথিল। কিন্তু যখন অহীনবাবু মঞ্চে আসতেন, কী এক মায়াবী কারুব র্য এমনি এক প্রবাহ সৃষ্টি করতেন দর্শক সব ভুলে যেতো। নাটক দুর্বল, পার্শ্ব-চরিত্র দুর্বল, কিন্তু সব ভুলিয়ে দিয়ে হিমালয়ের মতো সামনে থাকতেন আবন-সাজাহান- মি: মুখার্জি- মি: ভোসরূপী অহীনবাবু। মিশরকুমারীর সম্মিলিত অভিনয়ে ছবিবাবু, জহরবাবু, ভুমেন রায়, সন্তোষ সিংহ, সরযূদেবী প্রভৃতিরা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত মঞ্চ জুড়ে থাকতেন একা অহীনবাবু!

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অনেক সময়ে দেখেছি অভিনয় চলাকালীন শিল্পীরা পরস্পরের মধ্যে কৌশলে কথাবার্তা বলছেন। এমন কি রসিকতা করছেন। কিন্তু অহীনবাবুকে কখনোই দেখিনি। সর্বদাই অহীনবাবুর চরিত্র 'কিছু' করতো। অহীনবাবু নয়, সেই চরিত্রটাই থাকতো সব সময়ে—সবটা জুড়ে।

'মিশরকুমারী'র এক বিশেষ দৃশ্যে—যেখানে আবন-রূপী অহীনবাবু সামন্দেশকে বলতেন: 'যেহেতু আমি কাফ্রী—কেমন এই তো? কেন কাফ্রীরা কি মানুষ নয়.... তোমার সুখ, সুখ, আর আমার সুখ তোমার জুতোর তলার মাটি—তোমার রক্ত, রক্ত, আর আমার রক্ত নর্দমার পচা জল? তোমার মাথা, মাথা আর আমার মাথা তোমার লাথি মারবার জায়গা?'—সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! সেই জান্তব ক্রোধ, অসহনীয় ধিক্কার, উলঙ্গ মনোভাব সমস্ত দর্শককে উত্তেজিত ক'রে তুলতো। আবন-রূপী অহীনবাবুকে অত্যাচারিত, পরাধীন সকল মানুষের প্রতিভূ বলে মনে হতো। দর্শক এতোই বিচলিত, উত্তেজিত হয়ে উঠতো

যে আবনের সমস্ত কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো না। কথা শেষ হবার আগেই উত্তেজিত দর্শকদের প্রচন্ড করতালিতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যেন ঝড় ব'য়ে যেতো—যা শান্ত হতে সময় লাগতো। রসিকতা ক'রে অনেককে বলতে শুনেছি: এত তীব্র হাততালি শুরু হতো যে অহীনবাবুকে সমস্ত কথা বলতেই হতো না—শুধু মাথা এবং মুখ নাড়লেই চলতো! জানি না তিনি সবটা বলতেন কিনা—তবে সবটা পেতে দর্শকদের কোনো অসুবিধা হ'তো না।

যেমন শিশিরকুমার, প্রায় সেই রকমই অহীন্দ্র যেন নিজেই এক প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তাঁকে দেখতেই লোকে যেতো, তাঁকে কেন্দ্র করেই থিয়েটার চলতো, নাটক লেখা হতো। শিশিরবাবু এবং অহীনবাবুকে একই সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছি। তাঁরা দু'জনেই দর্শক-মনে অতি সহজেই চমক, শিহরন সৃষ্টি করতে পারতেন, অথচ শিশিরকুমার, দুর্গাদাস কিংবা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মতো কণ্ঠমাধুর্য তাঁর ছিল না।

বারবারই মনে হয়েছে তিনি যেন সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হয়ে, প্রস্তুত হয়েই মঞ্চে আসতেন—অবহেলা ক'রে নয়। পোশাক-আশাক, রূপসজ্জার প্রতি তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ছিল। শুধু সে যুগে নয়—আজকের দিনেও বহু প্রথিতযশা শিল্পীর তুলনায় তিনি এ বিষয়ে শুধু যে সচেতন ছিলেন তা-ই নয়, পারদর্শীও ছিলেন। 'চিরকুমার-সভা'য় অহীনবাবুর রূপসজ্জা নাকি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। চলচ্চিত্রেও দেখেছি তাঁর সেই একই দক্ষতা, একই জনপ্রিয়তা।

আজ থেকে ৫২ বছর আগেকার কথা। রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র তখন আর নেই। অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বোস, অমৃতলাল মিত্র কেউ-ই নেই। অমর দত্ত-ও অকালে দেহত্যাগ করেছেন। সে যুগের প্রতিভূ অমৃতলাল বসু, দানীবাবু এবং অপরেশচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে কোনো রকমে তখনকার রঙ্গমঞ্চ চলছে—কিন্তু সে চলায় যেন কোনো জীবন ছিল না। নতুন নাটক করছেন—চলছে না; পুরানো নাটক ক'রে কোনো রকমে থিয়েটার চালু রাখছেন। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় পর্যায় এই সময়েই শুরু হয়।

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়ে শিশিরকুমার ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানির হয়ে 'আলমগীর' অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ে সমস্ত দেশে সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিশিরকুমারকে থিয়েটার ছাড়তে হয়। আবার তিনি চাঞ্চল্য আনেন ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইডেন গার্ডেন্সের একজিবিশন গ্রাউন্ডে পরপর চার রাত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' অভিনয় ক'রে।

কিন্তু ১৯২১ সালের 'আলমগীর' এবং ১৯২৩ সালের 'সীতা' অভিনয়ের

মধ্যেই নবযুগ শুরু হয়ে গেছে। অপরেশচন্দ্র, প্রবোধ গুহঠাকুরতা প্রভৃতির প্রচেষ্টায় আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে প্রায় সবাই নতুন। তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখার্জী এবং আরো অনেকে। আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩ সালের জুন মাসে) পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম চাঞ্চল্যকর প্রযোজনা। তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীর এই নাটকেই প্রথম প্রতিষ্ঠা। কয়েক মাস পরেই শিশিরকুমারের প্রযোজনা 'সীতা', দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

'অর্জুন'-রূপেই ১৯২৩ সালে নটসূর্যের প্রথম আবির্ভাব। ক্রমে ক্রমে শিশিরকুমার, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, রবীন্দ্র রায় প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও রঙ্গমঞ্চের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। চল্লিশের দশকে এসে দেখি কেউ গত হয়েছেন, কেউ বা অবসর নিয়েছেন; যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে দিকপাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন নাট্যাচার্য এবং নটসূর্য। তখন তাঁরা কিম্বদন্তীর নায়ক।

অধ্যাপক শিশিরকুমার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এসেছিলেন, নট অহীনবাবু এই খ্যাতির অধিকারী হন তাঁর দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ে। নাটক-অভিনয়ের ক্ষেত্র ছাড়াও নানা ক্ষেত্রেই বিদগ্ধ জনের মধ্যে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হতো। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগ তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, সেখানে প্রধানের পদে তাঁকেই আমরা প্রথম দেখতে পাই। বন্ধুদের মুখে শুনেছি—তাঁরই শিক্ষণ-প্রণালী, তাঁরই বক্তৃতা, তাঁরই দেওয়া নোট সম্বল ক'রে পরবর্তীকালের বহু নাট্যশিক্ষক কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নিজেদের কর্তব্য-কার্য সমাধা করেছেন। অহীনবাবু নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ যে-কোনো নাট্যকর্মীর ঈর্ষার বস্তু।

একবার শ্রী দেবতোষ ঘোষ এবং আমি আগেকার থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন অসুস্থ, শয্যাগত। দুর্বল দেহ নিয়েই বাইরের ঘরে এলেন। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, নিয়ে গেলেন শোবার ঘরে। তারপর স্মৃতি-রোমন্থন করতে লাগলেন—বহু ব্যক্তিগত কথা, বহু সুখ-দুঃখের ইতিহাস। তাঁদের প্রথম দিকের থিয়েটার আমাদের সময়কার থেকে এতো ভিন্ন, মনে হচ্ছিল যেন গল্পকথা শুনছি: 'শিশিরবাবু তো বিরাট অভিনেতা—নিজেই এক প্রতিষ্ঠান; নির্মল (নির্মলেন্দু লাহিড়ী) ভালো অভিনয় করতো—ওর কণ্ঠস্বর ছিল প্রধান সম্পদ; আর দুর্গা (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) তো ম্যাটিনি-আইডল্ ছিল—তোমাদের আজকের উত্তমকুমারের মতো। চেহারা, গলার আওয়াজ সব

নিয়ে দর্শকদের যেন এনচ্যান্ট ক'রে রাখতো। তবে ও-তো কোনো দিন কোনো হেভি নাটক বা হেভি রোল করেনি'—এই রকম আরো কিছু কথাও বললেন। অমৃতলাল বসু, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্রের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। অমৃতলাল বসু কত যত্ন নিযে তাঁকে 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশেব অভিনয় শিখিয়েছিলেন তার উল্লেখ করলেন। শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও বললেন। আমাদের কিছু অভিনয়ও দেখেছেন—তার মধ্যে বিশেষ ক'রে 'রক্তকরবী'ব কথা বললেন। রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন তার মধ্যে বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলেন—'চিরকুমার-সভা' (চন্দ্রবাবু), 'গৃহপ্রবেশ' (যতীন), 'শোধবোধ' (সতীশ), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (বৈকুণ্ঠ) প্রভৃতি।

হঠাৎ একদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি 'নটসূর্য' আর নেই! সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রধান পুরুষ অহীন্দ্র চৌধুরী আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। 'দেহপট সনে' তিনি কতটা কী হারালেন জানি না, আমবা হারালাম: আবন, সাজাহান, কেদার রায়, ভোলা মাষ্টার, মি: ভোস, মি: মুখার্জি প্রভৃতি নাট্যচরিত্রের সঙ্গে কিম্বদন্তীর মতো জড়িয়ে থাকা সেই দীর্ঘদেহী সুপুরুষ নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে।

রচনাকাল: ১৯৭৫
বহুরূপী পত্রিকা / ৪৪ সংখ্যা

একটি আলোচনা

সাধারণ বা বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চের আওতার বাইরে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা অভিনয়াদি না ক'রে থাকতে পারেন না, তাঁরা প্রায়ই ভেবে থাকেন যদি নেশা এবং পেশা এক করা সম্ভব হ্তো তাহলে বহু প্রতিভা হয়তো নষ্ট হয়ে যেত না, বহু কৃতী-শিল্পীকে অভিনয় ছেড়ে যেতে হ্তো না। সেক্ষেত্রে নাট্যক্রিয়া সব দিক থেকে লাভবান হ্তো; শিল্পী-কর্মীরাও একমুখী হ্য়ে কাজ করতে পারতেন। এই কথা নানা জনে, নানা ভাবে, নানা সময়ে ভেবেছেন; কেউ কেউ বিভিন্ন ভাবে চেষ্টাও করেছেন। স্পষ্টতই এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হতে চললো বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চের বাইরে আর এক ধরনের নাট্যক্রিয়া কাজ ক'রে চলেছে। এই পর্বে নাটকে, অভিনয়ে, প্রযোজনায় যা-কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তা এই ভিন্ন থিয়েটারেই ঘটেছে। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র প্রথম প্রযোজনা 'নবান্ন' সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এই ভিন্ন-থিয়েটারের দিকে টেনে আনে। এটা চল্লিশ দশকের কথা, সেই দশকেই 'বহুরূপী'র আবির্ভাব। পঞ্চাশের দশকে 'লিট্ল্ থিয়েটার', 'উত্তর সারথি'; ষাটের দশকে 'নান্দীকার'। তারপর আরো অনেক সংগঠন তৈরি হয়েছে, উল্লেখ করার মতো কাজও অনেক হয়েছে। বেশ কয়েক'শো শিল্পী, কর্মী বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত নাট্যক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন; অনেকে আজও কাজ ক'রে চলেছেন; আবার অনেকে এসব ছেড়ে চলেও গেছেন। এই ভিন্ন-থিয়েটার কিন্তু কোনো সময়েই কারো জীবিকা-নির্বাহের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

এই ভিন্ন-থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অথচ অভিনয়াদি যাঁদের জীবিকা-নির্বাহের উপায়—এরকম সামান্য দু-চারজনই আছেন—তাঁদের রুজি-রোজগার চলচ্চিত্র, যাত্রা অথবা বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চ-নির্ভর হয়েই আছে। যে-ভিন্ন-থিয়েটার তাঁদের গর্ব তা থেকে তাঁদের সংসার চলে না—এ সমস্ত সকলেরই জানা। অথচ এখনো মাঝে মাঝেই কথা উঠছে—এই ভিন্ন-থিয়েটার নাকি শিল্পী-কর্মীদের পেশা অর্থাৎ জীবিকা-নির্বাহের উপায় হয়ে উঠতে পারে। এটা হ'লে ভালো হয়, না খারাপ—সেটা অবশ্যই ভিন্ন একটা আলোচনা এবং অতি প্রয়োজনীয় আলোচনার বিষয়। কিন্তু

আদৌ তা সম্ভব কিনা—সে কথাটা ভেবে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘ ৩৪ বছর এই ভিন্ন-থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি—যে অবস্থায় আমরা বাস করছি সেখানে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

যাঁরা এই ভিন্ন-থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, যাঁরা এই নাট্যক্রিয়া থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার কথা ভাবতেও কষ্ট পান, তাঁদেরও বেঁচে থাকার জন্য রুজি-রোজগারের প্রয়োজন হয়। নানা ভাবে সেই রুজি সংগ্রহ করার চেষ্টায় তাঁদের যে-পরিমাণ সময়, মন ও পরিশ্রম দিতে হয় এবং সময়ে সময়ে যে গ্লানিবোধে ভুগতে হয়, তাতে অবসর সময়ে নাট্যক্রিয়ায় সম্পূর্ণ মন দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থার চাপে পড়েই, মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ভিন্ন-থিয়েটারকে যদি তাঁরা পেশা হিসাবেই গ্রহণ করতে পারতেন তাহলে কাজের সুবিধা হতো। আগ্রহাতিশয্যে অনেকেই এর বাস্তবতায় বিশ্বাসী।

আলোচনা বিশদ করার আগে এক সহকর্মীর কথা বলি। তাঁর বক্তব্য এটা সম্ভবও নয় এবং প্রয়োজনও নেই। যদি বা সম্ভব হয়ে ওঠে তাহলে এই থিয়েটার আর ভিন্ন-থিয়েটার থাকবে না—হয় বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠবে, নয় লোকরঞ্জন শাখা। দুই ক্ষেত্রেই অভিনয়াদি সেখানকার শিল্পী-কর্মীদের মুখ্য পেশা, অথচ এই দুই জায়গাতেই গর্ব করার মতো কিছু হচ্ছে না; হয়নি কেন?

'বহুরূপী' কাজ শুরু করে ১৯৪৮ সালে। সেই সময়ে এক-আধবার মনে হয়েছিল ঠিক ক'রে কাজ ক'রে যেতে পারলে একদিন এই ভিন্ন-থিয়েটার থেকে রুজি-রোজগার সম্ভব হলেও হতে পারে; অন্তত দু-বেলা সাধারণ খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা যাবে। 'নবান্ন' দিয়ে আমরা কাজ শুরু করি—ইচ্ছা এবং চেষ্টা ছিল যাতে প্রথম অভিনয় থেকেই সকলকে কিছু দিতে পারা যায়। আমাদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে তখন শম্ভুদা, গঙ্গাদা এবং আমরা ছাড়াও মহর্ষি, কালী সরকার, বিজনদা প্রভৃতি সকলেই যুক্ত ছিলেন। আমরা কয়েকজন কিছু টাকা দিলাম, সব থেকে বেশি দিলেন শম্ভুদা—প্রযোজনার জন্য সেই টাকা ব্যয় করা হ'লো। ঠিক হ'লো—টিকিট বিক্রির টাকা এলে এই টাকা শোধ দেওয়া হবে এবং সমস্ত খরচ-খরচা বাদে যা থাকবে সেটা শিল্পীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে সম্মানজনক এক হিসাব-পদ্ধতিও তৈরি হ'লো। সবই হ'লো, কেবল কল্পনার সঙ্গে মিললো না। খরচ-খরচা চুকিয়ে শিল্পীদের দেবার মতো উদ্বৃত্ত কিছু থাকলো না—যদিও ব্যয় করা হয়েছিল কৃপণেরই মতো।

আরো কয়েকবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি; কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা আছি, সেখানে এই ভিন্ন-থিয়েটার আমাদের রুজি-রোজগারের সুরাহা ক'রে দিতে পারবে না।

আমরা যে যার মতো কাজ ক'রে উপার্জন করি, সংসার চালাই—কেবল সন্ধ্যার সময়টা দিতে পারি থিয়েটারের জন্য। আরো সময় এবং মন দিতে পারলে কাজ ভালো হতো এতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তাহলে সংসার চলবে কী করে? অফিস-কোর্ট-কাছারি-কলেজ যে-কোনো জায়গায় কাজ ক'রে যে অর্থ উপার্জিত হয়, সাধারণ ভাবে সেটাও বেশি নয় কিন্তু সেই পরিমাণ টাকাও যদি আমরা থিয়েটার থেকে চাই তাহলে কী পরিমাণ রোজগারের প্রয়োজন হয় এবং তাতে এই ভিন্ন-থিয়েটারের ওপর কী পরিমাণ চাপ পড়বে সেটা কি ভেবেছি? সরকারি অফিসে বেশি বেতন দেওয়ার কোনো খ্যাতি নেই—তবু সেখানেও একজন পিওন চাকরির শুরুতেই সব মিলিয়ে আন্দাজ সাড়ে চারশো টাকা পান, একজন নিম্নপদস্থ কেরানি ছ'শো টাকা, একজন ইন্সপেক্টর বা অ্যাসিস্টেন্ট প্রায় হাজার টাকা, জুনিয়ার অফিসার প্রায় দেড় হাজার টাকার মতো পান। এই বেতন প্রতিবছর বাড়তে বাড়তে চলে। আজকের দিনে এই বেতন মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আমরা যে সমস্ত নাট্যকর্মীর কথা ভাবছি তাঁরাও নিশ্চয় ন্যূনপক্ষে এই পরিমাণ টাকা আশা করতে পারেন। প্রতি সংগঠনে ২/৪ জন এমন শিল্পী আছেন যাঁদের আরো কিছু বেশি দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে কী দাঁড়াবে? তিরিশ জনের একটি সংগঠনে এই খাতে প্রয়োজন হবে মাসে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। এ ছাড়াও অন্য খরচ আছে। সব মিলিয়ে সংগঠনকে মাসে অন্তত চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করতে হবে। নতুন প্রযোজনার খরচ, দায়দৈব এবং যাকে বলে খারাপ দিনের জন্য ব্যবস্থা রাখা, সেসব-ও আছে। এই টাকা যদি কোনো সংগঠনকে যথারীতি মঞ্চ ভাড়া ক'রে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, অভিনয় ক'রে উপার্জন করতে হয় তা হ'লে প্রতি অভিনয়ে কত টাকার টিকিট বিক্রি হওয়া প্রয়োজন সেকথা কি আমরা ভেবেছি?

যাঁরা আকাদেমির মতো মঞ্চে সপ্তাহে নিয়মিত একদিন বা দু'দিন ক'রে অভিনয় করেন, তাঁদের প্রতিটি অভিনয়ের জন্য প্রায় ২৩০০/২৬০০ টাকা খরচ হয়। প্রেক্ষাগৃহ আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হ'লে ৩৫০০/৪০০০ টাকা আসতে পারে। বেশির ভাগ সময়েই পূর্ণ-প্রেক্ষাগৃহেও আমন্ত্রিতদের জন্য কিছু আসন রাখতে হয়, ফলে অঙ্কের হিসাবে পূর্ণ-প্রেক্ষাগৃহের টাকা আসে না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যখন কেউ একটানা বেশ কিছুদিন ভালো বিক্রি পান তখন তার গড় বিক্রির হিসাব ২৮০০/৩২০০ মতো এসে দাঁড়ায়। আবার এমনও অনেক সময় দেখা যায়—নাট্য-প্রযোজনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও বিক্রি ভালো হয় না বা বেশি দিন ভালো বিক্রি থাকে না। অথচ নাটক এবং প্রযোজনা যদি ভালো হয় তাহলে দৈনিক টিকিট বিক্রির গড় আঠারশো/দু'হাজার টাকায় এলেও সেই অভিনয় বন্ধ করতে কেউ চাইবেন না। তাহলে? স্পষ্টতই এই আয় থেকে মাসে

নিয়মিত চল্লিশ হাজার টাকা রাখা সম্ভব নয়। এই উপার্জন যদি সম্ভব না হয় অথচ খরচ যদি অনিবার্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সরকারি অনুদান কিংবা আমন্ত্রিত-অভিনয়ের ওপরেই সকলকে সম্পূর্ণ নির্ভর কবতে হবে—এটা সরল পথও নয়, সহজে তা সম্ভবও নয়।

এই পর্যায়ে আমরা কয়েকটা উদাহরণ আলোচনা ক'রে দেখতে পারি। প্রথিতযশা নট-নাট্যকার-পরিচালক শ্রী উৎপল দত্তের নেতৃত্বে 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ' একসময় মিনার্ভা থিয়েটারে বেশ কয়েক বছর নিয়মিত অভিনয় করেন। সেখানে গর্ব করার মতো তাঁর প্রযোজনাও আমরা দেখেছি। দর্শকেরও অভাব হয়নি। অথচ সেই থিয়েটারের আয় থেকে তাঁদের কারো জীবিকা-নির্বাহ হতো না। যেটা হতো সেটা হ'লো নিয়মিত অভিনয় করার সুযোগ; মঞ্চ হাতে থাকায় পছন্দ মতো প্রযোজনার সুবিধা। সকলকে হাত-খরচ দেওয়া যেতো, কিন্তু সেটা অতি সামান্য—তাতে সংসার চালোনো যেতো না।

এরপর শ্রী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'নান্দীকার'ও রঙ্গনা মঞ্চ নিয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন ও কয়েক বছর নিয়মিত অভিনয় করেন। তাঁদেরও কিন্তু খরচ-খরচা মেটানোর জন্য আমন্ত্রিত-অভিনয়ের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হতো—এবং তাও যে সামান্য অর্থ তাঁরা শিল্পী-কর্মীদের দিতে পারতেন তার ওপর নির্ভর ক'রে কেউ সংসার চালাতে পারতেন না।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন টাকা তোলার প্রয়োজন হয়েছে তখন বেশ কয়েকজন বা কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে এসেছেন; মিলিতভাবে কাজ করেছেন এবং টাকা উঠেছে—যেমন আমাদের 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র প্রয়াস। সেখানেও কিন্তু যে টাকা উঠেছে তার সিংহ ভাগ এসেছে বিজ্ঞাপন থেকে এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত চাঁদা থেকে; অভিনয় ক'রে টিকিট বিক্রির লাভ থেকে নয়। তাছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্যে সকলে নিজের নিজের প্রযোজনা দিয়ে কিংবা এক-আধবার মিলিত ভাবে অভিনয় ক'রে মাঝে মধ্যে টাকা তোলা এক কথা আর সেটাকে রুজি-রোজগার হিসাবে বাস্তাবায়িত করা আর এক কথা।

দেড়-দুই বছর আগেও কয়েকটি নাট্যদল মিলে বেশ কয়েকটি অভিনয় করেন। সেই প্রয়াসে সরকারি অনুদান মিলেছিল প্রচুর, বিক্রিও হয়েছিল খুব। কিন্তু সেই পর্যন্তই। সেই প্রয়াস কোনো জায়গায় পৌঁছাল না। সেখানকার আকর্ষণে ছিলেন একজন বিরাট শিল্পী—বিক্রিটা ছিল মূলত তাঁরই নাম-নির্ভর। সেই নামটা বাদ দিয়ে অভিনয় ক'রে দেখা যেতে পারে কত বিক্রি হয়, ক'দিন অভিনয়

চলে? তখন ঘুরে ফিরে সেই সরকারি অনুদান কিংবা আমন্ত্রিত অভিনয় নির্ভর হতে হবে।

এমনও বলা হয় যে কয়েকটি সংস্থা যদি এক হয়ে কাজ করেন তাহলে এর একটা সুরাহা হতে পারে। এক্ষেত্রেও বলি, সম্ভব নয়। কয়েকটি সংস্থা এক হয়ে কাজ করা বলতে ঠিক কী বোঝায়? যে সমস্ত সংস্থা তাদের ক্ষমতা প্রমাণ করতে পেরেছেন তাদের কথাই নিশ্চয় ভাবা হয়। পাঁচটি দল যদি একত্র হয়, তাহলে তার মোট সদস্য-সংখ্যা হবে প্রায় দেড়শো জন। ঐ দেড়শো জনের জীবিকা মিলিত-সংস্থাকে করতে হবে—সেটা কখনো সম্ভব?

অবশ্য এমন চিন্তা থাকতে পারে যে প্রতি সংস্থা থেকে ছ'জন ক'রে নিয়ে একটা গোষ্ঠী তৈরি করা হবে—সকলকে নেওয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় যাঁরা বেশি ক্ষমতাশালী বা পরিচিত তাঁদেরই নেওয়া হবে। অন্যরা তখন কী করবেন? নিজের নিজের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে তাঁদেরও অবদান ছিল—দল প্রতিষ্ঠা পাবার পর হঠাৎ যদি মাত্র কয়েকজন নিজেদের রুজি-রোজগার থিয়েটার-নির্ভর করার আকর্ষণে বাকিদের ছেড়ে চলে যান, সেটা কি খুব শোভন হবে? যাঁরা থেকে যাবেন, তাঁরা যদি নিজেদের সংগঠন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও করেন, বিস্তর বাধা দেখা দেবে। এই প্রয়াসের 'নীট' ফল গোলমেলে হতে বাধ্য। পাঁচটি সংস্থা, যারা নিজের নিজের প্রয়াসে প্রযোজনা করতেন তাদের কাজে ভাঁটা পড়বে এবং সেক্ষেত্রে নতুন গড়ে-ওঠা একটি সংস্থা কাজ ক'রে গেলেও ভালো প্রযোজনার সংখ্যা কমে যাবে। সর্বোপরি বেছে বেছে লোক নেওয়ার ফলে দেয়-অর্থের পরিমাণ যাবে বেড়ে, থিয়েটারের ওপর চাপ পড়বে অনেক বেশি। তাহলে?

অন্য একটা দিকও আছে। ধরা যাক: রাম, শ্যাম, যদু, মধু, নিতু প্রভৃতি মিলে একটি সংগঠন করেছিলেন—কয়েক বছর তাঁরা ভালোভাবে কাজ করলেন, উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাও হ'লো। তারপর কোনো কারণে মধু, নিতু চলে গিয়ে ভিন্ন সংস্থা করলেন এবং ভালোভাবেই কাজ করতে থাকলেন। আবার কিছুদিন পর রাম চলে গেলেন এবং আর এক সংগঠন তৈরি করলেন ও কাজ করতে থাকলেন। এই যে একসঙ্গে কাজ শুরু ক'রেও একসঙ্গে থাকা গেল না—ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠতে লাগলো, তার কি কোনোই কারণ থাকে না? একসঙ্গে শুরু ক'রে আলাদা হতে হ'লো যাদের—আলাদা হয়ে যাবার পর কোন যাদুমন্ত্রে আবার তাঁরা এক হবেন? এক-আধটা উপলক্ষে, বিশেষ আকর্ষণে বা প্রয়োজনে এক-আধবার তা সম্ভব হলেও, নিয়মিত কাজ ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়।

যে কাজ করা সম্ভব নয়, সেটা করতে না পারলে আমার কোনো গ্লানি-বোধ

হয় না; যেমন আমি মনুমেন্টকে গায়ের জোরে টেনে তুলতে পারবো না কিংবা দৌড়ে এক মিনিটে এক মাইল পথ অতিক্রম করতে পারবো না; কিন্তু এগুলো না পারার জন্য আমার কোনো অগৌরব প্রকাশ পাচ্ছে না। ঠিক এই রকমই আমাদের ভিন্ন-থিয়েটারে কাজ ক'রে যদি তা থেকে জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করতে না পারি তাহলেও আমার হতাশা আসে না। অবশ্য থিয়েটার করতে যাওয়ার যে বাড়তি খরচ, সেটা মেটাতে যদি কিছু পাই তাহলে খুশিই হবো—অন্তত এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই।

অবশ্য যদি সরকারি আয়োজনে সব বন্দোবস্ত সমেত এবং আলো, মঞ্চ প্রভৃতিতে কাজ করার কুশলী কর্মীসহ কয়েকটি আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বিনা ভাড়ায় বা নামমাত্র ভাড়ায় (১০০ টাকা তে) পাওয়া যায়, খবরের কাগজ প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপনের আয়োজনও যদি সরকার ক'রে দেন এবং রঙ্গমঞ্চগুলির আসন-সংখ্যা আটশো-ন'শো ও শহরের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হয—তাহলে সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হতে পারে। ব্যাপারটা অবশ্য সরকারি অনুদান নির্ভরই হয়ে দাঁড়াবে।

এ ব্যবস্থা যদি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়, তখনই আলোচনা করা যেতে পারে—নেশা এবং পেশা এক হ'লে কতটা ভালো, কতটাই বা মন্দ হবে। অবশ্য এই পথে বণিজ্যিক থিয়েটার বা লোকরঞ্জন শাখার কলেবর বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু তাতে কী নতুন নতুন সৃষ্টি—যা ভিন্ন থিয়েটারের লক্ষ্য তার সম্যক বিকাশ ঘটবে!

রচনাকাল: ১৯৮২
বহুরূপী পত্রিকা / ৫৭ সংখ্যা

ছত্রিশ বছর পরে

আজ ছত্রিশ বছর হয়ে গেল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছি। ১৯৪৮ সালে যখন উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করি তখন গর্ব করার মতো কিছু হচ্ছিল না। সাধারণ রঙ্গালয়েব অবস্থা তখন খুবই খারাপ—শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি দিকপালেরা সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে বিশেষ কিছুই ছিল না—যা নিয়ে গর্ব করা যায়। অবশ্যই 'নবান্ন' হয়েছে, চাঞ্চল্য এনেছে—কিন্তু বন্ধও হয়ে গেছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের ভেতরে-বাইরে সর্বত্রই হতাশা।

নবীন-প্রবীণ, নিয়মিত বা অনিয়মিত দর্শক কেউই খুশি হচ্ছিলেন না সেদিন। শিশির-অহীন ভক্তের মধ্যেও সেই একই সুর বাজতে শুরু করেছে। যথেষ্ট সম্মান দিয়েও তাঁরা স্বীকার করতেন থিয়েটার গতপ্রাণ হয়েছে। তাঁরা কিন্তু বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনেও নিতেন কিংবা দীর্ঘদিন ধ'রে একটা বিশেষ ধরন এবং কিছু ঘটনা প্রায় প্রতিটি নাটকে দেখতে দেখতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে সেগুলো যে সার্থক নাট্য-প্রযোজনায় বাধা সৃষ্টি করছে বা রুচিতে ঘা দিচ্ছে তা তাঁরা বুঝতে পারতেন না বা বুঝতে চাইতেন না। এসব সত্ত্বেও একসময় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন।

চল্লিশ-দশকের শেষের দিকে বা পঞ্চাশ-দশকের প্রথম দিকেও যাঁরা নিয়মিত অভিনয় দেখেছেন তাঁদের হয়তো মনে আছে বহু রঙ্গালয়ে যে পর্দা ব্যবহার করা হতো (Drop scene-এর মতো) সেটা নানা বিজ্ঞাপনে ভরা থাকতো (দাদের মলম পর্যন্ত!)—কারণ তাতে কিছু রোজগার হতো।

পুরাণ বা ইতিহাস-আশ্রিত নাটকে সখীর নাচ থাকতো। নাচের ক্ষমতা, চেহারা, তাদের বিচিত্র পোশাক-আশাক এবং সর্বোপরি নাটকে তার প্রয়োজন আছে কিনা কেউ-ই ভেবে দেখতেন না। দৃশ্য বদলের জন্যও অনেক সময়ে

এই সব আমদানি করা হতো। দীর্ঘদিন এই সব দেখতে দেখতে সেটা এমনি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে সেগুলো যে রসসৃষ্টি এবং উপভোগে বাধা সৃষ্টি করতে পারে—এ বোধই অনেকের লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এসব কথা তুললে তাঁরা এমনভাবে তাকাতেন বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে উত্তর দিতেন, যেন এগুলো কিছুই নয়; আমরা ছিদ্রান্বেষী, তাই এগুলো উল্লেখ করি।

আরও গোলমাল ছিল। থিয়েটার পয়সা দিচ্ছিল না—অথচ সেজন্য থিয়েটার বন্ধও রাখা যাচ্ছিল না; মাঝে-মধ্যে নতুন নাটকেরও চেষ্টা করতে হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পয়সার খুবই প্রয়োজন। দিনের পর দিন এই অবস্থা সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রচেষ্টাকে যেন অবশ ক'রে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত হয় তাঁরা কোনো কিছু গ্রাহ্য করতেন না, নয় চোখ বন্ধ ক'রে রাখতেন। যেমন মনে আছে: 'আলমগীর' নাটকের এক দৃশ্য—আঁকা পর্দা, বেশ কয়েক জায়গায় ফুটো, রং চটে গেছে, কোথাও কোথাও দাগ লেগে আছে। 'রঘুবীর'-এ—নদীর দৃশ্য অথবা বনভূমি ঠিক মনে নেই এখন—পর্দা একাদিকে উঁচু হয়ে ঝুলছে! এগুলো দেখবার যেন কেউ নেই। কেবল সখীদের ব্যাপারেই নয়—মুখ্য চরিত্রেও সেই একই অবস্থা; রঘুবীর—শিশিরকুমার আর মণি শ্রীমানি করছেন জাফর। 'আলমগীর'-এ আলমগীর শিশিরকুমার কিন্তু রাজসিংহ হয় তারা ভাদুড়ী নয় মুরারি ভাদুড়ী; উদিপুরী—রেবা দেবী, রাণীবালা। অথচ এই সমস্ত নাটক যখন খ্যাতি পেয়েছিল তখন তো যোগ্য শিল্পী এবং সযত্ন প্রযোজনার জন্যই পেয়েছিল। শেষের দিকে তাই এসব নাটক দেখতে হ'লে কেবল শিশিরকুমার-অহীনবাবুর কথা ভেবেই যেতে হতো। সহশিল্পী ক্ষমতাশালী না হ'লে কারো পক্ষেই তো মনোমত এবং সাধ্যমত অভিনয় করা সম্ভব নয়। ফল যা-হবার তাই হতো—টুকরো টুকরো অংশ ছাড়া তাঁরাও ধরে রাখতে পারতেন না। প্রশ্ন বা মন্তব্য করলে অনেকেই বিরক্ত হতেন। 'পয়সা কোথায়? যা আছে তাই দিয়েই তো করতে হবে।'—এই ছিল উত্তর। আমাদের বিস্ময় লাগতো. কারণ অক্ষম অভিনয়, পরিকল্পনাহীন দৃশ্য-সজ্জা, যেমন-তেমন পোশাক, রূপসজ্জা—এসব দেখবো অথচ বলতে পারবো না? যদি এগুলো ঠিক করা না-ই যায় তাহলেও থিয়েটার চালাতে হবে—কেন? কেউতো শিশিরকুমার-অহীনবাবুর ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করতো না—করতো যখন অন্য শিল্পীদের বা আনুষঙ্গিক কারণে তাঁদের ক্ষমতা ব্যাহত হতো—অন্যথায় নয়। তাহলে?

নাটক ভালো হবে না, অভিনয়, প্রযোজনা ভালো হবে না, নাট্য-আবহাওয়া তৈরি থাকবে না, অথচ দর্শক আশা করবো? দর্শকেরও আশা তারা ভালো নাটক দেখবে—সেটা পূরণ করার দায়িত্ব নেই?

এ-ই হয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাস সবই হাত জড়াজড়ি ক'রে থাকে; ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমতাও লেগে থাকে ছায়ার মতো; বোধ-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রষ্ট-বুদ্ধিও সমান তালেই চলে; বিনয়ের হাত ধরেই দম্ভ চলাফেরা করে। একটু অসতর্ক হ'লেই বিনাশ-শক্তি এগিয়ে আসে এবং নিজের অজান্তেই একদিন লোকে নিজেরই দুর্বলতার শিকার হয়। দৃষ্টি হয় অস্বচ্ছ—মনের অর্গল বন্ধ হয়ে যায়—তখন কেউ নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না; ফলে ভুলের মাত্রাও বাড়তেই থাকে। বাড়িতে বা নিজের স্তাবকদের কাছে তাঁরা তখন রাজা-উজির বধ করেন—আর নিজের প্রচারের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠেন।

আমাদের অল্পবয়সী মন তখন বাধা মানতে চাইতো না। প্রতিটি শিল্পের, শুধু শিল্পকর্ম কেন, প্রতিটি কর্মেরই তো একটা নিজস্ব রীতি আছে—সাইকেল চালাতে গেলে যেমন সাইকেল নিয়ে দৌড়তে হয়, ব্যালান্স শিখতে হয়, অভিনয়ও তো তাই। উচ্চারণ, চলাফেরা, তাকানো, গলা—এসব ঠিক করতে হবে, এগুলোই প্রাথমিক প্রয়োজন। মঞ্চে যাবার আগে এসব ঠিক ক'রে নিতে হবে, তার জন্য যতদিন শিক্ষার প্রয়োজন, মহলার প্রয়োজন—করতে হবে। মনোমত শিল্পী সব সময়ে পাওয়া যায় না; অথচ যদি অভিনয় করতে হয়, যাঁরা আছেন তাঁদের যথাযথভাবে তৈরি ক'রে তবে তো মঞ্চে পাঠাতে হবে। খারাপ অভিনয় হ'লে—'যারা আছে তাদের দিয়েই তো করতে হবে—যা হবে তাই'—এ বললে হবে না। তাহলেই তো মণি শ্রীমানিরা জাফর খাঁ হবেন! (এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি—মণি শ্রীমানি মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কিছু কিছু চরিত্রে তিনি ভালোই অভিনয় করতেন, কিন্তু শিশিরকুমার রঘুবীর আর উনি জাফর খাঁ?—না, হয় না।)

১৯৪৮ সালে যখন নাট্য-ক্রিয়ায় যুক্ত হই তখন এই সমস্ত ত্রুটির কথা বারবার আলোচিত হয়েছে। আলোচনা করতে হয়েছে নতুন মঞ্চসজ্জা-রূপসজ্জা-আলোকপাত নিয়ে। যখন-তখন আলো জ্বলবে-নিববে না,স্পটের সামনে থেকে সেলোফেন খুলে স্টেজে পড়বে না, দৃশ্যান্তরে যাবার সময় মঞ্চে আওয়াজ হবে না—এ সবগুলো ভাবতে হয়েছে।

গত পর্বের প্রতিভূ অভিনেতা মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়াও তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার এবং সেই সঙ্গে এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নট-নির্দেশক শম্ভু মিত্র ও তাঁরই সহকর্মী গঙ্গাপদ বসু আমাদের সকলেরই শিক্ষাগুরুর কাজ ক'রে গেছেন। সামান্যতম ভুল-ত্রুটিও সহ্য করা হতো না এবং এই শাসন থেকে জ্যেষ্ঠ শিল্পীরাও বাদ পড়তেন না। মঞ্চসজ্জায় সামান্য গোলমাল হওয়ায় (আমাদের তখন সামান্য মনে হতো না) খুবই দায়িত্বশীল সভ্যকেও চলে যেতে বলা

হয়েছিল—এটা ঘটে 'দশচক্র' নাটকের প্রথম রাত্রে। ঠিক তেমনি আলোর সামান্য গোলমালে বিভাগীয় ক্ষমতাবান শিল্পীকে প্রচন্ড শাস্তি পেতে হয়েছিল—এটা ঘটে 'চার অধ্যায়'-এর সময়। একথা বলাব স্পর্ধা কারো ছিল না—'যা আছে তাই তো হবে'। এই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি কেবল 'বহুরূপী'রই ছিল না, আরো কয়েকটি সংগঠন এই কঠোর অনুশাসন মেনেই কাজ করতো।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের বহু প্রযোজনা দেশেব গৌরব হয়ে আছে। শুধু 'বহুরূপী'ই নয়, 'উত্তর সারথি' 'লিট্‌ল্‌ থিয়েটার' প্রভৃতি একাধিক সংস্থা গর্ব করার মতো কাজ করেছে। আরও কাজ যাঁরা করেছেন, নিজেদের অক্ষমতাকে নানা অজুহাতে যাঁরা ঢাকতে চাননি, বা—'বেশ করছি—মন্দ কী' অথবা 'আমরা তো করছি, অন্যরা সুবিধা করতে পারছে না'—বলেননি তাঁরাই জানেন সামান্য কিছু অর্জন করতে হ'লেও কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

আজ কিন্তু ভয় পাচ্ছি। বেশ কয়েক বছর ধ'রে থিয়েটার যেন রক্তহীন, জীবন-যৌবনহীন। কে কতটুকু ভালো করছে, কে করছে না—ব্যক্তিগত কি সংগঠনগত—সেসব বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের নামোল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু বলা যায় আজকের এ অবস্থা শুরু হয়েছে সত্তরের দশক থেকেই। সামান্য কয়েকটি প্রয়াস ছাড়া এই সময়ে গর্ব করার মতো কিছু নেই। সব থেকে আশঙ্কার কথা—যাঁরা একাজে লিপ্ত তাঁরাই এটা বুঝছেন না বা বুঝতে চাইছেন না। অপরের সমালোচনায় কুণ্ঠা তাঁদের যতো কম, নিজেদের ক্রিয়া-কর্মে গর্ব সম্ভবত ততো বেশি। ফলে তাঁরা না পারছেন অন্যকে সাহায্য করতে আর না পারছেন নিজেদের কাজকর্ম সার্থক ক'রে তুলতে।

নাট্যক্রিয়ার যে প্রাথমিক দায়, যার কথা আগে উল্লেখ করেছি, তা না মানার ফলে কী অবস্থা হয় তারও উল্লেখ করতে পারি। কনিষ্ঠ, কিন্তু বন্ধু-স্থানীয় এক অভিনেতা-পরিচালক, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এক অভিনেতাকে নিয়ে একটি বিখ্যাত নাটক মঞ্চস্থ করলেন। ভিড় উপচে পড়লো। কিন্তু কী দেখলাম? বেশির ভাগ শিল্পী মঞ্চে ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারছেন না; উচ্চারণ গোলমেলে—কানে ঠেকে; কণ্ঠস্বর আর যাই হোক অর্থ বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে না। অভিনেতা-পরিচালক বন্ধুটিও জানতেন। আমি বলায় দু:খের সঙ্গেই মেনে নিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বললেন: 'কী করা যাবে—দলে বেশির ভাগ শিল্পীরই ওই অবস্থা। শুধু আমাদের দলেই নয়—আপনারা ছাড়া বেশির ভাগ দলেই এই অবস্থা, আর সেই জন্যই ওয়ার্কশপ করার চেষ্টা করছি যাতে এসব শেখানো যায়'।—অর্থাৎ আমন্ত্রিতদের খাবার পরিবেশন করার পর রান্না শেখার প্রচেষ্টা!' তবু বলবো সেই পরিচালক অন্তত ব্যর্থতা স্বীকার করেছিলেন এবং

বলেছিলেন চেষ্টা করবেন। অন্য বহু লোক করেন না, এসব যে বিশেষ প্রয়োজন তাও মনে করেন না। বছরের পর বছর একই নাটক ক'রে চলেছেন—কারণ একসময় এই নাটকটা কিছু পযসা দিয়েছে। আমন্ত্রণ-শো-এর ওপর নির্ভর ক'রে অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। এতে হয়তো অস্তিত্ব বজায় থাকছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। শুধু 'বহুরূপী', 'পি. এল. টি'-ই তো নয়—আরও ৫/৭টি সংস্থা নিয়মিত অভিনয় ক'রে চলেছেন। কিন্তু কী দেখি? কাউকে ছোটো বা নস্যাৎ করার জন্য নয়, যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অসতর্ক মনকে ধাক্কা দেবার জন্যই এই কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি যদি কোনো কাজ করতে না পারি তাতে তো দোষ নেই; কিন্তু অক্ষম আমি, যা ইচ্ছা ক'রে যাবো এবং নিজে ভাববো ভালোই করছি—সেটা সাংঘাতিক। মনে মনে সবাই সেই কথা ভাবছি, সেই কাজ করছি ব'লেই সম্ভবত আজ এই বন্ধ্যা অবস্থা।

চল্লিশের দশকের শেষদিকে থিয়েটারের পড়ন্ত অবস্থা আমরা তো দেখেছি—অনেক শুনেছি। আমরা জানি আত্মতুষ্টি, দম্ভ কিংবা স্রোতে গা ঢেলে দিলে কী ভাবে ভালো জিনিসও নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিদিনই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়, কিন্তু সচেতন হয়ে চেষ্টা ক'রে যাওয়াটা তো প্রতিদিনেরই কাজ। আত্মতুষ্টির স্থান কোথায়? এসব দেখেও জে ে ঃ কি আমরা সতর্ক হবো না?

'কাল' কাউকে গ্রাহ্য করে না। আজ কারও পাছ্দোহারি ক'রে কেউ হয়তো সামান্য একটু নাম, কিছু পুরস্কার, চাকরিতে কিছু সুবিধা, সরকারি ঘরবাড়ি—এই জাতীয় কিছু কিছু সুযোগ পাচ্ছেন কিংবা খ্যাতিমান কোনো ব্যক্তির প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এসবের সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার কি সম্পর্ক? এতে নাটক, অভিনয়-প্রযোজনার উন্নতি কী হচ্ছে?

নাট্যক্রিয়ায় যেন একটা সুবিধা আছে: এখানে কোনো শিক্ষারই বোধহয় প্রয়োজন নেই। নাচ শিখতে হয়, গানেও সরগম থেকে শুরু করতে হয়—বেসুর-বেতাল নিয়ে তর্ক করা চলে না, ছবি আঁকায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করেন না; কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অভিনয় শেখা হয়ে যায়। তাই স্কুল, কলেজ, পাড়া এবং অফিস ক্লাবে নাটকে সবাই অংশ গ্রহণ করে, মেডেল সার্টিফিকেট অনেকেই পান। তাঁরা সবাই এক-একজন দিগ্গজ! এর ওপর আবার যদি কেউ ছোটো বা বড়ো কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বা মাঝেমধ্যেই অভিনয় ক'রে থাকেন তাহলে তো কথাই নেই। নিজেদের কাছে সবাই জনে-জনে শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী! আদপে

তাঁরা যে মণি শ্রীমানিও নন, কে বোঝাবে তাঁদের! এ অবস্থায় কী আর আশা করা যায়?

কিছুদিন আগের একটি নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বলি। নাটকটি সু-অভিনীত, সু-প্রযোজিত এবং দর্শক-সমালোচকদেব প্রশংসাও পেয়েছে। সেদিন কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী বদল করা হয়েছে; যাঁরা করলেন ভালো করতে পারেননি। শুধু আগের অভিনয়ের তুলনায় নয়—সাধারণ অভিনয়ের মাপকাঠিতেই। আলোর ব্যবহারে খুবই গোলমাল এবং অভিনয় চলাকালীন নেপথ্য থেকে আওয়াজ বড্ড বেশি আসছিল। বললাম পরিচালককে; যেন এগুলো কিছুই নয়, উত্তর দিলেন: 'কী আর করা যাবে, বাধ্য হয়েই কয়েকটি অভিনয়ে এই বদল করতে হয়েছে। যারা আছে তাদের দিয়েই তো অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে, না হ'লে তো অভিনয় বাতিল করতে হয়'। আলোর গোলমাল, নেপথ্যের আওয়াজ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই বললেন না। সে-ই উপেক্ষা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! কোনো দায়বদ্ধতা নেই; খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। বাধ্য হয়ে যদি বদল করতেই হয় তাহলে দিন-রাত খেটে নতুনদের তৈরি করতে বাধা কোথায়? এবং যা শুনলাম, বদল সেদিনই প্রথম হয়নি। আর তৈরি যদি ভালো না হয়, একটা অভিনয় বাতিল ক'রে যোগ্যমান বজায় রাখার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? আলো-মঞ্চ-রূপসজ্জা—এসব ব্যাপারেই বা সতর্ক দৃষ্টি দেবার অসুবিধা কোথায়?

এই অবহেলার মন নিয়ে তাঁরা কী ক'রে কাজ করছেন? অথচ তাঁরাও যখন কাজ শুরু করেছিলেন একটা আদর্শ নিয়েই তো শুরু করেছিলেন? এইসব ঘটনাকে প্রশ্রয় দেবার কথা নিশ্চয় তাঁরাও তখন ভাবেননি। সামান্য নাম, খ্যাতি তাঁদের চিন্তা-পদ্ধতির ওপর কী-পরিমাণ শ্যাওলা টেনে এনেছে! আত্মতুষ্টি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের? এই মনোভাবের জন্যই তো ক্রমশ চটা-ওঠা পর্দা, যা-ইচ্ছা পোশাক-আশাক এবং যে হোক সে মঞ্চ অধিকার ক'রে বসছে। একদিন এই রকম মনোভাবই তো থিয়েটারকে পঙ্গু করেছিল। সব জেনে আমরাও যদি এইভাবেই কাজ ক'রে যাই—তাও দম্ভ-ভরে, তাহলে আমরাই কি থিয়েটারের সর্বনাশ ডেকে আনছি না? কে আমাদের ক্ষমা করবে?

অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাবেই হোক বা কলাকুশলীর অভাবেই হোক, যদি দেখা যায় পছন্দমতো নাটক করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে সে নাটকে হাত দেবো কেন? যখন ক্ষমতা হবে তখনি সে নাটক নেবো। সার্থকভাবে তৈরি না ক'রে কাউকে মঞ্চে পাঠাবো কেন? নিজেরাই বা যাবো কেন? কেউ তো বাধ্য করছে না—নিজেদের অজ্ঞতা বা স্পর্ধা ছাড়া—তবে?

আজ দেখছি নানা জায়গায় নাট্যশিবির হচ্ছে, ওয়ার্কশপ হচ্ছে—বক্তৃতা হচ্ছে। আগে এসবের বালাই ছিল না। তখন মূলত ব্যক্তিগত প্রয়াসে শিখে

নিতে হতো—যে যতোটা পারে। ক্ষমতাবান নট-নির্দেশকের সাহায্য, শিক্ষা, যতো বেশি শিশিক্ষু ছেলে-মেয়ে পায় ততোই ভালো। শিক্ষণীয় বিষয় এবং যোগ্য শিক্ষক ঠিক কবতে পারলে ফল ভালো হবারই কথা—কিন্তু গোলমাল হ'লে ফল খুবই খারাপ হবে। এই বকম বহু নাট্যশিক্ষা আসরে এমন নট-নির্দেশককে শিক্ষকের ভূমিকায দেখেছি যাঁদের নিজেদেরই অভিনয়-নির্দেশনা ব্যাপারে আশু শিক্ষাগ্রহণ প্রযোজন। এই রকমই যাঁরা সেজেগুজে শিক্ষা, বক্তৃতা অথবা উপদেশ দিতে যাচ্ছেন তাঁরা একবাবও ভাবছেন না—বক্তৃতা, উপদেশ, শিক্ষা দেওয়া তাঁদের উচিত নয়। সেই সময়টা নিজেদের শিক্ষার জন্য দিলে তাঁদের নিজেদেরই ভালো হবে এবং উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা ঠিক ক'রে নিতে সময় পাবেন।

যেখানে-সেখানে বা যখন-তখন উপদেশ, বক্তৃতা বা শেখাতে যাওয়ার মধ্যে একটা দেখানোপনা প্রকাশ পায়, স্পর্ধা প্রকাশ পায়। কী লাভ হয় তাতে? এ-কাজ কি সকলের পক্ষে সাজে? এখনো শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত এবং আরো দু-একজনই আছেন যাঁরা যথার্থই অভিনয, নির্দেশনা, নাটক নিয়ে বলতে পারেন, শেখাতেও পারেন—তাও যদি যথেষ্ট সময় এবং মন দেন। তাঁরা বারবার নানাভাবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁদের অভিনয়, প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছে—সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যোগ্যরা হন বিনীত—সহজে একাজে এগিয়ে আসেন না; অন্যরা কিন্তু উন্মুখ হয়ে থাকেন। তাই দেখি বক্তৃতা-উপদেশ-ওয়ার্কশপ হচ্ছে ঠিকই, কাজ বিশেষ হচ্ছে না। নতুন শিল্পী, কলাকুশলী তৈরি হচ্ছে না। খুব বিবেচনা ক'রে যদি ওয়ার্কশপ বা আলোচনার ব্যবস্থা করা যায় এবং ক্ষমতাবান লোকেদের যদি আনা যায় তাহলেই ভালো ফল হয়, না হ'লে নয়।

যে অবস্থায় এসে পড়েছি তাতে সতর্ক না হ'লে আমরা বাঁচবো না। ক্ষমতা যদি কারো বেশি থাকে খুবই ভালো কথা—কিন্তু বিনীত হতে দোষ কী? অপরকে শিক্ষা, বক্তৃতা, উপদেশ দেবার চেষ্টা না ক'রে নিজেদের যদি শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারি, যদি চোরাপথ আর শস্তা নামের মোহ ত্যাগ ক'রে নিজের কাজে মন দিতে পারি, তাহলে যুগান্তকারী সৃষ্টি কিছু না করতে পারলেও সম্মান বজায় রাখতে পারবো। কেউ বলবে না—এঁরা অভিনয় করতে করতে সংলাপ ভুলে যায়; এঁদের উচ্চারণ কিংবা কণ্ঠস্বর পীড়াদায়ক; দৃশ্য, রূপসজ্জা, পোশাক, আলোর ব্যবহারে এঁরা চোখ বন্ধ ক'রে রাখেন। সর্বোপরি, একথা তো কেউ বলবে না—এঁরা থিয়েটারকে উপেক্ষা করেন, নিজেদের ব্যর্থতা নানা অজুহাতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। ছত্রিশ বছর পরে, ছত্রিশ বছর আগের চেহারাটা বারবার মনে আসছে, আর তাই সতর্ক হবার চেষ্টা করছি। এখনই তো সময়—একটু থেমে নিজেরা নিজেদের বুঝে নিই, প্রয়োজনে ছাত্রের

মতো আবার কাজ শুরু করি। কিছু সৎ ক্ষমতাবান কর্মী নিশ্চয়ই আছেন—সকলেই যদি আরো যত্ন নিয়ে কাজ করতে থাকেন বন্ধ্যা অবস্থা কাটবেই।

রচনাকাল : ১৯৮৪
বহুরূপী পত্রিকা/৬১ সংখ্যা

যাঁকে দেখে উৎসাহিত হয়েছিলাম

'আগামীকাল, আগামীকাল, আবারও আগামীকাল'—কলকাতার এক নাট্যদলের মহলাকক্ষে সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় নাটক পাঠ করছেন। স্তব্ধ মহলাকক্ষে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শুনছেন সেই নাট্যপাঠ। শ্রোতাদের মধ্যে আছেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নির্দেশক শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু এবং আমার মতো আরও কয়েকজন। পাঠান্তে প্রৌঢ় নাট্যকার তাকিয়ে আছেন সবার দিকে—কিন্তু দৃষ্টি বহু গভীরে। যেন কোন দূর অতীতে চলে গেছে তাঁর মন এবং চিন্তা। শ্রোতাদের মধ্যেও সবাই নির্বাক।

'এ বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, এ বাংলা শুধু মুসলমানের নয়...' ইত্যাদি—

এবারের প্রেক্ষাপট আলাদা। সাধারণ রঙ্গালয়ের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'সিরাজবেশী' নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আর্তি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিত হয়ে উঠছে। সিরাজ একা নয়, দেশের প্রতি যুবমানস যেন সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে বলছে—দেশের প্রতি দায়—আমার, তোমার, সকলের।

স্তব্ধ, উত্তেজিত দর্শক কয়েক মুহূর্তের জন্যে হাততালি দিতেও ভুলে গেল! সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সমস্ত দর্শক একসঙ্গে করতালি দিয়ে উঠলো। যেন বলতে চাইলো—'সিরাজ, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'

যিনি পাঠক, পাঠ করছিলেন নাট্যদলের মহলাকক্ষে, যাঁর নাটক অভিনীত হচ্ছিল রঙমহল মঞ্চে, তিনি হলেন কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিভূ: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কিন্তু কেবলমাত্র এই দু'টির উল্লেখেই ঐ বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই শতকের তিরিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে নাটক লিখে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়ে, তিনি সবসময়ই কেবলই যে চমক সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, শিল্পীগোষ্ঠী এবং দর্শকদের উদ্বুদ্ধও ক'রে তুলেছেন।

পুরাণ-আশ্রিত বা ঐতিহাসিক নাটকই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে, সমস্যাসঙ্কুল এই সমাজকে নিয়ে তিনি একের পর এক নাটক লিখে গেছেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বেই নয়, নাট্যরচনার আঙ্গিকেও তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছেন। শ্রী সতু সেন এদেশে ফিরে এসে প্রথম যে নাটক মঞ্চস্থ করেন, সে নাটক শচীন সেনগুপ্তের-ই লেখা—'ঝড়ের রাতে।' আঙ্গিক এবং উপস্থাপনের কলাকৌশলে তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সময় থেকেই দেখি—ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের সুবিধা-অসুবিধার কথা মাথায় রেখে, শচীন্দ্রনাথ একটার পব একটা নাটক লিখে চলেছেন। সে সমস্ত নাটক জনপ্রিয় হয়েছে এবং রঙ্গালয়কে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছে। গল্প, উপন্যাসের নাট্যরূপেও তাঁর অবদান নিশ্চিতভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ সকলের কাছেই স্মরণীয় হয়ে আছে—'দেবদাস'। 'দেবদাস'-এর নাট্যরূপে দেখি বসন্ত নামে একটি নতুন চরিত্রের আগমন ঘটেছে। বসন্ত 'দেবদাস' উপন্যাসে নেই, আছে নাটকে।

নতুন চরিত্রের আবির্ভাব সমালোচকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু সব আলোচনা শেষ হয় একটি যুক্তিতে; বসন্ত, নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। আজ ৫০ বছর পরে একথা বলা যত সহজ, কাজটা করা সে সময় অতীব দুরূহ ছিল। দেশে শরৎ-ভক্ত ছিলেন বহু-বিস্তর। আর নাট্যপ্রেমীও অগণিত। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মনে হয়েছে এ সংযোজন নাটকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারা যায় কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে স্বভাবতই তা সম্ভব নয়। তাই আশঙ্কা থেকে যায়, 'অন্ধের হস্তী দর্শনের' মতো আমরা টুকরো টুকরো ভাবে শচীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করছি, সম্পূর্ণটা হয়তো নয়।

শুধু সেদিনের থিয়েটারই নয়, '৪৪ সাল থেকে যে ভিন্ন-থিয়েটার—যা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দেশের জনমানসে, শচীন্দ্রনাথের আগ্রহ উৎসাহ তার প্রতিও কিছু কম ছিল না। নতুন নতুন নাট্যগোষ্ঠী, যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে কাজ ক'রে চলেছেন, অসীম স্নেহভরে, উৎসাহ দিয়ে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন তিনি।

১৯৫৪ সালে, স্বাধীন ভারতে প্রথম 'জাতীয় নাট্যোৎসব'-এর আয়োজন হয় দিল্লীতে। শচীন্দ্রনাথ সেখানেও পুরোধা। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাংলা থেকে শিশিরকুমার, শান্তিনিকেতন থেকে কোন নাট্যগোষ্ঠী এবং 'বহুরূপী' যেন ঐ 'নাট্যোৎসব'-এ যোগ দেয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতামূলক উৎসবে যোগ দিচ্ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও

কেবলমাত্র 'বহুরূপী' ছাড়া বাংলা থেকে অন্য কোনো গোষ্ঠী যোগ দিয়ে উঠতে পারেনি। এই উৎসবে 'বহুরূপী'-প্রযোজিত 'ছেঁড়াতার' ও 'রক্তকরবী' শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে পুরস্কৃত হয়।

'এশিয়ান থিয়েটার ইন্স্টিটিউট', যা পরবর্তীকালে 'National School of Drama' নামে পরিচিত হয়, তার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন শচীন্দ্রনাথ। তাঁরই উদ্যোগে আমাদের দেশের গৌরব শ্রী সতু সেন ঐ থিয়েটারের প্রথম নির্দেশক হিসাবে যোগদান করেন।

'বহুরূপী'-প্রযোজিত 'রক্তকরবী' 'বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি'র হস্তক্ষেপে বন্ধ হবার উপক্রম হয়। শচীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন 'বহুরূপী'কে সাহায্য করার জন্য। বর্তমান নিবন্ধকারকে নিয়ে, তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে 'সঙ্গীত সমিতি'র সচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান।

এ রকম হাজারো উদাহরণ আছে, যা দিয়ে নাট্যজগতের শচীন্দ্রনাথকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু তিনি কেবল নাট্যকারই নন বা তাঁর যাতায়াত কেবল নাট্যজগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শরিক শচীন্দ্রনাথ নাট্যজগতে আসবার আগেই 'যুগান্তর' প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মই ছিল যুবক শচীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিপর্ব।

সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এই পর্বেই শুরু হয়। 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও আসে এই সময়েই। আমরা জানি, আরও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে কখনো-বা সম্পাদক হিসাবে, কখনো-বা লেখক হিসাবে, তিনি যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার', 'কৃষক', 'নবযুগ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্যামবাজারে তাঁর ছোট্ট বৈঠকখানায়—গল্পগুজবে, কখনও-বা নাট্যপাঠে, কখনও-বা নাট্য-সমালোচনায় যোগ দেননি এরকম প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রী খুবই বিরল। তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। সকল বয়সের লোকেদেরই ছিল অবাধ গতি। তিনি নিজে আর্থিক দিক থেকে খুব একটা সচ্ছল অবস্থায় ছিলেন না, কিন্তু সাহায্য করবার সময়ে কখনোই সেটা তাঁকে মনে রাখতে দেখিনি আমাদেরই চোখের সামনে সে সময়ের এক বিখ্যাত নট আসেন এবং শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাদা কিছু কথা বলেন। শচীন্দ্রনাথের সস্নেহ তিরস্কারের কণ্ঠস্বরও আমরা শুনতে পাই। কিছুক্ষণ পরে সেই শিল্পী চলে যান। চলে যান খুশি হয়েই। শচীন্দ্রনাথের অর্থ-সাহায্য তাঁকে খুশি করে। কিন্তু না, শচীন্দ্রনাথ তাঁর সাহায্য দানের কথা আমাদের বলেন নি। যিনি উপকৃত হয়েছিলেন তিনিই বলেছিলেন।

সর্বতোভদ্র এই মানুষটি তাই কেবল নাট্যকার নন, কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী নন, কেবলমাত্র সাংবাদিক নন; বলতে পারি তিনি এক সম্পূর্ণ মানুষ। সেই যুগেরই প্রতিভূ। আজ শতবর্ষ উপলক্ষে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই প্রয়াস অন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে— এ বিশ্বাস আমার আছে।

রচনাকাল: ১৯৯৩
শচীন সেনগুপ্ত জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণিকা।

রাজা: অমর গঙ্গোপাধ্যায়

কিছু কথা

আমি ১৯৪৮ সাল থেকে নাটক করা শুরু করেছি; এখন যাকে 'গ্রুপ-থিয়েটার' বলা হয় সেই থিয়েটারের কথাই বলছি। খুব চমকপ্রদ ভাবেই এই থিয়েটারে এলাম। সংক্ষেপে বলি, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলে—ঠিক পালিয়ে আসা নয়, 'চলে আসা' বলাই ভালো। বাড়ি থেকে ব'লেই এসেছিলাম। সুতরাং 'পালিয়ে আসা' কথাটা ঠিক নয়। আসলে আমি যেভাবে থিয়েটার ক'রে যাচ্ছিলাম তাতে আমার বাড়ির লোকদের মনে হয়েছিল আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমি নষ্ট হয়ে যাবো। তাই চেষ্টা চলছিল দিনের বেলায় চাকরির, আর রাতে কলেজ। তবে সে সময় সান্ধ্য কলেজ তো বেশি ছিল না।

আমার বাবার নাম ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় অভিনেতা—অহীন্দ্র চৌধুরী কিংবা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে সহজেই তুলনীয়; অবশ্যই শিশিরবাবুর সঙ্গে নয়। শিশিরবাবু আমার চোখে একটু আলাদা। বাবা অহীনবাবুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, শিশিরবাবুকেও চিনতেন। অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন আমার বাবা। ঐ রকম কণ্ঠস্বর আমি খুব কমই শুনেছি। নির্মলবাবুর গলা মিষ্টি ছিল, সুরেলা ছিল কিন্তু চড়া পর্দায় যতটা যেত খাদে ততটা নয়; দুর্গাদাসবাবুর গলাও খুব মিষ্টি ছিল, খাদের দিকে ভালো কিন্তু চড়া পর্দায় বেশি যেতো না। বাবার গলায় রেঞ্জ ছিল বেশি। আর চেহারাটি ছিল অপূর্ব সুন্দর; আজকের ফিল্মের হিরোদের মতো নয়। আগেকার দিনের বাঙালিদের সুন্দর চেহারা বলতে যা বোঝাতো—বড় কপাল, বড় চোখ, বড় নাক, সুন্দর স্বাস্থ্য—এই সব। ১৯৭৫ সালে তিনি গত হন।

বাবা নাটক করার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ জোগাতেন। তবে তিনি চাইতেন না আমি নিয়মিত নাটক করি। কিন্তু একবার যার কপালে সাপে ছোবল মারে তার কি রেহাই আছে! বাড়ি ছাড়লাম। একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। ভালো করেছিলাম কি খারাপ করেছিলাম জানিনা, তবে করেছিলাম। বললাম, চাকরি পেয়েছি; সিটি কলেজে পড়াশুনা করবো। আসলে চাকরি পাইনি।

কিন্তু চাকরির কথা না বললে তো আসতেও দিত না। কলকাতায় এসে বড় কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছি; ওগুলো বড় ব্যক্তিগত—তার ভেতরে আর যেতে চাইছি না।

১৯৪৭ সালে পাটনায় আই.পি.টি.এ.-তে সিস্টার পুষ্প ছিলেন। ওঁদের উৎসাহে সেখানে গিয়েছিলাম। একটু নামও হয়েছিল আমার। তবে সে নামের তো কোনো মানে হয় না। ঐ বয়সে একটু-আধটু নাম করলেই মাথা ঘুরে যায়—শিশির ভাদুড়ির পরেই আমি—এই আর কি!

যাই হোক, কলকাতায় এসে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলাম। তবে সেখানে বেশি দিন থাকা হয়ে ওঠেনি। খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কোথায় কী করা যায়। লেখাপড়াটা ছাড়িনি, চাকরির সন্ধান করছিলাম; শুধু সন্ধানটাই হচ্ছিল—চাকরিটা হচ্ছিল না। মনে রাখা দরকার সেটা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের '৪৭-এর কলকাতা। এই ভাবেই শুরু হলো কলকাতার জীবন।

যখন কিছুতেই কিছু ক'রে উঠতে পারছি না তখন একদিন সাহস ক'রে শ্রীরঙ্গমে গেলাম—যার এখনকার নাম বিশ্বরূপা। বাড়িটা ছিল অন্যরকম। বুকিং অফিসটাও ছিল সামনের দিকে—প্রায় রাস্তার ওপরেই। একটু ভেতরে গিয়ে, যেখানে ক্যানটিনগুলো হয়েছে—সেখানে ফরাশ পাতা থাকতো। ফরাশে বসে যাঁরা আড্ডা দিতেন, গল্পগুজব করতেন—তাঁরা বেশ নামী এবং বয়স্ক। সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। আমরা দূর থেকে দেখতাম।

তবু রোজই যেতাম, উদ্দেশ্য—শিশিরবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। দেখাই হয় না। মুরারি ভাদুড়ী—ওঁর এক ভাই, পুলিশের মত পাহারা দিতেন—যাতে ওঁকে কেউ বিরক্ত না করে। একদিন এক ফাঁকে ঢুকে পড়লুম। স্টেজের পাশে হাফ-ইজিচেয়ারে ব'সে চুরুট খাচ্ছিলেন আর বই পড়ছিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, উনি দেখলেনও না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলেন 'কী চাই?' প্রণাম ক'রে বললাম—'থিয়েটার করতে চাই'। উনি একবার তাকালেন; আমি দেখলাম—ভারি লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা, বড় বড় ভুরু, টাকমাথা, সামান্য-সামান্য চুল।

—'কতদূর লেখা-পড়া করেছ? কোয়ালিফিকেশন কী?'

—'আই.এ. পড়ছি।' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম।

—'পড়াটা কোনো কোয়ালিফিকেশন নয়। তুমি কী পড়ছ সেটা কোনো কথাই নয়, পাশ করার পর সেটা কোয়ালিফিকেশন হয়। কে বললে থিয়েটারটা মূর্খদের জায়গা? লেখাপড়া ক'রে এস—যাও।'

হয়ে গেল। চলে এলাম।

দ্বিতীয়বার কোনো ঝুঁকি নিলাম না। সোজা রঙমহলে গিয়ে অহীনবাবুকে বললাম যে বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন—'কে বাবা?' বাবার নামটা বললাম। উনি চিনলেন; এই জন্যই হয়তো, বাবা যে চরিত্রটা করতে করতে থিয়েটার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, অহীনবাবু সেই চরিত্রটাই করেছিলেন—বোধহয় 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকে; আমার ভুলও হতে পারে। বাবাকে নির্বাচিত করেছিলেন টি.এন. পালিত ব'লে বিখ্যাত এক অভিনেতা—তাঁকে সকলে পালিত সাহেব বলতো। যতদূর জানি, বাবা বোধহয় দু'এক রাতের বেশি পেশাদারি মঞ্চে অভিনয় করেন নি। আসলে এগুলি শোনা কথা, কারণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল আমার জন্মের আগে।

অহীনবাবু, শরৎ চট্টোপাধ্যায় ব'লে এক ভদ্রলোককে ডাকলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি বোধহয় তখন ঐ থিয়েটারের 'লেসি' ছিলেন। লম্বা-চওড়া চেহারা; কানে একটু কম শুনতেন।

—'শরৎ, ভৈরবের ছেলে এসেছে—দ্যাখো তো ওর গলা-টলা একটু...'

তখন গলাটাই বেশি ক'রে দেখা হতো, আর মোটা-সোটা চেহারা। লম্বা হবে, মোটা-সোটা হবে, একটু ভুড়ি থাকবে—এসব শুনলে অবাস্তব মনে হবে, কিন্তু তাই তো দেখতাম। শরৎবাবু ডাকলেন—'ছোকরা এদিকে এসো—'; 'ছোকরা'!— বেশ রাগ হলো। বললেন—'পদ্য-টদ্য জানো? একটু এ্যাক্টো ক'রে দেখাতে পারবে?' একে ছোকরা বলাতেই চটে ছিলাম, আবার 'পদ্য-টদ্য'! উনি জানেন আবৃত্তি ক'রে কত মেডেল পেয়েছি!—অকালে পাকার ফল আর কী!

গলা-টলা কাঁপিয়ে ধরলাম: 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে...'

আসলে ওটা ক'রেই অনেক মেডেল পেয়েছি আর অকালপক্কতার দোষেই মনে হয়েছিল ঐ কবিতাটা আমি ভালই করি।

সবে একটা পংক্তি শেষ করেছি উনি বললেন—'থাক্, থাক্, হয়েছে'। বুঝলাম সর্বনাশ হয়ে গেল। অর্থাৎ পছন্দ হয়নি—না হ'লে থামাবেন কেন? কিন্তু উনি বললেন—'অহীনদা, ছোকরাটির গলা ভাল'।—এবার 'ছোকরা' বলাতে রাগ হ'লো না—কারণ 'গলাটি' ভালো বলেছেন! শরৎবাবু কতগুলো 'শাট' দিলেন—'শাট' হ'লো নাটকের কপি—হাতে লেখা। কতগুলো চরিত্র দেখিয়ে বললেন—'এগুলো মুখস্থ ক'রে এসো। প্রত্যেক দিন আসবে, কেউ অসুস্থ কিংবা অনুপস্থিত থাকলে সেই দিন ঐ চরিত্রে তুমি অভিনয় করবে। তখন বললে হবে না যে মুখস্থ হয়নি। আর দ্যাখো বাপু, এখন কোনো মাইনে-টাইনে দেওয়া হবে না। যখন নতুন নাটকে নতুন পার্ট পাবে, তখন

মাইনে ঠিক হবে। এখন ৩০ টাকা রাহা-খরচ পাবে।' ৩০ টাকা পাওয়াটা বড় ব্যাপার নয়, থিয়েটারে প্রবেশের পথ খুললো—এটাই বড় প্রাপ্তি। প্রায় বাতাসে ভর ক'রে চলে এলাম।

তখন আমি থাকতাম ৪৫এ, সিমলা স্ট্রীটে। সে সময় বুধ, বৃহস্পতি একটা নাটক হতো; শনি, রবি নতুন নাটক। রোজই আসি। কিন্তু কেউ অসুস্থ হয় না, কামাই-ও করে না। তবে অসুস্থ হ'লে অভিনয়ের সুযোগ পাবো—এটা ক্রমশ আমার মর্যাদাকে আঘাত করতে লাগলো। আর এসব নিয়ে অহীনবাবুকেও বারবার বিরক্ত করা যায় না। তাছাড়া ওঁর ব্যাপারটাই ছিল স্বতন্ত্র। উনি গেলেই আশে-পাশে সবাই থমকে দাঁড়াত। লম্বা-চওড়া চেহারা, গম্ভীর, ব্যক্তিত্বময় সুপুরুষ। কারো সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। সুতরাং মাসখানেক যাওয়া-আসা ক'রে ছেড়ে দিলাম—মানে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম। ওঁরাও খোঁজ নিলেন না। নেওয়ার কথাও নয়। সুতরাং অবস্থা গিয়ে দাঁড়ালো আগের মতোই। অবশ্য সেই সময় বাইরে কিছু কিছু অভিনয় করেছি। কমল সাধুর সঙ্গে 'মিশিরকুমারী', বিবেকানন্দ স্পোর্টিং-এ 'পি.ডব্লু.ডি.' প্রভৃতি। কিন্তু এগুলো করতে তো কলকাতায় আসিনি; সুতরাং মানসিক অস্থিরতা ভিতরে ভিতরে কাজ করতে লাগলো।

এদিকে দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্মী অচলা। এক বেলা খাওয়া ম্যানেজ করি তো, অন্য বেলা হয় না। হঠাৎ একটা চাকরি জুটলো। তখন সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তানে কিছু ডক্যুমেন্টস পাঠানো হবে; সেগুলো রেজিস্টার্ড কোম্পানির ডক্যুমেন্টস। এই সব ডক্যুমেন্টস কপি করার জন্য সরকার কিছু অস্থায়ী লোক নিয়োগ করে। ওখানে আমি কাজ পাই। ৭৫ টাকা ৪ আনা বিল হয়। চার আনা আমি পেয়েছিলাম, ৭৫ টাকা ওঁরা মেরে দিলেন!

এই পরিস্থিতিতে আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লাম। মনে হ'লো আর পারা যাবে না। ফিরে যেতেই হবে। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে; কতদিন আর না খেয়ে থাকা যায়? উপলব্ধি করলাম, নিজের সম্বন্ধে যা কিছু ভাবনা, পরিকল্পনা—সবটাই বুঝি অধরা থেকে যাবে অথবা ওগুলো একান্তই কাল্পনিক, অবাস্তব। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি বিভিন্ন ঠিকানার মাধ্যমে। কারণ একবার যদি তারা বাড়ির স্থায়ী ঠিকানাটা জেনে ফেলে তাহলে ধরে নিয়ে যাবে।

এই সময় কলিম শরাফীর সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো। সেটা '৪৮-এর গোড়ার দিকের ঘটনা। ওঁকে বললাম—থিয়েটার করতে এসেছিলাম, হ'লো না। কার সঙ্গে থিয়েটার করবো? এ্যামেচার ক্লাবে করা যায় না; সেখানে সবাই আট আনার শিশির ভাদুড়ী কিংবা আট আনার নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

আমি আট আনার শিশিরবাবু হতে আসিনি। অগত্যা ফিরেই যেতে হবে।

শবাফী বললেন: 'চলুন, একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তিনিও বসে আছেন। একটা 'গ্রুপ' কববেন।' 'গ্রুপ'! এ্যামেচার ক্লাব বলা হতো, পাড়ার ক্লাব, অফিস ক্লাব আছে—কিন্তু 'গ্রুপ'—তখন পর্যন্ত না-শোনা কথা। বললাম—'কোথায়'? বললেন—'আই.পি.টি.এ.' ভেঙে গেছে; শম্ভু মিত্র মশাই বসে আছেন। আমরা একই ফ্ল্যাটে থাকি। ফ্ল্যাটটা আমারই—শম্ভুদা, বৌদি ওখানেই আছেন।

পরের দিন গেলাম। অল্প বয়স্ক, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, পাওয়ারফুল লেন্সের চশমা, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী—একজন ভদ্রলোক। আমি থিয়েটার ভালোবাসি শুনে, শম্ভু মিত্রের ভালো লাগলো। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম—অভিজ্ঞতার সঞ্চয় অবশ্য সামান্যই। উনিও শোনালেন—ওঁর কথা। আমাকে আবৃত্তি করতে বললেন। করতে গিয়েও কী ভেবে করলাম না; জীবনে ঐ একটিবারই আমার বুদ্ধি হয়তো ঠিকমত কাজ করেছিল। বললাম—'আপনি আগে শোনান।' ওঁকে বলতেই—উনি করলেন। ভালো আবৃত্তি করতে পারি—এটা আমার গর্ব ছিল। শম্ভুদার আবৃত্তি শুনে সেই গর্ব লজ্জায় মুখ ঢাকলো।

আই.পি.টি.এ. তখন ভেঙে গেছে। ওঁরা সবাই 'ধরতী কি লাল' ছবির শুটিং ক'রে বোম্বে থেকে ফিরেছেন। প্রকৃতপক্ষে আই.পি.টি.এ. আগেই ভাঙতে শুরু কবেছিল। 'ফিল্ম'-টাই সিমেটিং ফ্যাক্টরের কাজ করেছিল। সবাই ভেবেছিল—'ফিল্মটা' তো করে নি, ওটা হাতছাড়া করি কেন!

শম্ভুদা বেরিয়ে এসেছেন, মহর্ষি ছিলেন 'আই.পি.টি.এ.'-র সর্বভারতীয় সভাপতি—তিনিও থাকলেন না। বিজনদা, গঙ্গাদা, তৃপ্তি মিত্র—এরকম অধিকাংশই 'আই.পি.টি.এ.' ছেড়ে চলে এলেন।

শম্ভুদা বললেন: 'এসো, দেখা যাক কী করা যায়'। রোজই যাই—গল্পই হয়, থিয়েটার আর হয় না। তবে অন্য কোনো গল্প নয়, থিয়েটার নিয়েই গল্প হতো। আস্তে আস্তে লোক জড়ো হতে শুরু করলো। বিজনদা এলেন, বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) এলেন, জর্জদাও এলেন। জর্জদা তখনও আই.পি.টি.এ.-র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। অনেক চিন্তার পর ঠিক হ'লো 'নবান্ন'-ই করবো। কাজটা তো আরম্ভ হোক। তখনও 'বহুরূপী' নামকরণ হয়নি।

শম্ভুদা, বিজনদা, গঙ্গাদা আগে যে চরিত্র করেছিলেন সেগুলোতেই নামলেন, আমি দু'টো চরিত্রে করলাম। মহর্ষি আগে করেন নি—এখানে করলেন। কলিম করলেন, আর করলেন মহঃ ইস্রায়েল। মহঃ ইস্রায়েল ছিলেন মূলত রাজনৈতিক

জগতেব মানুষ। ইউনিয়ন করতেন। অসম্ভব বুদ্ধিমান। ইউনিয়ন কবতে গিয়েই চাকরি যায়। '৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি যখন ব্যান হয়ে গেল তখন থেকেই তাঁকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হতো। এছাড়া ঋত্বিককে নিয়ে এলেন বিজনদা, মহর্ষি নিয়ে এলেন কালী সবকারকে। 'নবান্ন' অভিনীত হ'লো ১৯৪৮-এর ১৩, ১৪, ১৬ সেপ্টেম্বর।

এর এক সপ্তাহ পর তুলসীবাবু তাঁর একটা নাটক নিয়ে এলেন পডতে—'পথিক'। এব আগে বিজনদা দু-একটা নাটক নিয়ে এসেছিলেন, আমাদের পছন্দ হয়নি। এর পর উনি চলে যান। আসলে নিজের নাটক না হ'লে বিজনদা খুব একটা উৎসাহ দেখাতেন না। যাই হোক, তুলসীবাবু নাটক শোনালেন—আমাদের ভালো লাগলো না। উনি ক্ষুব্ধ হলেন, চলে গেলেন। এর পর চেষ্টা করেছিলেন পেশাদারি মঞ্চে করাতে; অহীনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। আমরা বুঝিনি কিন্তু অহীনবাবু পডেই বুঝেছিলেন—নাটকটা 'পেট্রিফায়েড ফরেস্ট'-এর অনুবাদ। ঘটনাটা সত্যি।

মাস দুই পরে তুলসীবাবু আবার এলেন। খানিকটা পরিবর্তন করেছেন। এবার আমাদের ভালো লাগলো। তাও ডাকাতি, খুন-জখম, একটা হিন্দী-ফিল্মি গন্ধ রয়েই গেল। কথাটা বললাম। আবার রাগ ক'রে চলে গেলেন। আমরা তখন এমনিই রিহার্সাল দিয়ে যাচ্ছি; অর্থাৎ নিজেদের তৈরি ক'রে চলেছি। চলাফেরা, বসা, কথাবলা, আবৃত্তি—এই সব নিয়ে অনবরত নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে চলেছি। আর আবৃত্তি করছি। কখনো একক, কখনো দ্বৈতভাবে, কখনো সমবেতভাবে। প্রধানত আমি, বৌদি (তৃপ্তি মিত্র), শম্ভুদা, খুকু, রীণা, রমা। তখন বৌদি বিশেষ আবৃত্তি করতেন না, সুতরাং তাঁর উপস্থিতি থাকত খুবই কম।

মাস খানেক পরে তুলসীবাবু নতুন ক'রে লিখে নিয়ে এলেন 'পথিক'। অপূর্ব হ'লো। দুই অঙ্কের নাটক তিন অঙ্কে লিখলেন। আমরা যা বলেছিলাম তার সবটা নেননি। কিন্তু উনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান মানুষ, প্রচন্ড লেখাপডা জানা লোক; গ্রাম-জীবন তাঁর জানা ছিল—ডাইয়ালেকট লিখতেন খুব ভালো। সুতরাং যে-নাটকটা লিখে নিয়ে এলেন, আমাদের আলোচনার ভিত্তিতেই নিয়ে এলেন এবং যেটা আনলেন সেটা নাটক হিসাবে খুব উঁচুদরের নাটক হ'লো। আমাদের ভালো লাগলো এবং রিহার্সাল শুরু হ'লো। রিহার্সাল চলাকালীন ইস্রায়েল নিয়ে এলো সবিতাব্রতকে; কিছুদিন পরে কুমার রায়কে নিয়ে এলো ঋত্বিক। সেটা ছিল '৪৯-এর মাঝামাঝি; সেপ্টেম্বরে 'পথিক' নামলো।

এবার '৪০ থেকে '৪৫/'৪৬-এর থিয়েটারের অবস্থাটা পর্যালোচনা করা

দরকার। 'নবান্ন' হয়েছিল '৪৪ সালে। এই সময় সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা অনেকেরই আছে—ভুল না ব'লে বিচিত্র ধারণা বলা ভাল—যা ভুল ও ঠিক মিলিয়ে একটা কিছু। এই প্রজন্ম এবং তার আগের মানুষদের অধিকাংশরই একটা ধারণা—তখনকার থিয়েটার অর্থাৎ পেশাদারি মঞ্চগুলো (তখন পেশাদারি মঞ্চ ছাড়া অন্য মঞ্চ ছিল না) ক্রমশ জনসংযোগ হারাচ্ছিল। থিয়েটারে লোকেদের যাওয়া-আসা কমে গিয়েছিল অর্থাৎ থিয়েটার তার আকর্ষণ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। মৃতপ্রায় থিয়েটারকে 'নবান্ন' এসেই পুনর্জীবন দান করলো। আসলে ঘটনাটা ঠিক তা নয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এর আগে যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। যুদ্ধ কী—তার প্রভাব কতটা—এগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ছিল শূন্য। তাই যুদ্ধ যখন বাধলো তাকে গুরুত্ব দিইনি; কিন্তু 'যুদ্ধ' তো 'যুদ্ধ'ই। '৪০ থেকে যুদ্ধের উত্তাপ শুরু হ'লো। '৪১-এ উত্তাপ ছড়াতে শুরু করলো। এরই মধ্যে ভারতে শুরু হ'লো '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন; এর আগেই সুভাষচন্দ্র বাইরে চলে গেলেন। এগুলো অভ্যন্তরীণ বড় ঘটনা। বিশ্বের রাজনীতিতেও বড় পরিবর্তনের সূচনা ঘটলো—জাপান যুদ্ধে যোগ দিল। হাতিবাগানে, খিদিরপুরে বোমা পড়লো। আতঙ্কিত মানুষ দলে দলে কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগলো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মনুমেন্ট—সব কালো রঙ ক'রে দেওয়া হ'লো, আলোগুলো কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'লো। কলকাতা অন্ধকারে আত্মগোপন করলো।

এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে আমরা যেতে সাহস করতাম না। সন্ধেবেলা তো বটেই, বিকেল বেলাতেও মহিলারা সঙ্গে থাকলে আরো যেতাম না। গোরা সৈন্যরা পাগলের মতো ব্যবহার করতো। জনসংখ্যা তখন কম ছিল, আরো কমে গেল। ওদিকে বার্মা থেকে রিফিউজি আসতে শুরু করলো। হাঁটা পথে হাজার হাজার লোক কলকাতায় এসে পৌঁছালো; দশ হাজার লোক যদি রওনা দেয়, কলকাতায় পৌঁছায় মাত্র চারশো জন—ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে: একটা টাল-মাটাল অবস্থা। এই সময়েই ভারতের ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটলো: '৫০-এর মন্বন্তর'। এই মন্বন্তরে (১৯৪৩) বাংলাদেশে (তখন পাকিস্তান হয়নি) যত লোক মারা গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অত লোক মারা যায় নি। সুতরাং যেখানে লাখে লাখে লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, মা ছেলেকে পেটের দায়ে বেচে দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করছে, গ্রাম ভেঙে শহরে মানুষের কান্না—'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও'; চোখের সামনে লোকে মারা যাচ্ছে— সরাবার কেউ নেই, ব্ল্যাক আউট, গোরা সৈন্যদের তাণ্ডব—এর মধ্যে থিয়েটারে লোক আসবে কোথা থেকে? তবু থিয়েটার বেঁচে ছিল, মুখ

থুবড়ে পড়েনি—এটাই ভেবে দেখার বিষয়, এটাই গর্বের কথা।

এই সময় কী কী নাটক হয়েছে তাব উল্লেখ বোধ হয় প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে সমর্থন জোগাবে। একটু ব্যতিক্রমী নাটক—'প্লাবন', মনোজ বসুর লেখা। 'দুঃখীর ইমান' হয়েছে। বাণিজ্যিক সাফল্য এসেছে বহু নাটকে, যেমন—'মাইকেল'। এই নাটকটা ক'রেই শিশিরবাবু যদি থিয়েটার থেকে অবসব নিতেন তাহলেও এই নাট্য-প্রযোজনা ও অভিনয়ের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। যতদূর মনে পড়ছে, '৪৩-এ নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল; অবশ্য '৪২-এ অহীনবাবু 'মাইকেল'ই করেছিলেন। '৪৩-এর শেষ দিকে 'বিপ্রদাস' হয়—খুব ভালো প্রযোজনা; টিকিট বিক্রির হারও ছিল ভাল। শচীন সেনগুপ্তের 'রাষ্ট্রবিপ্লব'ও ঐ সময় প্রযোজিত হয়েছিল। এগুলো স্মৃতি থেকে বলা, দু'একটা ভালো নাটকের নাম হয়তো অনুল্লিখিত থেকে গেল।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখা ভালো—তখন নাট্যজগতে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁরা সেই সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই গড়ে উঠেছিলেন; রাতারাতি মানুষ তো তাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই কাজগুলো তাঁরা ক'রে চলেছিলেন—মন্বন্তর, যুদ্ধ, ব্ল্যাকআউট, ৪২-এর আন্দোলন—এগুলোর বাধা টপকেই করেছিলেন।

'নবান্ন' বিশেষভাবে নাম করেছিল এবং তা ছিল সঙ্গত। কিন্তু 'নবান্ন'র আগে বা পরে বহু নাটকই সফল হয়নি—যা অনেকেরই জানা নেই কিংবা জানা থাকলেও অজানা কারণে উল্লেখ করেন না। যেমন—'জবানবন্দী', বিনয়বাবুর 'ল্যাবরেটরী', 'মুক্তধারা'—জমেনি। শুধু 'নবান্ন' জমেছিল—আসলে রাজনৈতিক দলের সমর্থন তার অনেকটা রশদ যুগিয়েছিল। এ নাটক গ্রামে-গঞ্জে বেশি চলেছে; পেশাদারি মঞ্চে সকলকে মাইনে দিয়ে চালানো যেত ব'লে আমার মনে হয় না। আমার বক্তব্য হ'লো: যেগুলো সফল শুধু সেগুলোর কথা বলাটাই ঠিক নয়; পাশাপাশি অসফল নাট্য-প্রযোজনাগুলোর উল্লেখ দরকার এবং তা থেকে একটা সত্যই বেরিয়ে আসে যে অতগুলো প্রযোজনার মধ্যে শুধু 'নবান্ন'ই সাফল্য পেয়েছিল—এটাও মনে রাখার মতো বিষয়।

পরবর্তী সময়ে 'ছেঁড়াতার' বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেছিল। তখন মঞ্চ বলতে ছিল কতগুলো পেশাদারি মঞ্চ এবং নিউ এম্পায়ার। ঐ অবস্থায় 'ছেঁড়াতার'-এর অত অভিনয় কল্পনা করা যায় না। এর পর 'নতুন ইহুদী'—ভালো বিক্রি হয়েছে; 'পথিক'-এর বিক্রিও ভালো—কিন্তু 'ছেঁড়াতার'-এর মতো হয়নি। বহু পরে 'রক্তকরবী', 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'তিতাস' ভালো বিক্রি হয়েছে; প্রযোজনাগত মান ছিল অসাধারণ। কিন্তু এর কোনো একটা নাটকও পেশাদারি

মঞ্চে পেশাদারি ভাবে চালানো সম্ভব ছিল না। চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কী-ভাবে হয়েছে? কয়েকটি নাটকের শততম অভিনয় হয়েছে, প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণও হয়েছে—তাহলেও পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে পার্থক্য প্রচুর। কারণ, সেখানে কলাকুশলীদেব মাইনে দিতে হতো না—সামান্য কিছু অর্থ ভাতা-হিসাবে দেওয়া হতো। কিন্তু পেশাদাবি মঞ্চেব মতো অন্যান্য খবচ করতে হতো না। ফলে বিক্রিটা দেখতে পাই; খরচের ভারটা বহন করতে হয় না ব'লেই সেটা সম্ভব হয। 'বহুরূপী' একসময় মিনার্ভাতে নিযমিত অভিনয করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু ফলপ্রসূ হয় নি। কারণটা জানা দরকার। কেষ্ট কুণ্ডুর মাধ্যমে হলটা তিন মাসের জন্য আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু যে-যে শর্ত দেওয়া হয়েছিল তাতে নতুন নাটক করার ঝুঁকি নেওযা যায় না। এ ব্যাপারে শম্ভুদারও নিজস্ব একটা মতামত ছিল। তিনি বলতেন—নাটক বিক্রি না হ'লে আর একটা নতুন নাটক করতে হবে, সেটা না হ'লে আর একটা, এরকম অনবরত একটা চাপ যদি থাকে তাহলে ভালো নাটক করা এবং প্রযোজনার মান বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও আমার জেদে কয়েক মাসের জন্য মঞ্চটা নেওয়া হয়েছিল, একটা বিক্রিও পেয়েছিলাম। পেশাদারি মঞ্চে মাঝে-মাঝেই যেমন নাটক জমে না, বিক্রির জোয়ার-ভাঁটা চলে— সদিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের ঐ বিক্রির হারটা ঠিকই ছিল।

'ছেঁড়াতার'-এর বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা সম্ভব হয়েছিল কতগুলো সুবিধার যোগফলের প্রতিক্রিয়ায়, যেমন: কাউকে মাইনে দিতে হতো না, প্রচারের খরচ ছিল খুবই কম, প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ছিল সামান্য; সর্বমোট ব্যয় তাই কখনই মাত্রাতিরিক্ত হয়নি। একটা হিসাব দিলে বিষয়টি অতি সহজে বোঝা যাবে। আমরা প্রথম দিকে আমন্ত্রিত-অভিনয় বাবদ মাত্র একশো টাকা ক'রে নিয়েছিলাম—সেটা পরে বাড়তে থাকে। কিন্তু দশ বছর পর সর্বোচ্চ টাকা যা পেয়েছিলাম তা দিয়ে কোনো একজনকেও মাইনে দেওয়া সম্ভব হতোনা—এটাই ছিল আমাদের 'ভালো বিক্রি'র একটা পরিচয়।

'নবান্ন' থেকেই আমরা সবাইকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। অভিনেতাদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম ভাগে ছিলেন মহর্ষি, কালী সরকার, বৌদি (তৃপ্তি মিত্র), শম্ভুদা, গঙ্গাদা, বিজনদা। আমি ছিলাম তৃতীয় ভাগে। কিন্তু টাকা তো দেওয়া সম্ভব হয়-ই নি বরং আমরা চাঁদা হিসাবে যে-টাকা দিয়েছিলাম তা-ও ফেরৎ নিতে পারিনি। 'পথিক' থেকে বুঝলাম পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা একান্তই কষ্টসাধ্য এবং আজ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাটি কোন গ্রুপ-থিয়েটারের পক্ষে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি—এমনকি আমার ৪৮ বছরের থিয়েটার-জীবনে দেখা সায়কের 'দায়বদ্ধ' নাটকের ইতিহাস-সৃষ্টি

করা বিক্রয়লব্ধতায়ও সে চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবে ব'লে, আমার মনে হয় না। কারণ, নিয়মিত থিয়েটার ভাড়া দিয়ে, চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের মাইনে দিয়ে 'দায়বদ্ধ' দলকে টানতে পারত কিনা, সন্দেহ আছে। ফলে, একটা নাটক চলতে না চলতেই আর একটা নাটক ধরতে হতো এবং কেউ-ই বলতে পারে না পরের নাটকটা 'দায়বদ্ধ'র মতোই বিক্রি দেবে। এতে লজ্জাব কিছুই নেই—কারণ আজ পর্যন্ত কোনো প্রযোজকই বাণিজ্যিক সাফল্যের মূল চাবি আবিষ্কারে সক্ষম হননি।

সুতরাং তখনকার সময়ে 'নবান্ন' যে বিক্রি পেয়েছে তাতে গৌরবান্বিত হবার বহু কারণ আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার—তখন টিকিট বিক্রি করার চেয়ে 'এ্যারেঞ্জ্‌ড্‌' শো'র সংখ্যা ছিল বেশি। বিশেষ ক'রে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক পরিমাণে এই সব প্রদর্শনী শো-গুলোর আয়োজন করতো; কাউকেই বিশেষ পয়সা দিতে হতো না। তবু 'নবান্ন'র কথাই বারবার উঠছে কেন? উঠছে এই কারণেই যে, ওটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। সাধারণ মঞ্চের শিশির ভাদুড়ী নেই, অহীন্দ্র চৌধুরী নেই, সতু সেনও নেই—এরকম অবস্থায় থিয়েটারের জনপ্রিয়তা কমতে না দিয়ে বাড়িয়ে চলা—ঐতিহাসিক চমকপ্রদ ব্যাপার ব'লেই উল্লেখ করা যায়।

প্রসঙ্গত 'নবান্ন'র অভিনয় সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা দরকার। আগের 'নবান্ন'-প্রযোজনাতে শম্ভুদা, গঙ্গাদা আর চারুপ্রকাশবাবু করেছিলেন, কিন্তু আর কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা মনে করতে পারছি না—যাঁরা অভিজ্ঞতায় এবং অভিনয়-দক্ষতায় খ্যাতিমান ছিলেন। অভিনয়টা একটা 'শিল্প'। এর জন্য দীর্ঘ সময়ের সাধনা, শিক্ষা ও প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনো কিছু না শিখেই অসাধারণ অভিনয় করা যায় তাহলে বুঝতে হবে অভিনয় ব্যাপারটা 'শিল্প'ই নয়। অথচ 'নবান্ন'-প্রযোজনাতে তাই হয়েছিল—বিপরীত তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছিল। এটা সম্ভব হ'লো কী ক'রে? সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র শম্ভুদার অসাধারণ পরিচালন-ক্ষমতা, অভিনয়-সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যায় পারঙ্গমতার সংমিশ্রণে। ফলে, বহু না-জানা জিনিস, না-বোঝা ব্যাপার কিংবা নিজেদের ত্রুটিগুলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সবকিছু গুণ-হিসাবেই প্রকাশ পেল। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম—একজন কখনোই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে ভিখারি বা গরীবের ছেঁড়া জামা-কাপড় পরিয়ে স্টেজে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো—দর্শক তাঁর এঁকে-বেঁকে দাঁড়ানো চেহারা দেখেই বলে উঠলো—'বাঃ। দারুণ মানিয়েছে, কী অ্যাকটিং'! কারো গলা ভাঙা। যেই চিৎকার করলো গলা-ফাটা আওয়াজ হতেই সকলে ব'লে উঠলো—'চমৎকার! একদম চাষার মতো গলা'! বুঝলো না ওটাই ওর আসল গলা। এই সব

ত্রুটিগুলো যথাযথ ভাবে প্রয়োগ-সার্থক ক'রে তুললেন শম্ভুদা। তারপর বিভিন্ন ডায়লেক্ট-ব্যবহৃত নাটক দু'একটির বেশি আগে হয়নি; এখন এর ব্যবহারে বৈচিত্র্য এলো, নাটকের আকর্ষণও বাড়লো। বিজনদার 'জান্তব অভিনয়' নাটককে জীবন্ত ক'রে তুললো; অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায়, যদিও নাটক হিসাবে 'নবান্ন' ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এখন পড়তে গেলে ত্রুটিগুলো চোখে পড়বেই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় 'নিরঞ্জন' চরিত্রটি। সে যখন চাল-ব্যবসায়ীব কাছে আসে তখন চাল-ব্যবসায়ী তাকে চিনতে পারে না—কেন? সে তো নিজের গ্রামের লোক। প্রযোজনার সময় একটা গামছা দিয়ে মুখটা আড়াল ক'রে দেওয়া হতো। এইভাবে প্রযোজনার জোরে অনেক ত্রুটি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এবং তাতেই প্রযোজনার গুণগত মান পৌঁছেছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

অন্যদিকে পেশাদারি-মঞ্চকে দারিদ্র্য গ্রাস করেছিল। নতুন আলোর ব্যবস্থা নেই, নতুন সেট তৈরি হয় না, সব কিছুই অতীতের স্মৃতি-নির্ভর এক অপসৃত ছায়া মাত্র। তারই পাশাপাশি নব-নাট্য প্রচেষ্টায় সংযুক্ত হ'লো নতুন ধরনের আলো, সেট, অভিনয়—যার বাস্তবানুগ প্রয়োগ : নুষের ভাল লাগলো। মানুষ আকৃষ্ট হ'লো। কিন্তু সব প্রযোজনাই 'নবান্ন', '.ড়াতার' কিংবা 'রক্তকরবী' হয়ে উঠলা না।

এরই ফাঁকে বন্যার জল ঢুকলো। সহজে সাফল্য পেতে এমন সব নাটক লেখা শুরু হ'লো যার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। নাটক ও নাট্যকারের নাম উল্লেখ না-ক'রে শুধু তখনকার নাটকগুলোর বক্তব্যের দিকে যদি নজর দেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে সেসব নাটক এমন রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখা হয়েছে যেখানে জমির মালিকরা অত্যন্ত খারাপ, ক্ষেতমজুররা সব সময় লড়াইয়ে জিতে যাচ্ছে; কিন্তু বাস্তবে কী তাই হয়েছিল? তা হয়নি। ফলে, মঞ্চের জীবন ও বাস্তব জীবনে একটা বিরাট ফাঁক থেকেই গেল, আর সেই জন্যই নাটকের মৃত্যু ঘটলো। রাজনৈতিক মতবাদের মদতদাতা হিসাবে কাজ করত করতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে—তাঁরাই হলেন নাট্য-ভাবনা, নাট্য-চিন্তার শেষ-কথা বলার অধিকারী। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমী নাটক নিশ্চয়ই হয়েছিল, যেমন—সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী'। সলিল সেন আমার থেকে দু-তিন বছরের বড়; কিন্তু ঐ অল্প বয়সেই কী অসাধারণ নাটকটা লিখেছিল! ওটাও রাজনৈতিক মতাদর্শের নাটক এবং 'ক্রান্তি-শিল্পী-সংঘ'র (আর.এস.পি.) সমর্থনপুষ্ট, তবুও অপূর্ব প্রযোজনা। কিন্তু এরপর দু-একটা ছাড়া আর অসাধারণ কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না।

ওঁরা পেশাদারি-মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র থেকে কয়েকজন অভিনেতাকে ওঁদের নাটকে যুক্ত করলেন; বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল বিক্রিবাটা কিছুটা বৃদ্ধি করা। দলের লোকদেরও টাকা দেওয়ার চেষ্টা হ'লো। কিন্তু ফল ভালো হ'লো না। বিভিন্ন অভিনেতাদেব মধ্যে সম্ভবত মর্যাদার লড়াই শুরু হ'লো। দলটাই বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য এর সঙ্গে অন্য সমস্যাও নিশ্চয়ই জড়িত ছিল।

এ প্রসঙ্গে বাংলা থিয়েটারেব আগের দু'টি পর্ব (অবশ্যই পেশাদারি মঞ্চ-কেন্দ্রিক) সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা দবকার—না হ'লে আমরা যে পর্বে অবস্থান করছি সে সম্পর্কে সামগ্রিক কোনো ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

সময়টা ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর। এক সঙ্গে এক ঝাঁক তরুণ থিয়েটারে আত্মনিবেদন করলেন। সব চেয়ে ব ় হলেন গিরিশচন্দ্র—২৮ বছর। সব চেয়ে ছোট বোধ হয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—যাঁকে সকলে বেলবাবু বলতেন—তাঁর বয়স ২০। আর সকলে—অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বোসদের বয়স ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে। এঁরা কী দিলেন? দেশে যা ছিল না—'থিয়েটার'—সেটাই ক'রে দিলেন। বড়লোক বাড়ির আঙিনা থেকে আম-জনতার উঠানে পৌঁছে দিলেন নাটককে। এতে নাটক যেমন দর্শক পেলো, দর্শকের জন্যও নাটক লেখা শুরু হ'লো। প্রথম প্রথম চললো উপন্যাসের নাট্যরূপ, পরে সোজাসুজি নাটক লেখা। গিরিশ তো নাট্যকার ছিলেন না, প্রয়োজনের চাপে নাট্যকার হলেন। এরকম বহু নাট্যকারই থিয়েটারের প্রবহমানতা রক্ষার্থে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ সুযোগ জুটতো না কিংবা প্রয়োজনই হতো না, যদি-না এই সব তরুণ নাট্য-যোদ্ধারা কোনো এক মহৎ লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় অর্থবান-মানুষদের কারাগার থেকে নাটককে মুক্ত করার জন্য সংগ্রামে ব্রতী না হতেন। ক্রমে ক্রমে বহু নাট্যকারের আবির্ভাবে নাট্যজগৎ সমৃদ্ধি লাভ করলো।

আর একটি ঘটনা ঘটলো। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, স্যার গুরুদাস এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মতো প্রতিভাধর মানুষ, যুগ-প্রতিনিধিরা 'থিয়েটার' দর্শনে এলেন। এতে লোকসমাজে থিয়েটারের 'অচ্ছুৎ' নাম ঘুচলো, 'থিয়েটার' একটা বড় মর্যাদার আসন পেল। এটা প্রথম-পর্বের অর্জিত মূল্যবান সম্পদ।

প্রসঙ্গত সে যুগের রাজনৈতিক অবস্থাটা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিবাদী নাটক করতে গিয়ে আমাদের নাট্যকর্মীরা যেমন একসময় নির্যাতিত হয়েছেন, সে যুগের নাট্যকর্মীরাও কম নির্যাতিত হননি। বরং বেশি মাত্রাতেই

হয়েছেন। ১৮৭২-এ থিয়েটার শুরু হ'লো, ১৮৭৬-এ তৈরি হ'লো 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল'। ওটা নিশ্চয়ই মজা করবার জন্য করেনি, রাজশক্তি ভয় পেয়ে বা রেগে গিয়েই তা করেছিল। কিন্তু এইসব তরুণ নাট্যকর্মীরা সে বাধাকে তুচ্ছ ক'রেই তো নাটক ক'রে গেছেন; শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে—যখন সরকার বাহাদুর যে-নাটক করতে বারণ ক'রে দিলেন নাট্যপ্রেমী তরুণের দল তখন নাম বদলে দিয়ে সেই নাটকটাই করতে লাগলেন। এই ভাবে যখন কিছুতেই আটকাতে পারলেন না, তখন হুকুম হ'লো: 'স্ক্রিপ্ট' জমা দাও। অভিনয়ের আগেই অ্যাপ্রুভাল দরকার। 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী হ'লো। এরই বিরোধিতায় নাটক করতে গিয়ে অমৃতলাল এবং অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

মাইকেল প্রভৃতির উৎসাহে ১৮৭৪ সালেই মহিলা শিল্পীরা স্টেজে যোগদান করলেন। নাট্য-বিপ্লবের কাজ শুরু হ'লো। এই বিপ্লব হ'লো ব'লেই বিনোদিনী, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি—এঁদের আমরা পেলাম। এঁদের অভিনয় আমি দেখিনি, কারণ এঁরা অভিনয়-জগৎ থেকে অবসর নেওয়ার পরই আমার জন্ম। তবে নানা নথিপত্র এবং লোকমুখে শোনা নানা অভিব্যক্তি থেকে একটা অনুমিত সিদ্ধান্তে আসা যায়, তা হ'লো এঁরা অভিনেত্রী হিসাবে ছিলেন খুবই উঁচুমাপের। বিনোদিনী মাত্র ২৫ বছর বয়সেই অভিনয় থেকে অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেই তৈরি ক'রে গিয়েছিলেন একটা ইতিহাস। কুসুমকুমারী, তিনকড়ি—এঁরাও ছিলেন বড় অভিনেত্রী।

এঁরা সকলে মিলে নাট্য-জগৎকে কী দিলেন? আমরা নাট্য-জগৎকে যা যা দেবার চেষ্টা করছি, ওঁরাও তাই দিয়েছিলেন, বরং খানিকটা হয়তো বেশিই দিয়েছিলেন। দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধক নাটক করেছেন; অবশ্য কী গিরিশ-যুগে, কী গিরিশ-পরবর্তী যুগে দেশাত্মবোধ বোঝাতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা নাট্যকাররা নাট্য-উপজীব্য করেছিলেন সেগুলি ইতিহাসগত তথ্যে ভুল ও চরিত্র-চিত্রণে কল্পনামুখী, যদিও এই ত্রুটি নিয়েও নাটক জমাতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয়নি। সাহসিকতাই তাঁদের মানসিক দৃঢ়তার খোরাক দিয়েছে। আবার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রভৃতি নাটক তাঁরা করেছিলেন। সমাজ-নিরপেক্ষ দায়িত্ববোধের শিকার তাঁরা হন নি।

আরো একটা অবদান আমরা গ্রহণ করলাম। তা হ'লো তাঁদের প্রবর্তিত অভিনয়-ধারা। আজকে একশো বছর পরেও অভিনয়ের তুলনা আসলেই গিরিশ-অর্ধেন্দুর কথা এসে পড়বেই। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, কারণ এত

বছর পর আমাদের কাছে এমন কোনো তথ্য নেই যা তাঁদের অভিনয়-ধারাকে বুঝতে সহায়তা করে। রেকর্ডের কথা না তোলাই ভাল। রবীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমারের রেকর্ডে ধরা কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যাবে না যে তাঁরা কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন। আমি শিশিরকুমারের দশ-বারোটা নাটক অন্তত দু'তিনবার ক'রে দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতাব প্রত্যয়বোধ থেকে এটুকু বলতে পারি—তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর যে-কোনো বড় অভিনেতার তুলনা কখনোই অসঙ্গত হবে না; কিন্তু রেকর্ডিং-এ তা প্রমাণিত হয় না। তা হ'লে প্রশ্ন হ'লো—গিরিশ-অর্ধেন্দু-প্রদর্শিত অভিনয়-ধারা 'মিথ' হয়ে উঠলো কী ক'রে?

আসলে অভিনয়ের একটা উন্নত-মান তাঁরা তৈরি করতে পেরেছিলেন, যার প্রভাব তাঁদের উত্তরসূরিদের অভিনয়-ধারার মধ্যে প্রবহমান ছিল। দানীবাবু-অমর দত্ত-অপরেশবাবুরা 'যুগ-প্রভাবে' তৈরি হয়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে তাঁরা তৈরি হয়েছিলেন এবং তা নিশ্চিতভাবেই পূর্বসূরিদের অগ্রাহ্য ক'রে নয়।

১৯০৮-এ অর্ধেন্দু, ১৯১২-তে গিরিশ, ১৯১৬-তে অমরেন্দ্রনাথ, ১৯১৭-তে তিনকড়ি চ'লে গেলেন। বাংলা নাট্যযুগের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'লো। বড় বড় প্রতিভাধরের অনুপস্থিতিতে নাট্যজগতে শূন্যতা নেমে এলো, কিন্তু থেমে গেল না। কারণ মোমেন্টামগত কারণে আরো কিছুকাল গড়াতে থাকলো।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠতে লাগলো আর একদল প্রতিভাময় অভিনেতা-অভিনেত্রী। শিশিরকুমার, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী (যদিও বয়সে এঁদের থেকে বড়), অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখার্জী, রাধিকারঞ্জন, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলি প্রভৃতি আরো অনেক ব্যক্তি মিলিত হয়েছিলেন আলাদা আলাদা ভাবেই। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ছিলেন অবশ্যই শিশিরকুমার। তিনি তখনই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনয় ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আবার একটা নাট্য-আবহাওয়া তৈরি হ'লো। প্রকৃত পড়াশুনা জানা, ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষরা নাট্যমঞ্চে যোগদান করলেন। শিশিরবাবু ছাড়াও, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছিলেন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন পণ্ডিত বাড়ির ছেলে এবং নিজেও ছিলেন অত্যন্ত কৃতী ছাত্র।

মৃত্যুমুখী নাট্য-প্রযোজনাগুলো দর্শক চিত্তে কোনো আবেদন রাখতে পারছিল না। নাটকও নতুন ক'রে লেখা হচ্ছিল না; ডি.এল. রায় চলে গেছেন যদিও তাঁর নাটক তখনও সচল; ক্ষীরোদপ্রসাদ তখনও জীবিত; তবু নাট্য-আকাল

শুরু হয়েছিল। যেগুলো লেখা হচ্ছিল সেগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের।

শিশিরবাবু পুরানো নাটক 'আলমগীর' নিয়েই কাজ শুরু করলেন। শিশিরবাবু এবং আরো একজন ছাড়া পুরানো অভিনেতারাই অভিনয় করলেন। অভিনয় এবং প্রযোজনার গুণগত মান চমক সৃষ্টি করল। তারপর ডি.এল. রায়ের 'সীতা' নাটক ইডেন গার্ডেন্স-এ চার রাত অভিনীত হ'লো। সেই সঙ্গে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার অভিষিক্ত হলেন। এই নাটক নিয়ে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে কাজ শুরু করতে গেলে মঞ্চাভিনয়ের অধিকার নিয়ে গোলমাল দেখা দেয়। নির্মলবাবু আগেই নাট্য-স্বত্ব অধিকার করেছিলেন। ফলে, শিশিরকুমার যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে নতুন ক'রে 'সীতা' লিখিয়ে নেন। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে ৬ আগস্ট এই নাটকটি অভিনীত হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত।

ওদিকে ১৯২৩ সালে আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হ'লো অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কর্ণার্জুন'। এইখানে সম্মিলিত হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ইন্দু মুখার্জী এবং পরে একটি ছোট ভূমিকায় নেমেছিলেন দুর্গাদাস এবং স্বয়ং অপরেশচন্দ্র।

দু'টো নাটকই সার্থকভাবে প্রযোজিত হ'লো। দু'টো নাটক কিন্তু দু'টো কারণে সার্থক হলো: 'কর্ণার্জুন' পুরানো থিয়েটারের আবরণে নতুন অভিনেতাদের দলগত নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ; আর 'সীতা' শিশিরকুমারের নতুন প্রয়োগ-রীতি ও নব অভিনয়-রীতি প্রদর্শনে সমুজ্জ্বল। প্রসঙ্গত, 'সীতা' আমি একাধিকবার দেখেছি। কিন্তু যখন দেখেছি তখন তার গুণগত মান অনেকটাই পড়ে গেছে—শক্তিমান একমাত্র শিশিরকুমার; কিন্তু তাঁর সমকক্ষ না হোক, উচ্চমানের অভিনেতা তো থাকবেন—তখন তা-ও কেউ ছিলেন না।

নতুন প্রয়োগ-রীতি, নব অভিনয়-ধারা, যৌবনদীপ্ত মুভমেন্ট, নতুন পোশাক, সেট, লাইট—সব মিলিয়ে থিয়েটারকে জমিয়ে দিলো। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় একের পর এক অভিনীত হয়ে চললো: 'দিগ্বিজয়ী' (যোগেশ চৌধুরী), 'পাষাণী', 'সাজাহান' (ডি.এল. রায়), 'নরনারায়ণ', 'ভীষ্ম', 'রঘুবীর', 'প্রতাপাদিত্য' (ক্ষীরোদপ্রসাদ), 'রমা', 'ষোড়শী' (শরৎচন্দ্র), 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'বিল্বমঙ্গল', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (গিরিশচন্দ্র), 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' (রবীন্দ্রনাথ)। ১৯৩০-এ শিশিরকুমার আমেরিকায় যাত্রা করলেন।

আমেরিকায় শিশিরকুমারের যে বদনামটা হয়েছিল সেটা অভিনয় কিংবা প্রযোজনার ত্রুটিতে নয়; বাস্তববুদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে। অগাধ আস্থা ছিল নিজের ওপর—সঙ্গত কারণেই ছিল, আর সেই জন্যই লোকে তাঁকে দাম্ভিক মনে করতো যা অযৌক্তিক ছিল না; কিন্তু তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি

ছিল না, আর ছিল না সাংগঠনিক দূরদৃষ্টি। সেই দূরদৃষ্টি যদি থাকতো তাহলে তিনি অন্যান্য বড় অভিনেতাদের নিয়ে যেতেন এবং টাকার ব্যবস্থাও ক'রে যেতেন। মূল গণ্ডগোলটা ক'রে ফেলেছিলেন এবিক এলিয়েট—যিনি শিশিরবাবুকে ওদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য বয়স তখন তাঁর খুবই অল্প। প্রায় কুড়ি বছর পরে তিনি এদেশে আবার এসেছিলেন। আমাদের 'উলুখাগড়া'র অভিনয় দেখে শম্ভুদার খুবই প্রশংসা করেছিলেন।

ওদিকে অহীনবাবুও ক'রে চলেছেন 'ইরাণেব রাণী', 'চিরকুমার-সভা', 'শোধবোধ'; পৌরাণিক নাটক 'শ্রীরামচন্দ্র', 'চাঁদ সদাগর'; ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মিশরকুমাবী', 'রিজিয়া', 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতি।

নতুন নাট্যকাররাও এলেন। তাঁদের মধ্যে মন্মথ বায় ও শচীন সেনগুপ্ত প্রধান। যতদূর মনে হয় ১৯২৮/২৯-এ মন্মথ রায়ের 'কারাগার' হয়। পুলিশ নাটকটা ব্যান করে দেয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে শিল্পীরা কখনোই অস্বীকার করেননি এবং সেই চেতনাকে যে নাট্য-প্রয়োগে সক্রিয় রেখেছিলেন—এ তারই প্রমাণ।

শিশিরকুমারের বুদ্ধি, তাঁর ইচ্ছে, তাঁর চাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হ'লো কারিগরি-দক্ষতা। এ ব্যাপারে নতুন যুগের সৃষ্টি করলেন শ্রী সতু সেন। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াবিং পাশ ক'রে আমেরিকাতে ছিলেন এবং সেখানে নাটক পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে ওখানেই তাঁর আলাপ। শিশিরকুমারদের বৈদেশিক-দুর্দশায় তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরই সহযোগিতায় শিশিরকুমারেরা ভারতে ফিরে আসেন। এর অল্প দিন পরেই সতু সেন কলকাতায় এসে থিয়েটারে যুক্ত হন। ১৯৩১-এ নাট্যনিকেতনে শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' নাটকে মনস্তাত্ত্বিক আলোক প্রক্ষেপণে একটা নতুন ধারার সূচনা করলেন। ১৯৩৩ সালে অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে যোগেশ চৌধুরীর 'মহানিশা' নাটক নিয়ে রঙমহলে রিভলবিং স্টেজের ব্যবহার শুরু হ'লো—যার রূপকার এই সতু সেন-ই। এখন নানা কারণেই আমরা এই স্টেজ ব্যবহার করি না। আলোর এই যথাযথ প্রয়োগ, কারিগরি দক্ষতার নানান প্রকাশ—এ যুগেরই বড় প্রাপ্তি। যেমন, 'ফুট লাইট' চালু হ'লো। এই লাইটের ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা—দুই-ই আছে। সুবিধাটা হচ্ছে নিচ থেকে সামনে আলো আসে, ফলে চোখের তলায় বা নাকের তলায় ছায়া পড়ে না। কার্বন-আর্ক ছিল স্পট-লাইট। কার্বন-আর্ক-এর একটা অসুবিধা ছিল, ওটায় ডিমার ব্যবহার করা যেতো না এবং আওয়াজ হ'তো। শিশিরবাবু সতু সেনকে দিয়ে বাল্ব-স্পট-এর বহুল ব্যবহার শুরু করলেন। আগেও ব্যবহার

হতো, তবে খুব কম। কার্বন-আর্কের স্ট্রেংথ্ অনেক বেশি। ডিমার যেদিন থেকে চালু হ'লো সেদিন সব ব্যাপারটাই বদলে গেলো। ওয়াটার ডিমার দিয়েই কাজটা শুরু হ'লো। ওগুলো চলতো কলসীতে কিংবা ব্যাটারির যে বাক্সগুলো থাকে তাতে জল দিয়ে। এগুলো সতু সেনের প্রয়োগ-নৈপুণ্যেই চালু হয়। আজ ওয়াটার ডিমার কেউ ব্যবহার করেন না। ওর কেসগুলো বোধহয় রঙমহলে এখনো খুঁজলে পাওয়া যাবে!

এবার শুরু হ'লো ত্রি-মাত্রিক স্টেজের ব্যবহার। অবশ্যই দ্বি-মাত্রিক স্টেজ বন্ধ হ'লো না। বরং বিক্রি-বাটা যতো কমতে শুরু করলো ততই আঁকা-সীনের ওপরই নির্ভরতা বেড়ে গেলো। অহীনবাবু খুব খেটে-খুটে সেট, লাইট, ড্রেসের পরিকল্পনা করতেন। একটা পরিপূর্ণ কাঠামো রেখে রিহার্সাল শুরু করতেন। শিশিরবাবু তা করতেন না। রিহার্সাল চলাকালীন সেট-লাইটের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির কাজ ক'রে যেতেন। কিন্তু সাজ-সজ্জা, আলো, সেটের ব্যাপারে অহীনবাবুর নজরটা ছিল একটু বেশি।

এ-যুগের রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনা একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। এর আগেও হয়েছে, কিন্তু তা উল্লেখের দাবি রাখে মাত্র। বিশেষ কিছু হয়ে ওঠেনি। শিশিরবাবু-অহীনবাবুদের সময় রবীন্দ্র-নাটক যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মঞ্চস্থ করার প্রয়াস লক্ষ করা গেলো। শিশিরকুমার 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' করেছেন, আরো পরে করেছেন 'যোগাযোগ'। অহীন্দ্র চৌধুরী 'চিরকুমার-সভা', 'গৃহপ্রবেশ', 'শোধবোধ' ক'রে রবীন্দ্র-নাটককে একটা উচ্চ-প্রযোজনার মানে নিয়ে যেতে সফল হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে ১৮ জুলাই 'চিরকুমার সভা' প্রথম অভিনীত হয়, ২৫ তারিখে কবি অভিনয় দেখতে আসেন। নাটকের অভিনয়গত নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে কবি অল্পদিনের মধ্যে আবার এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

অহীনবাবু, নির্মলেন্দুবাবু অভিনেতা ছিলেন, পরিচালকও ছিলেন; কিন্তু প্রোডিউসার ছিলেন না, অর্থাৎ টাকার দায়িত্ব এঁদের ওপর ছিল না। কিন্তু সে দায়িত্ব শিশিরবাবুর ছিল। ক্ষতি হ'লে শিশিরবাবুর, লাভ হ'লেও শিশিরবাবুর; টাকা যোগাড়ের ভার তাঁর। ফলে সর্বদাই ঋণবদ্ধ থাকতেন, চিন্তিত থাকতেন এবং রেগে যেতেন। মাঝে-মাঝেই অভিযোগ করতেন—'পয়সার অপচয় হচ্ছে'। তাঁর বাণিজ্যিক বোধের অভাবে বহু লোক সুযোগ বুঝে টাকা আত্মসাৎ করেছেন, আবার নিজেও দু'হাতে পয়সা খরচ করেছেন। ফলে আর্থিক সংকটও ছিল তাঁর চিরসঙ্গী।

এই রকম দু'একজনের জন্যই থিয়েটার একটা সম্মানের আসন পেয়েছে। প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত জীবনের অবস্থান ছেড়ে, অনিশ্চিত জীবনের পথে

পা বাড়ানো, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা—আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ ছাড়া কীই-বা বলার আছে। গিরিশ তখনকার দিনে ১৫০ টাকার চাকরি ছেড়ে থিয়েটারে আসেন, শিশিরকুমার অধ্যাপনা ছেড়ে থিয়েটারে আসেন। থিয়েটার ছেড়ে চাকরিতে গেছেন অনেকেই, কিন্তু চাকরি ছেড়ে থিয়েটারে যোগদান নজির-বিহীন ঘটনা। অথচ সংসারের চাপ ছিল প্রচুর। শিশিরকুমারকে যখন 'পদ্মভূষণ' দেওয়ার কথা হ'লো তখন তিনি বললেন: 'আমি পদ্মভূষণ চাই না—আমি থিয়েটার চাই—শুধু থিয়েটার।'

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হবার আগে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় শিশিরকুমারকে ডেকেছিলেন নাট্য-বিভাগের দায়িত্বভার নেবার কথা বলতে। শচীন সেনগুপ্তও ওই মিটিং-এ ছিলেন। ওঁর মুখ থেকেই শোনা—শিশিরবাবু বলেছিলেন: কেবল থিয়েটারের ভারটা ওঁকে দেওয়া হোক, হিসাব-টিসাব তিনি রাখতে পারবেন না। বিধান রায় বললেন: 'তাতো হয় না শিশির, আমাকেও হিসাব দিতে হয়, তুমি জানো।' শিশিরবাবুর উত্তর: 'সে নয় অন্য লোক রাখবে, কিন্তু তারাও হয়তো খবরদারি করবে—এখানে অত খরচ করার দরকার নেই, ওখানে অত খরচের দরকার নেই...এইসব কথা বলবে। ও আমি পারবো না।' ডাঃ রায় বললেন: 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে তোমায় জানাবো।'

চেয়ারের লোভ, অর্থের লোভ যাঁর আছে তিনি শিশিরবাবুর মতো বিধান রায়কে অগ্রাহ্য ক'রে চলে যেতে পারতেন না। ওঁর কাছে ঐগুলো কোনো সম্মানই বহন করতো না। ওঁর কাছে কাজ করার স্বাধীনতাটুকুই ছিল প্রধান সম্মানের। শম্ভুদা একটা লেখায় শিশিরবাবুর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন; শিশিরবাবু বলেছিলেন: 'কষ্ট আর কতদিন, যে ক'দিন বাঁচবো—সে ক'দিনইতো। তারপর মারা গেলে, আমারই স্ট্যাচু বানিয়ে তাতে মালা দিতে হবে তোমাদের।' দম্ভের কথা, কিন্তু অতি সত্য কথা। গিরিশচন্দ্র ছাড়া থিয়েটারে এত বড় প্রতিভা নিয়ে আর কেউ-ই আসেন নি।

৪০-এর দশক থেকেই নানা বিপর্যয় শুরু হ'লো। আসলে শুরু হয়েছিলো '৩৯ থেকেই; ৪০-এ তার প্রত্যক্ষ চিত্র ফুটে উঠতে লাগলো। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ডামাডোলে থিয়েটার আবার হোঁচট খেল। এই অবস্থার মধ্যেই নাট্য-ধারার তৃতীয় পর্বের শুরু।

'নবনাট্য', 'গণনাট্য', 'সৎনাট্য'—এই সংজ্ঞাগুলোর বিরোধে যেতে চাইছি না, আবার 'গ্রুপ-থিয়েটার' কথাটাও আমার কাছে অর্থহীন। উৎপল দত্ত এক জায়গায় বলেছিলেন যে 'গ্রুপ-থিয়েটার' ব্যাপারটা আমাদের দেশের নয়। আমেরিকায় 'স্টার সিস্টেমে'র বিরুদ্ধে কিছু ছেলে ও মেয়ে প্রতিবাদ

করেছিল; এই প্রতিবাদ-স্বরূপ তৈরি হয়েছিল 'গ্রুপ-থিয়েটার'। এ-ছাড়া তারা অন্য কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। উৎপলবাবুর কথাটা সঠিক; কিন্তু তাঁর বক্তব্য—এদেশে 'স্টার'-নির্ভর থিয়েটাব নেই—এটা সঠিক নয়। আমাদের দেশে পেশাদারি মঞ্চ 'স্টার'-নির্ভর ছিল—এখনো আছে। অপেশাদার নাট্যসমাজ, পাড়ার ক্লাব নামে যা পরিচিত ছিল, তা-ই চেহারা পরিবর্তন ক'রে সংঘবদ্ধ হ'লো—এবং তাকেই 'গ্রুপ-থিয়েটার' আখ্যায় নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

আজও পেশাদারি-মঞ্চ চালাতে গেলে সৌমিত্র, অপর্ণা, অনুপকুমার, দীপংকর প্রভৃতি অভিনেতাদের নিতে হয়। এঁদের নিলে তবে থিয়েটার চলবে। 'স্টার সিস্টেম' তো আছে, আগেও ছিল। শিশিরবাবু, অহীনবাবু, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দুরা ছিলেন। কারণ, যে-ব্যবসায়ী টাকা ঢালবেন তিনি অবশ্যই দেখবেন কার নামে টিকিট বিক্রি হয়। কিন্তু 'গ্রুপ থিয়েটারে'র ক্ষেত্রে এটা হয় না। 'গ্রুপ-থিয়েটার' মূলত নির্দেশক-নির্ভর। যদিও এক-এক সময় আসে যখন এক-একজন অভিনেতার অভিনয় দেখতেই লোকে আসে। 'গ্যালিলেও'—অমুক কেমন করেছেন তা দেখতেই আসেন, সেখানে পরিচালকের ভূমিকা অন্তরালেই থেকে যায়।

কিন্তু 'গ্যালিলেও'-ই বলো, 'রক্তকরবী'-ই বলো, 'টিনের তলোয়ার' কিংবা 'দায়বদ্ধ'-ই বলো—এই সব নাটক নিয়মিত ভাবে পেশাদারি-মঞ্চ কী চালাতে পারবে— এক-একটা ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এক-আধটা নাটকের কথা তো বলা হচ্ছে না। 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' ভালো বিক্রি পেয়েছে, 'দায়বদ্ধ'-ও পাচ্ছে; হয়তো এই সমস্ত নাটক টেনে নিয়ে যেতে পারতো—'হয়তো' বলছি, পরীক্ষা তো হয়নি। খাদ্য-রসাস্বাদনের সার্থকতা তো খাদ্য-গ্রহণেই। এর মধ্যে কতগুলো পেশাদারি-মঞ্চ তো খালি পড়েছিল। যদি মনে হতো এই সমস্ত নাটক নিয়মিত চালানো সম্ভব তাহলে পরীক্ষার ঝুঁকি নিল না কেন? আসলে তা সম্ভব নয়। এই 'সম্ভব নয়' কথাটা স্বীকার ক'রে নিলেই অনেক জটিলতা কেটে যায়, বুঝতে সুবিধা হয়।

'গ্রুপ-থিয়েটার' কথাটা বড়ই অস্পষ্ট। এখানে কোনো আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেই, কাউকে মাইনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও নেই। হিসাব করলে দেখা যাবে গ্রুপের সকলকে মাইনে দিতে হ'লে প্রায় লাখ খানেক টাকা লাগবে—যা দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। আজকে মহিলা-শিল্পী ছাড়াও কাউকে কাউকে কোনো কোনো গ্রুপ টাকা দেয় বলে শুনেছি; কিন্তু কত টাকা? সংসার খরচ চলে—এমন নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, আর কোথা থেকেই বা দেবে? কিন্তু কাজ তো হচ্ছে, ভালো কাজই হচ্ছে—যেমন 'খবরে

প্রকাশ' নাটকটা আমার ভালো লেগেছে, 'শ্বেতসন্ত্রাস'-ও ভালো কাজ; কিন্তু তারা কি টাকা দিতে পারবে? বিক্রি-বাটা হচ্ছে? নিশ্চিত উত্তর—'না'। এটাই আসল চেহারা।

সত্তর-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত পেশাদারি-মঞ্চের বাইরে এই ভিন্ন-থিয়েটারগুলো দাপিয়ে বেড়িয়েছে। গর্ব করার মতো বহু কাজ হয়েছে। 'ছেঁড়াতার' হয়েছে, 'রক্তকরবী' হয়েছে, উৎপলবাবুর একাধিক ভালো নাটক হয়েছে, অজিতেশ অসাধারণ কাজ করেছেন—কিন্তু যে-টাকাটা তাঁরা পেয়েছেন তা কোনো টাকাই নয়; তা দিয়ে নিয়মিত পেশাদারি ভাবে নাটক চালানো সম্ভব নয়। পেশাদারি-মঞ্চে বড় অভিনেতারা মাসে ৭ হাজার থেকে ১৫/২০ হাজার টাকা মাইনে পান। অন্যরা ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। আরো কিছু আছেন যাঁরা ২০০-৩০০ টাকা পান। এর অর্ধেক টাকা আমরা দিতে পারবো না। পেশাদারি-মঞ্চ তাই 'স্টার'-আর্টিস্ট নিতে বাধ্য। সুতরাং 'স্টার-সিস্টেম' নেই এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যই এই আলোচনার অবতারণা।

ধরা যাক, 'গ্রুপ-থিয়েটারে'র আদর্শ নিয়ে আমরা যত কাজ করেছি সেগুলো যদি না করা হতো, পেশাদারি-মঞ্চের ধারাকেই অনুসরণ ক'রে চলতাম তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত? খুব সহজেই বলা যায় এত প্রযোজনা, এত বিভিন্ন স্বাদের নাটক, বিদেশীয় নাটক অনাস্বাদিতই থেকে যেত; বহু ছেলে-মেয়ের নাট্য-প্রীতির প্রকাশ ঘটতো না; নির্দেশনার বিচিত্র রূপও অদেখা থেকে যেত। আমি এ-কথা কখনোই বলছি না, যে কাজ হয়েছে বা হচ্ছে তা সবই অসাধারণ, সুন্দর। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই ৯০%-ই বাজে কাজ হয়েছে, তবু ১০% তো ভাল কাজ হয়েছে। সেটাই তো বড় কর্মকৃতি, বড়ো প্রাপ্তি। 'বহুরূপী'র কাজ, উৎপল দত্তের কাজ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল ব'লেই, বহু অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে এই ভিন্ন-ধারার নাটকের কাজে যুক্ত হয়েছিল। অতি সাম্প্রতিক কালে যত ছেলে-মেয়ের অভিনয় দেখি, তার অধিকাংশ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; কিন্তু কেউ কেউ তো পারে—এটাই বা কম কী? এই পরিবেশের মধ্যেই সে নিজেকে তৈরি ক'রে নেবে, তার প্রতিভাকে নিশ্চিত রূপ দেবে, সার্থক হয়ে উঠবে। এ সুযোগটা আমরা আমাদের অল্পবয়সে পাইনি।

আমি নিয়মিতভাবে কাজ শুরু করি '৪৮ সালে, কিন্তু কাজের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটেছিল '৪৭-এ। তখন সকলেই জানতাম স্বাধীনতা আসছে। স্বীকার করা ভালো, 'স্বাধীনতা' ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝতাম না। কিছু লোকের মনে হয়েছিল 'স্বাধীনতা' মানে যা খুশি করার অধিকার অর্জন; আর সেই কারণেই রাজভবনে ঢুকে চেয়ারে বসে গদিগুলো ছিঁড়েছিল!

আমরা তা করিনি। আমরা বুঝেছিলাম দেশটাকে গড়তে হবে এবং তার জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে। নাটককে সেই 'করা'র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম আর সেই জন্যই পড়তে শুরু করেছিলাম স্তানিস্লাভস্কি, গর্ডন ক্রেগ, পীসকার্টার, সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা—অবশ্যই মূলগ্রন্থ; কারণ নিজেকে তৈরি করতে হ'লে, কিছু অর্জন করতে হ'লে গ্রন্থের সহায়তা দরকার, না হ'লে চরিত্রায়ণে ফাঁকি থেকে যাবে, ইন বিটুইন লাইনস্-এর অর্থ অপ্রাপ্তই রয়ে যাবে। ফলে নাট্য-চরিত্র যেমন অস্ফুট থাকবে, তেমনি দর্শকও থাকবে অতৃপ্ত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—ধরুন কোনো এক নাটকে কৃষ্ণ এসে বলছেন—'পান্ডবদের অন্তত পাঁচটা গ্রাম দাও।' দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন পাঁচটি গ্রাম?'—'কুশস্থলি, বৃকস্থলি, মাকন্দি, বারণাবত ও আরো একটি গ্রাম—'পঞ্চম গ্রামের নাম বললেন না কেন? এক্ষেত্রে কীভাবে অভিনয় করবো? কৃষ্ণ হয়তো ব্যাপারটা গুরুত্ব দেননি; যদি গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন তবে শান্তির এই প্রস্তাব দেওয়া কেন? কিংবা শুধুই টোপ হিসাবে কথার-কথা বলতেই প্রস্তাবটার উত্থাপন। দুর্যোধন গিললে ভালো, না হ'লে জনগণকে বোঝানো যাবে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু অবুঝ দুর্যোধন তা গ্রহণ করলেন না। আবারও প্রশ্ন—তা হ'লে ঐ পাঁচটি গ্রাম কেন? কারণ হয়তো ঐ গ্রামগুলোই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জায়গা, তাড়াতাড়িতে ঐ রকম সমৃদ্ধ গ্রাম আর মনে পড়ছিল না।

—এখন এগুলো না জানলে সঠিক অভিনয় করবো কীভাবে? ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক—বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতিগত অবস্থাটা বুঝে নেওয়া দরকার। নাটকে যা লেখা আছে তা-তো করতেই হবে, কিন্তু প্রয়োগ-ভাবনাটা তো আমার নিজস্ব, অভিনয়টা তো সেইভাবেই হবে। উদাহরণ হিসাবে 'দশচক্র'র কথা বলতে পারি। যখন প্রথমবার করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল অত্যন্ত কম। দশবছর পরে যখন প্রযোজনা করা হয় তখন অন্যরকম ভাবে নাট্য-প্রয়োগ করা হয়। শম্ভুদা আমার থেকে ১৩/১৪ বছরের বড়। সেখানে আমাকে যদি ৬৫ বছর বয়সের এক বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করতে হয় তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই হবে। আমি ভেবে নিলাম—আমার দাঁত নেই এবং বাঁধানো। অনেক সময় নকল দাঁত নিয়ে তাড়াতাড়ি বা জোরে কথা বলতে গেলে, হয় কি, নকল দাঁত জোড়া একটু নেমে আসার চান্স থাকে। তখন কথা বলতে বলতে দাঁতটা সেট ক'রে নেওয়াটা একটা অভ্যাস। তাতে একজন বললেন যে আপনি ওরকম করছেন কেন? প্রশ্নটা করলেন দু'জন বড় অভিনেতার সামনে। আমি আমার ভাবনাগুলো বললাম। গঙ্গাদা বললেন—'বাঃ! তুই

তো বেশ ভালো ভেবেছিস, আমি তো এ-দিকটা একদম ভাবিনি।'

সাধারণত আমরা গোটাকতক মুদ্রা ব্যবহার ক'রে চরিত্রটাকে বোঝাবার চেষ্টা করি। তাতে আমাদের জানতে হয় কোন কোন বয়সের কী কী মুদ্রা প্রকাশ করলে চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যেমন কারো যদি আর্থারাইটিস কিংবা গাউট থাকে তাহলে জানতে হবে ওগুলো কোন কোন জায়গায় হতে পারে, অভিনেয় চরিত্রের ঠিক কোন জায়গায় থাকতে পারে—এগুলো সঠিক ভাবে জানা থাকলে চরিত্র-চিত্রণে সুবিধা হয়। প্রসঙ্গক্রমে 'রাজা অয়দিপাউস'-এর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। অভিনয় করতে করতে শম্ভুদাকে দেখতাম মাঝে মাঝেই পায়ে হাত দিতেন, যেন অস্বস্তি বোধ করছেন। আসলে রাজা অয়দিপাউসকে শৈশবে পায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। অল্প বয়সে যদি ঐ রকম লোহার কাঁটা বেঁধানো হয় তবে জখম থাকতেই পারে। প্রথম প্রথম কেউ ব্যাপারটা ধরতেই পরেনি। পরে ব্যাপারটা বোঝা যায়—পায়ে ব্যথা আছে বলেই ঐ অস্বাচ্ছন্দ্যভাব। দু-তিন বার ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শম্ভুদা ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তার স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে কতগুলো সত্যকে সে জেনে ফেলে, পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘাত-প্রতিঘাত তাকে অভিজ্ঞ ক'রে তোলে। একটু জ্ঞান হতেই থিয়েটার কী তা আমরা বুঝতে শুরু করি, কিন্তু মহৎ থিয়েটার, ভালো থিয়েটার বুঝতে হ'লে, নিজেদের গড়ে তুলতে হ'লে, চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। আজকের ছেলেমেয়েরা কী পাবে যেখানে শিশিরকুমারের মতো প্রতিভা নেই, অহীনবাবুর মতো অভিনেতা নেই, নির্মলবাবুর মতো গলা নেই, দুর্গাদাসের মতো ম্যাটিনি-আইডল নেই; মহর্ষি নেই, যোগেশবাবু নেই, রবি রায়, ভূমেন রায়ও নেই। অর্থাৎ, এমন কোনো প্রতিভা নেই যাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হবো কিংবা কিছু অর্জন করবো। এমনকি পরবর্তী যুগে শম্ভু মিত্র বা তাঁর সমসাময়িক বড় শিল্পীদের অভিনয়ও বিশেষ দেখা নেই। সুতরাং খুব বড় কাজ করা খুব সহজ নয়। আগেই বলেছি—নান্দীপটের 'শ্বেতসন্ত্রাস' আমার ভালো লেগেছে; বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে যাদের কিছুই নেই—তারা তো পারলো। যেটুকু পারলো সেটুকুই সম্পদ। নাট্যার্ঘ্যের 'খবরে প্রকাশ' সম্বন্ধেও একই কথা; বাড়াবাড়ি নেই—যেটা পারলোনা তা নিয়ে আক্ষেপ না-ই বা করলাম।

আমরা 'নবান্ন' করেছি '৪৮-এ, 'পথিক' করেছি '৪৯-এ। ঐ সময়েই দলটা মোটামুটিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মোটামুটি বলছি এই কারণে যে প্রকৃতভাবে সংঘবদ্ধ রূপ নেয় '৫০ সালে। তখনকার থিয়েটারের আবহাওয়াটা ছিল অন্যরকম।

থিয়েটার বলতে তখন শুধু পেশাদারি-মঞ্চকে বোঝানো হতো। বাকিদের অভিনয় বলতে লোকে বুঝতো সখের অভিনয়। এই অবস্থায় দর্শকদের পুনর্বিন্যাস করার দবকাব হয়ে পড়েছিল। তাঁদের মনোভাব বোঝবার এবং জানবার জন্য আমরা সদস্য-ভুক্তি প্রথা চালু করলাম। এই প্রথা-অনুযায়ী আমরা আগাম চাঁদা নিতাম, শর্ত ছিল বছরে চারটে নাটক দেখাবো। অবশ্যই প্রথম প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এইভাবে বিষ্ণু দে-র মতো পণ্ডিত ব্যক্তিকে, গোপাল হালদার, রঙ্গিন হালদার, অন্নদাশংকরের মতো গুণিজনদের আমাদের নাট্য-প্রয়াসে সহযোগী ক'রে নিতে সক্ষম হলাম।

অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য তাঁদেরই আনতাম যাঁরা ভাবতেন না—তাঁদের কথাই শেষ কথা। যেমন পি.সি. যোশী। ওঁকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা করতাম। ওঁর বক্তব্য আমরা একাধিকবার শুনেছি। উনিও আমাদের খুব ভালোবাসতেন। দিল্লীতে অভিনয় করতে গেলে খবর পেয়েই ছুটে আসতেন।

এইভাবে ইতিহাস বোঝার জন্য চিনুদাকে এনেছি—গৌতম চট্টোপাধ্যায়; খুবই পণ্ডিত মানুষ। এইরকম বহু গুণীদের এনে আলোচনা-চক্র বসিয়েছি। এটা কিসের জন্য করা? একটা নাট্যদলে বহু ছেলেমেয়ে আসে, আবার চলে যায়—এটা এযুগে যেমন আছে, সেযুগেও ছিল। এখন এই নিত্য আসা-যাওয়ার মধ্যে নতুনদের নাট্য-শিক্ষা তো থাকে না, ফলে পুরাতনের সঙ্গে মেলাতে খুবই অসুবিধা হয়। সে-ক্ষেত্রে এই নাট্য-শিক্ষা প্রয়াসটা প্রচলিত থাকলে শিক্ষা-ঘাটতিটা অনেক সময় মিটে যায়। এই লক্ষ্যেই এই ধরনের আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

নাট্য-নির্বাচনে আমরা ঠিক করেছিলাম বিভিন্ন ধরনের নাটক করবো—যাতে নানা ধরনের মানুষের মনকে ছুঁতে পারি। 'পথিক' ছিল কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে লেখা; 'ছেঁড়াতার'—চাষীদের নিয়ে লেখা; মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা 'উলুখাগড়া'। ঐ সময় ঠিক ছিল বছরে চারটে ক'রে নাটক করবো এবং এক-একটা নাটক ভিন্ন-ভিন্ন নাট্যকারের লেখা হবে। এই সূত্রেই কথা হ'লো—কালী সরকার মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' করবেন। ওঁর এক ভগ্নীপতি কানাই বসু নাট্যরূপ দিলেন। মহর্ষির অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু প্রযোজনাটা হয়ে উঠলো না।

আমরা বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ করতে হবে। কারণ ওঁর নাটক না করলে নতুন উত্তরণ ঘটবে না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। অবশ্য 'পথিক' সম্পর্কেও ওঁদের সহৃদয়তা ছিল না। ব্যঙ্গ ক'রে বলতো: 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'। পরে অবশ্য বিরূপতা

চলে যায়, প্রশংসাটাই থাকে। 'ছেঁড়াতার'ও বিতর্ক তুলেছিল। ঐ নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা বার পঞ্চাশেক রহিমের মৃত্যু, আর বার পঞ্চাশেক ফুলজানের মৃত্যু দেখিয়েছিলাম!

ঠিক হ'লো 'চার অধ্যায়' করবো। 'চার অধ্যায়' নামে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কারণ ঐ নাটকে রবীন্দ্রনাথ নাকি বিপ্লব সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন। আমরা মহর্ষির অনুমতি নিতে ছুটলাম। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য একসময় অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন, পরে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতিও হয়েছিলেন, তারপর কমিউনিস্ট পার্টিতে এলেন; সুতরাং সব পথগুলোই ওঁর জানা ছিল। যদি ওঁর আপত্তি না থাকে তাহলে আর কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। সব বিবেচনা ক'রে মহর্ষি সম্মতি দিলেন। আমরা 'রবীন্দ্রনাথ' করলাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষা—অর্থাৎ ঐ রকম একটা লিরিকাল ভাষা—এর আগে কোনোদিনও মঞ্চে ব্যবহৃত হয়নি।

হরেন মুখার্জী যখন বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন তখন একজন ব্রিটিশ নাট্য-ব্যক্তিত্ব ও নামকরা অভিনেতা এসেছিলেন। রাজ্যপাল অনেককেই পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ডেকেছিলেন। আমাদেরও ডেকেছিলেন। শম্ভুদা ও আমি, আরো একজন গিয়েছিলাম। শিশিরবাবুও গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় শিশিরবাবু শম্ভুদাকে বললেন: 'কী করছো?' সেটা '৫৪-র গোড়ার কথা। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বময় পুরুষ; অনেকটা রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, শিশিরকুমার—এই রকম আর কি! এটা সত্যি, যদি কোথাও নেহরু ও শিশিরকুমার একই জায়গায় থাকতেন, আমরা শিশিরবাবুকেই দেখতে যেতাম। ওঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি-দাম্ভিকতা— সব নিয়েই পূর্ণ মানুষটা ছিল আমাদের কাছে বিস্ময়। শম্ভুদা বললেন:

— 'রবীন্দ্রনাথ করার চেষ্টা করছি।'

— 'হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ করো, রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন হবে না। তা কী করবে ঠিক করেছো?'

— 'রক্তকরবী'

— 'না, 'রক্তকরবী' নয়— 'রক্তকরবী' নয়, অন্য নাটক, ভালো নাটক কর।'

বিদেশীয় নাটক করার ভাবনাও শুরু হ'লো। কারণ ভালো বিদেশীয় নাটক না করলে অল্প-বয়সী ছেলে-মেয়েরা কী শিখবে? অবশ্য আলাদা ভাবে অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থাটা আমরা তখনও চালিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকদিন ক্লাস হতো। গলা তৈরি, চলাফেরা, বসা, ওঠা, তাকানো— এগুলোই শেখানো

হতো। প্রধানত শম্ভুদাই ক্লাস নিতেন। মাঝে মাঝে আমার ওপব ভার পড়ত। আমরা ইবসেনের 'এ্যান এনিমি অব দি পীপ্‌ল'-এর রূপান্তর 'দশচক্র' করলাম। নামডাক, খ্যাতি—সবই হ'লো, কিন্তু বাধা এলো রাজনৈতিক মহল থেকে। 'একলা চলো'—কমিউনিজমের মতাদর্শ নয়, তার মত হ'লো সবাইকে নিয়ে চলো।

ভাবতে অবাক লাগে—একের পর এক ভালো-ভালো নাটক ক'রে চলেছি আর ঐসব মন্তব্য শুনে যাচ্ছি। আমাদের প্রযোজনাগুলোর প্রতিবাদে যে সমস্ত নাটক দেখানো হচ্ছে তা হ'লো 'হরিপদ মাস্টার'-জাতীয় নাটক। ঐগুলোই নাকি জনগণের জন্য লেখা আসল নাটক।

'৫৩ সালে মন্মথ রায়কে নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করা হ'লো। তিনি লিখে দিলেন 'ধর্মঘট' নাটকটি। '৫৩ র ডিসেম্বরে নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হ'লো। কিন্তু ঐ একরাতের বেশি নাটকটি অভিনীত হয় নি। এই নাটককে কেন্দ্র ক'রে একটা দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি আমাদের মনকে বেদনাসিক্ত ক'রে রেখেছে। মহর্ষি সেবার পার্ট ভুলে গেছিলেন। আমরা নাট্য-সংক্রান্ত যে-কোনো ত্রুটিকেই সমালোচনা করতাম। এক্ষেত্রে সমালোচনাটি একটু কড়া হয়ে গিয়েছিল। মহর্ষি খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'না, না, নেক্সট্‌ শো'তে আর এরকম হবে না।' কিন্তু সেই 'নেক্সট্‌ শো' আমরা ক'রে উঠতে পারিনি এবং '৫৪-র জানুয়ারিতেই তিনি গত হন।

এরপর 'রক্তকরবী' হ'লো। কিছুদিন পর শম্ভুদা বোম্বেতে গেলেন। গঙ্গাদার লেখা 'অংশীদার' ব'লে একটা নাটক পরিচালনার ভার আমার ওপর পড়ল। নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশক হিসাবে আমার নামটা দিতে দিইনি। আমি অত বড় নির্দেশক হয়ে উঠিনি যে শম্ভুদার পরেই আমার নাম বিজ্ঞাপিত হতে পারে। সেই কারণে শম্ভুদা 'বহুরূপী'তে থাকাকালীন কোনো নাট্য-পরিচালনাতেই আমার নাম নেই; ইচ্ছাকৃত ভাবেই রাখতে দিইনি।

'৫২-র ডিসেম্বরে 'বহুরূপী'তে একটু গোলমাল শুরু হ'লো। সাংগঠনিক গণ্ডগোল, যার পরিণতিতে সবিতাব্রত, ইসরাইল, শিবু, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী মহাশয়রা দল ছেড়ে চলে গেলেন।

১৯৫২-র ডিসেম্বরে আই.টি.এফ. প্যাভিলিয়নে উৎপল দত্ত 'সাংবাদিক' নামে একটি নাটক করলেন। নাটকটি 'রাশিয়ান কোয়েশ্চেন'-এর অনুবাদ। আগে উৎপলবাবু ইংরাজি নাটকই করতেন। অবশ্য এরও আগে 'পুতুলের ঘর' ব'লে একটি নাটক করেছিলেন। উৎপল দত্তের নাম 'নীচের মহল' থেকেই ছড়াতে শুরু করলো। এটাও অনুবাদ-নাটক। অনুবাদ করেছিলেন উমানাথ ভট্টাচার্য।

নির্মল গুহরায় বোধহয় মঞ্চ-পরিকল্পনা করেছিলেন; অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন এই নির্মল গুহরায়। রবি ঘোষ তখন উৎপলেরই সঙ্গে ছিলেন। 'অঙ্গার' থেকেই উৎপলের পরিচালন-ক্ষমতার উৎকর্ষ বিশেষভাবে প্রমাণিত হতে থাকলো। এই 'অঙ্গার' নাটকটা বোধহয় 'হিউয়্যারস অব কোল' থেকে নেওয়া।

তখন বিজনদাও নাটক করছেন। বিজনদা প্রধানত ছিলেন নাট্যকার এবং 'টাইপ'-চরিত্রে দক্ষ অভিনেতা। পরিচালক হিসাবে খুব বড় কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি। আসলে পরিচালনা করতে হতো অনেকটা বাধ্য হয়েই। তাই বলা যায়—বাংলা থিয়েটারে প্রধানত দু'টো ধারাই প্রবহমান থাকলো।

উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ'-এর একটা দৃশ্যের সঙ্গে 'টিল দ্য ডে আই ডাই'-এর একটা দৃশ্যের বহুলাংশে মিল আছে। এতে অবশ্য খুব কিছু যায়-আসে না; নাটকটা যদি জমে ওঠে এবং একটা মাত্রা পায় তাহলেই যথেষ্ট। উৎপল দত্ত সেটা পেরেছেন এবং সেটাই বড় কথা। কারিগরি দক্ষতা, সমবেত অভিনয় এবং উৎকর্ষ-সাধনে উৎপলবাবুর প্রচণ্ড ক্ষমতা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে আর একজন ক্ষমতাবান নির্দেশকের নাম বলতে পারি যাঁর সঙ্গে উৎপলবাবুর তুলনা করা যায়, তিনি হলেন আলকাজী। কিন্তু সমস্তটা ভাবলে আমি উৎপলবাবুর কৃতিত্বকে অগ্রাধিকার দেবো। আলকাজীর কোনো আর্থিক দায় ছিল না, তাঁর পেছনে সরকারের টাকা ছিল, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা ছিল। কিন্তু উৎপলবাবুর সমর্থনে এভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। তা-সত্ত্বেও উৎপলবাবু নাটক ক'রে গেছেন। আমাদের এটাই গৌরব।

আর একজন ঐ সময় নাটক শুরু করেন—তিনি হলেন তরুণ রায়। আমাদের বয়সী—হয়তো আমার থেকে একটু বড়ই হবেন। তিনি ছোটো থিয়েটার বেছে নিয়েছিলেন। পরে পেশাদারি-মঞ্চে যান, কিন্তু খুব বড় কিছু কাজ ক'রে উঠতে পারেন নি।

এই পর্বে থিয়েটার অনেক কিছু পেল। সবচেয়ে বড় কথা আধুনিকতা পেল। এই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলো চিন্তায়, কর্মে। নাট্য-কারিগরি শিল্পে যেমন পরিবর্তন এল তেমনি ভাবনায় সংযোজিত হ'লো নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন—এ যুগে ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক নাটকের প্রযোজনা কমে গেল—যা আগের দু'পর্বেরই মূল-ধারা ছিল। এখন যে-সব নাটক লিখিত হ'লো সেগুলোর বিষয়বস্তু হ'লো শুধুই সমসাময়িক কালের মানুষ। অনুবাদ-নাটক প্রথম যুগেও হয়েছিল। কিন্তু তার নাট্য-চেহারাটা পুরোপুরি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এ-পর্বে তা হ'লো। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের নাটক অনূদিত কিংবা রূপান্তরিত হয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হ'লো। পৃথিবীর আকারটা সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে

মানুষে-মানুষে নৈকট্য সৃষ্টি করলো।

মঞ্চ এবং আলোতে সংযোজিত হ'লো সম্পূর্ণ নতুন মানসিকতা এবং কারিগরি দক্ষতা। শিশিরকুমারের সময় ডিমারের ব্যবহার শুরু হয়। এখন তা চূড়ান্ত রূপ পেল। সেলোফিন নয়, জিলেটিন পেপার বিদেশ থেকে আমদানি শুরু হ'লো। ফুট লাইট তুলে দেওয়া হ'লো। মঞ্চে যেমন প্রতীকী সেটের ব্যবহার শুরু হ'লো, তেমনি ত্রিমাত্রিক বাস্তবানুগ সেট ব্যবহৃত হতে লাগলো। যেমন 'ছেঁড়াতার'-এ গ্রামের দৃশ্য। গ্রাম বোঝাবার জন্য গাছ-গাছালি, কুঁড়ে ঘর, এই সব দেড়ফুট, দু'ফুট ক'রে আঁকানো হ'লো। এটা পেছন দিকে লাগিয়ে রাখা হতো। যখন গ্রামের দৃশ্য আসতো সামনে কুঁড়েঘরটা থাকতো। এ-সবই শম্ভুদার কল্পনা, এখানে আর কেউ অংশীদার নেই।

'চার অধ্যায়' নাটকের দৃশ্য। ছাদ দেখালে নিচের কিছু দেখা যায় না; বিশেষ ক'রে গাছপালা কিছুই দেখা যায় না। আর রাতের দৃশ্যে দেখা যায় দূরে কোথাও ঘরে আলো জ্বলছে। ওটাই করা হতো। ১৯৫০-এ 'উলুখাগড়া' নাটকে আমরা শুধু দরজার একটা ফ্রেম লাগিয়ে দিয়েছিলাম। দেওয়াল নেই, পাল্লা নেই, কেউ গেলে দেখা যাচ্ছে—একটা নতুন ব্যাপার। আজকাল এটা কোনো ব্যাপারই নয়, সব সময়েই এই ধরনের সেট ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি ৪২ বছর আগেকার কথা—যখন এগুলো ছিল দর্শক-কল্পনার বাইরে। অনেকের মনে হয়েছিল—'এই রে, সেট-টা সম্পূর্ণ করতে পারেনি'! আবার শুধু কালো পর্দা টেনে দেওয়াল বোঝানো হয়েছে—কোনো ডিটেলের কাজই নেই। আবার বলি এগুলো কেবল শম্ভুদারই সৃষ্টি। উৎপলবাবু কিন্তু বাস্তবানুগ সেট তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন। সেই প্রচেষ্টাতে বিরাট সাফল্যও পেয়েছিলেন।

অজিতেশ এলেন ৫০-এর দশকের শেষ দিকে। তখন আমি টালিগঞ্জে 'ঘড়ি ঘরে' থাকি। একদিন অজিতেশ এসে বললো—অব্যয়বাবু তাঁকে পাঠিয়েছেন। অজিতেশ মণীন্দ্র কলেজে পড়তো, দীপেনের সহপাঠী। দীপেন তখনও নাটকে আসেনি। অজিতেশ বলল—'আপনার মনে আছে?' মনে তো বিলক্ষণই আছে—কিছুদিন আগে আমিই তো আসতে বলেছিলাম। অজিতেশ বললো—'আপনি বলেছেন লেখা-পড়া করতে আর নাটক লিখতে। আমি একটা নাটক লিখেছি, দেখে দেবেন।' আমি বললাম—'রেখে যাও।' গল্প-টল্প ক'রে চলে গেল। আমি পড়তে শুরু করলাম। হাতের লেখাটা ছিল ভালো। কিন্তু পড়ে দেখলাম 'হিউয়্যারস অব কোল'-এর অনুবাদ ক'রে নিয়ে এসেছে। ওর বয়সটা অল্প, কী আর বলি! বললাম—'ভালোই হয়েছে। তবে একটা

নাটক আছে; ঐ নাটকটার মতো হয়ে গেছে।' ও বলল—'আমি আমার মতো ক'রে লিখেছি।' আমি বললাম—'তুমি অন্য নাটক লেখো।'

এই অজিতেশ পরে 'নান্দীকার' গড়ে তুললো। 'নান্দীকার' নামটা দীপেনেরই দেওয়া। অজিতেশ অবশ্য আগে আই.পি.টি.এ. করেছে। এখানে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' ওঁদের খ্যাতি এনে দিল।

এর আগে আমি সৌখিন দলগুলোর ওপর পেশাদারি-মঞ্চের প্রভাবের কথা বলেছি; এবার ব্যাপারটা উল্টে দিচ্ছি। ১৯৫৩-৫৪-তে চেহারাটা বদলে গেল। আমাদের অনুসরণ করা শুরু করলো পেশাদারি মঞ্চগুলো। এই থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে ওঁদের থিয়েটারের সাফল্য আনতে চাইলো। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল, যেমন—'শ্যামলী'। উত্তমকুমার-সাবিত্রীকে নিয়ে স্টার একটা হৈ-চৈ ফেলে দিল। সাবিত্রীর প্রথম অভিনয় অবশ্য পেশাদারি প্রথার বাইরেই, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে। এর আগে আমরা 'নবান্ন' করেছি, 'পথিক', 'ছেঁড়াতার', 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র', 'রক্তকরবী' করেছি। 'নতুন ইহুদী'ও হয়েছে। আমাদের অভিনয়-ধারাকে কাজে লাগাতে ওঁরা তৃপ্তি মিত্রকে নামালেন 'সেতু'তে। 'সেতু' যে আলোড়ন তুলেছিল তার কারণ তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় এবং তাপস সেনের অনবদ্য আলোর পরিকল্পনা। তাপস সেন তখন উভয় নাট্য-জগতেরই এক অনস্বীকার্য সঞ্চালক। একদিকে যেমন 'সেতু', অন্যদিকে 'অঙ্গার'—তাপস একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ালো। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং যোগ্য মানুষ। একটা লক্ষণীয় ব্যাপার: সতু সেন কিন্তু আমাদের এই 'অন্য' নাট্য-জগতে আসেন নি, তাপস গেছে। ওঁরা শম্ভুদাকে নিয়ে যাবার খুব চেষ্টা করেছিলো, সফল হন নি।

শিশিরকুমার ও অন্যান্য প্রতিভাবান অভিনেতারা চলে যেতেই পেশাদারি মঞ্চে শূন্যতা দেখা দিল। আমাদের থিয়েটারে তখন যৌবনাবস্থা। নতুন জীবনবোধের আলোকপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের জমায়েত ঘটেছে সদ্য-সদ্য। এই পরিবর্তনে ভালো ভালো জিনিসের যেমন আগমন ঘটলো তেমনি অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। আমাদের যৌবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো ভাঙন। 'লিট্‌ল্ থিয়েটার' ভাঙলো, 'বহুরূপী'ও কয়েকবার ভাঙলো, 'আই.পি.টি.এ.' ভাঙলো—'আই.পি.টি.এ.' ভেঙে বহু দল তৈরি হ'লো। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লো 'শৌভনিক'। জ্ঞানেশবাবু এলেন, খুব ক্ষমতাবান শিল্পী। বীরু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রাহুমুক্ত' জমে গেল। যাত্রার ফর্মে লেখা, খুব ভালো নাটক। অবশ্য এখন করলে বোধহয় তেমন ভালো লাগবে না।

সত্যি কথা বলতে, অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উঁচু ধরনের কোনো প্রযোজনা

পরবর্তী-কালে বোধহয় সেভাবে জমে না। যেমন শুনেছি 'নবান্ন' জমেনি, ইদানীংকালে 'শোয়াইক'ও জমে নি। কিন্তু আমাদের 'দশচক্র' আর 'ছেঁড়াতার' জমেছে। '৫২-তে 'দশচক্র' হয়; দশ বছর পর আবার প্রযোজিত হয়, আবার জমে। বরং আগের চেয়ে বেশি। '৬৫তে নতুন ক'রে 'ছেঁড়াতার' হয়, সে প্রযোজনাও উৎসাহের সঙ্গে দর্শক গ্রহণ করে।

আর এক ভাবে পুরানো প্রযোজনা ফিরতি-প্রযোজনাতে জমে। যেমন কুঞ্জবাবু আবন করেছিলেন; পরে অহীনবাবু এই চরিত্র ক'রে বিখ্যাত হন। এটা হ'লো কী ক'রে? আসলে একটা নাটক কোনো প্রতিভাবানের ছোঁয়াতে যদি সার্থক হয় তাহলে ঐ সার্থকতা আনতে আর একজন অনুরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তির দরকার। না হ'লে বহুল-প্রশংসিত কোনো নাট্য-প্রযোজনা আন্তরিকভাবে প্রযোজনা করলেও সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকতেই পারে; সেটা দৃষ্টান্ত নয়।

আমি মাঝে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। ১৯৫৯ সালের কথা। শম্ভুদা, অমিত মৈত্র, বৌদি, দেওজীভাই মিলে একটা ফিল্ম-কোম্পানি করেন। কয়েক বছর বাদে ওঁদের মনে হ'লো একজন অল্পবয়সী কাজ-জানা মানুষ দরকার। আমাকে বললেন। আমি তখন একটা সরকারী চাকরি করছি। চাকরি করতে আমার কোনোদিনই ভালো লাগতো না; খালি মনে হতো চাকরি করতেই কি এসেছি! তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কাজ আরম্ভ করতেই গোলমাল শুরু হ'লো। আসলে ওঁদের মধ্যে কারো কারো মনে হয়েছিল আমি বোধহয় কর্মচারী হিসাবে থাকবো। কিন্তু সরকারের কর্মচারীর পোশাক ছেড়ে আমি ওঁদের দেওয়া কর্মচারীর পোশাক পরবো কেন? পরে আমি প্রযোজক হলাম, সঙ্গে অমিত মৈত্র।

এর আগে ওঁদের প্রযোজনায় যেসব ফিল্ম হয়েছিল সেগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ওঁদের প্রথম ফিল্ম 'শুভ বিবাহ'। এই ছবিতে লাভ-ক্ষতি কোনোটাই হয়নি। মাঝখানে ভাগ্যচক্রে জানিনা কীভাবে আমার অভিনয়-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তিন ভাই-এর একজন ছবিবাবু, অন্যজন পাহাড়িবাবু আর ছোটভাই আমি। ওঁদের উপস্থিতিতেও আমার অভিনয় লোককে মুগ্ধ করলো—একটু বেশিই করলো। পরের ছবি 'মানিক'। শম্ভুদা আর আমি—দু'জনেই ছিলেন। পয়সা ও নাম—দু'টোই পাওয়া গেল। এক্ষেত্রেও আমার অভিনয় দর্শক একটু বেশিমাত্রায় পছন্দ করলো। আমি এই ছবির প্রযোজনার অংশীদার ছিলাম না। পরের ছবি 'সূর্যস্নান'। অভিনয়ে ছিলেন শম্ভুদা, বৌদি, সবিতাব্রত ও লিলি চক্রবর্তী। আমার জন্য বড় পার্ট রাখা ছিল, কিন্তু করলাম না। অমিত মৈত্র ধরলেন—একটা

ছোটো চরিত্র ক'রে দিতে। ওঁদের হাতে তো পয়সা-কড়ি বিশেষ ছিল না। ক'রে দিয়েছিলাম। পয়সা-কড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পর। পেশাদারি অভিনেতাদের দক্ষিণাটা কিন্তু তক্ষুনি মিটিয়ে দেওযাই দস্তুর। যাই হোক, ছবিটা সাংঘাতিক ভাবে 'ফ্লপ' করলো। এরপর 'কাঞ্চনকন্যা'। এতে অভিনয় করলেন অরুণ মুখার্জী, অনুপকুমার আর আমি। অরুণ নায়ক, আমি আবারও ভিলেন, অনুপ নায়কের বন্ধু। কণিকা মজুমদার নায়িকা, সহ-নায়িকা সুমিতা সান্যাল। গঙ্গাদাও করেছিলেন। কিন্তু এ-ছবিও ব্যর্থ, চললো না। পরের ছবি 'কাঞ্চনরঙ্গ'। এটা আগেই আমরা মঞ্চে করেছিলাম, এবার হ'লো ফিল্ম। এই ছবির পরিচালক হিসাবে ওঁরা আমাকে সম্মানিত করেন। এই সময় আমি দু'টো ওড়িয়া ছবিও পরিচালনা করেছি।

আমাদের (আমি আর অমিত মৈত্র) প্রযোজিত ছবি 'পান্না' পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হ'লো। ৫/৬ সপ্তাহ চলেছিল; তাতে প্রযোজনাতে লগ্নী-অর্থ উঠে আসে না। এই ছবিটা ব্যর্থ হবার অনেকগুলো কাবণ ছিলো। গল্পটা ছিল বিদেশীয়। কিন্তু অনেকটা শুটিং চলার পর রি-টেক করতে বাধ্য হই। শম্ভুদা যে চরিত্রটা করছিলেন, সেই চরিত্রটা ছিল খুবই সুন্দর এবং শম্ভুদাও অসাধারণ করছিলেন। ঘটনাচক্রে এই চরিত্রটার কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়। রি-টেকিং-এর ফলে প্রযোজনার বাজেটও বেড়ে যায়। যাই হোক, ছবিটা চলে নি।

চাকরিতে একটা বাঁধা মাইনে থাকে। ৫০ টাকা হ'লেও মাস-শেষে নিশ্চিত ঐ টাকাটা হাতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবটাই অনিশ্চিত। তাছাড়া আমাদের একটা নিয়ম ছিল যে আমরা বাইরের কোনো ছবিতে অভিনয় করতে পারবো না। এটা একটা নীতিগত প্রথা অথবা পরোক্ষ চাপ—যাই কিছু বলা যাক, নিয়মটা ছিল। যদিও গঙ্গাদাকে বাইরে কাজ করতে যেতেই হতো; কারণ 'সত্যযুগ'-এ নিউজ-এডিটার হিসাবে চাকরিটা তাঁর গেছে। শম্ভুদা, বৌদি আগে থেকেই ফিল্ম করতেন; সুতরাং তাঁদের যেতেই হবে। কিন্তু আমি কী করি! 'বহুরূপী' থেকে তো কোনো পয়সা পেতাম না। ওদিকে জমানো টাকা শেষ হয়ে গেছে। ঘর-ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, অন্যান্য খরচ মেটানোই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। সেই '৪৭/'৪৮-এর অবস্থা। তফাৎ হচ্ছে তখন অল্প বয়স, অপরিচিত যুবক, প্রয়োজনে ফুট-পাথে আশ্রয় নিতে পারতাম, এখন সে অবস্থা নেই। উপবাসও চলছে। অবস্থাটা একটু সামলানো যেত যদি সামান্য সাহায্য কেউ করতেন কিংবা অমিতবাবু মানসিক দিক দিয়ে একটু দৃঢ়তা দেখাতেন।

অমিত মৈত্র চলচ্চিত্র জগতে অসাধারণ ক্ষমতা নিয়েই এসেছিলেন। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে ঐ রকম পরিপূর্ণ দক্ষতা নিয়ে চলচ্চিত্র জগতে খুব কম

লোকই এসেছেন। তিনি ছিলেন অক্ষয় মৈত্রের নাতি। ছাত্র হিসাবে ছিলেন অসাধারণ। প্রচণ্ড লেখাপড়া করতেন, ভালো ছবি আঁকতেন, ক্যামেরাটা ভালো বুঝতেন এবং নিজেই এডিটিং করতেন। অর্থাৎ টেকনিক্যাল কাজ সবটাই একা ক'রে দিতে পারতেন। দেহের শক্তি এবং পরিশ্রমজাত ধকল সহ্য করার ক্ষমতা এতটাই ছিল যে রাতের পর রাত জেগে কাজ করতে পারতেন—যা আমরা ওঁর থেকে বয়সে ছোটো হ্যেও পারতাম না। কিন্তু ওঁর একটা রোগ ছিল—যা সম্পূর্ণভাবে মানসিক। ছাত্রাবস্থায় ওঁর হার্টে কী-একটা রোগ হয়—সেই থেকে ওঁর মনে মৃত্যুভয় ঢুকে যায়। কখনোই একা একা কাজ করতে পারতেন না, সর্বক্ষণের একজন সঙ্গী দরকার। কিন্তু আমি সর্বক্ষণের সহযোগী হবো কীভাবে? 'বহুরূপী' আছে, তারপর আছে অন্ন-সংস্থানের চিন্তা। তাই চাকরির সুযোগ আসতেই সেটা গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।

তখন 'বহুরূপী'তে খুব গণ্ডগোল চলছিল। মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে লাগলো। আগে যত সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল সেগুলো আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা, যুক্তি দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করেছিলাম। বহুলাংশে সাফল্যও পেয়েছি। এই সমস্যাও সামলালাম, তবে মূল্য দিতে হ'লো অনেক। আমি আমেদাবাদে চলে গেলাম।

যে অবস্থা সামলানো গেছে মনে হয়েছিল আসলে তার সবটা মেটেনি। চিঠিপত্র মারফৎ খবরাখবর পাচ্ছিলাম। তখন বছরে দু'তিনবার ক'রে কলকাতায় আসতাম; 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা' প্রভৃতি পুরানো নাটকগুলো ক'রে দিতাম। নতুন নাটকে অবশ্যই নামতে পারতাম না। আগে থেকে জানিয়ে দিলে কিছু কিছু 'কল' শো-ও ক'রে দিয়ে গেছি। ন'বছর পর, '৭৭-এ কলকাতায় ফিরলাম। ফিরে এসে দেখলাম অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

সেই সময় বিশ্বরূপায় একটা নাটক হচ্ছিল: 'জন-গণ-মন'। রাসবিহারী সরকার করাচ্ছিলেন। নারায়ণ মুখার্জী ব'লে এক ভদ্রলোক, বোধহয় বিবেকানন্দ মুখার্জীর সম্পর্কে ভাই, আমাকে ঐ নাটকে অভিনয় করার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—'জানলেন কী ক'রে যে আমি এসেছি?' উনি বললেন—ইনফর্মেশন সেন্টার হলের সামনে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, ব্যানারে 'দশচক্র'র অভিনয়ের কথা ঘোষিত হয়েছে; শম্ভুদা এবং আমার নাম আছে।

উনি জানালেন—আমাকে যে চরিত্রের জন্য ভাবা হচ্ছে তা প্রধান চরিত্র এবং ভিলেনের রোল। তখনকার হিসাব মতো মাসে ৩০০০'০০ টাকা দিতে চাইলেন। আমি তো করবো না; তাছাড়া যখন ফিরেই এলাম তখন বিশ্বরূপায়

কেন? —নিজেদের থিয়েটার যখন রয়েইছে।

কিন্তু গিয়ে বুঝলাম ভেতরে ভেতরে বড় গণ্ডগোল পেকে গেছে। শম্ভুদা রবীন্দ্রভারতীতে চাকরি নিয়েছেন; গঙ্গাদা, আমার আসার আগেই গত হয়েছেন। বৌদি কাজ চালাচ্ছেন। একটা 'নাট্যোৎসব'-মতো ক'রে 'রাজা' এবং 'দশচক্র' অভিনীত হ'লো। তারপরই শম্ভুদা নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিলেন। এখন বুঝি, আমারও ঐ সময় চলে আসা উচিত ছিল, সম্মানেরও ব্যাপার হতো। কিন্তু সবাই বোঝালো আমি চলে গেলে দলটা... ইত্যাদি, ইত্যাদি...। ফলে থাকলাম এবং জীবনের সমস্ত সুকৃতি, নিষ্ঠার 'সুফল'কে হাড়িকাঠে চড়িয়ে 'বহুরূপী' ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম!

উৎপল দত্তকে 'এল.টি.জি.' ছেড়ে চলে আসতে হ'লো কেন? অজিতেশকে নিজের তৈরি দল ছাড়তে হ'লো কেন? কেনই বা শম্ভুদাকে, আমাকে চলে আসতে হ'লো? নিজের দল ছেড়ে মানুষ কখন যায়? ইচ্ছে ক'রে বা সখ ক'রে তো কেউ যায় না। অবশ্য 'দেখিয়ে দেবো'—এই মনোভাব থেকে কেউ-কেউ দল ভাঙে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে সেরকম কিছু ছিল না। 'বহুরূপী' ছেড়ে এসে কোনো দলই করিনি। বহুবার নানা জায়গা থেকে অভিনয় করার প্রস্তাব পেয়েছি, কখনো কখনো করার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু মনের সায় মেলে নি। কিন্তু আজও সুস্থ থাকলেই গলার চর্চা করি, লেখাপড়া করি, নাটক দেখি—এ এক ধরনের রসাস্বাদন। এই রসাস্বাদন আত্মার আনন্দানুভূতির সঙ্গে জড়িত; সেখানে শ্রোতা, দর্শক, পাঠক, সমালোচক শুধু আমি-ই; অন্য কারো অস্তিত্ব সেখানে নেই।

লেখা-পড়া যে-কোনো শিল্পের জন্য জ্ঞানার্জন। এই জ্ঞানকে বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে হয়—মিলিয়ে মিলিয়ে যেতে হয় এবং আমরা যাকে ব্যক্তিত্ব বলি বা বোধশক্তি বলি তার সঙ্গে যদি এক সুতোয় মেলাতে পারি তাহলে একটা কথার বহু অর্থ বার করতে পারি এবং তার বিন্যাসও সম্ভব— যাকে আমরা বলি 'ভাষ্য'। 'ভাষ্য' মানে অর্থ নয়, 'ভাষ্য' মানে ব্যাখ্যা। আমি আমার মতো 'ভাষ্য' তৈরি করতে পারি।

'ধর্মাধর্ম' ব'লে একটা নাটক হয়েছিল। আমি শ্যামল সেনগুপ্তকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম যুদ্ধ কখনো ধর্ম নয়। যার গায়ে বেশি শক্তি সে অন্যকে হত্যা করতেই পারে। যুদ্ধ যদি ধর্মই হবে তবে কুরুক্ষেত্রে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকলো না কেন? এমন কোন সে ধর্ম যে ধর্ম সমস্ত দেশকে ধ্বংস ক'রে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-শিশু এবং বিধবাদের আবাসস্থলে পরিণত করে?—এসবের অর্থ যদি সত্যিই বুঝতে হয় তাহলে দর্শন, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতিকে

ভালোভাবে বুঝতে হবে আর সেই বোধ-সঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে যদি নাটকের মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থিত করতেই হয় তাহলে নাট্যক্রিয়াকে যথোপযুক্তভাবে সক্রিয় রাখতে হবে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে একসূত্রে গাঁথলেই শিল্প-ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে; না হ'লে কোনো কিছুই বোধগম্য হয় না।

নিখিলেশ ব'লে কি কোনো ব্যক্তি ছিল? কিংবা অতীন, সঞ্জীব? বলা যায়—ওঁদের মতো লোক ছিল। আমাকেও অভিনয় করতে হ'লে ঐ রকম চরিত্রকে আশ্রয় ক'রে চারিত্রিক জটিলতাকে প্রকাশ করতে হয়। 'গ্যালিলেও' নাটকটা ধরা যাক। গ্যালিলেও-কে একটা বয়স থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। সিনেমাতে ব্যাপারটা সহজ, কিন্তু মঞ্চে? সুতরাং ভাবতে হবে—কী কী মুদ্রা ব্যবহার করলে বয়সের পার্থক্যটা চোখে পড়বে, মেক-আপ কী হবে, গলার স্বরের তারতম্য কীভাবে আনা যাবে ইত্যাদি—ইত্যাদি। এগুলো নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে। গলা ও দেহকে প্রস্তুত না করলে বড় অভিনেতা হওয়া সম্ভব নয়। গলা বলতে বেশির ভাগ লোকেই বোঝে—'এ বাংলা শুধু হিন্দুর নয়...', তা নয়। গলার সূক্ষ্মতম পর্দাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়—সেই পরিচর্যাটাই হ'লো গলাকে তৈরি করার প্রধান কাজ। যাকে বলে মড্যুলেশন; আজকাল এটারই অভাব নিশ্চিতভাবে দেখছি।

শরীরের সার্বিক অনুমতি আজকাল সর্বদা মেলে না। তবু সুযোগ-সুবিধা মতো আজকের নাট্য-প্রযোজনা বোঝবার জন্য রঙ্গমঞ্চে ছুটে ছুটে যাই। প্রশংসা করার মতো কাজ হ'লে প্রশংসা ক'রে আসি। এই অভিজ্ঞতায় উল্লেখযোগ্য কাজ যাঁরা করছেন তাঁরা হলেন—বিভাস চক্রবর্তী: নির্দেশক হিসাবে তাঁর কাজগুলো উন্নতমানের; অরুণ: ব্যতিক্রমী পন্থায় ভালো, কিন্তু কেবল 'জগন্নাথ'; দ্বিজেনকে দেখে মনে হয়েছিল অল্পবয়সী, ভালো কাজ করবে; রমাপ্রসাদের কাজ ভালো কিন্তু ইদানীং ওর কাজ চোখে পড়ে না। পরে শুনলাম দল ছেড়ে দিয়েছে অথবা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে; 'অলকানন্দার পুত্র-কন্যা' ভালো লেগেছে, 'শোভাযাত্রা' দেখিনি; 'দায়বদ্ধ' মহৎ না হলেও পরিচ্ছন্ন, বেশ ভালো কাজ। 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল', 'অনুবীক্ষণ' ভালো; 'বেলা অবেলার গল্প', 'খবরে প্রকাশ', 'শ্বেত সন্ত্রাস'ও ভালো। এর আগে মঞ্চস্থ হয়েছে 'নাথবতী অনাথবৎ'—যা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন ওঠে: আধুনিক নাটক বা আধুনিক অভিনয় বলতে কী বোঝায়? কী ভাবে আমরা বুঝতে পারবো এই নাটকের ধরন আগের মতো নয়? নাটকের ভঙ্গি কিংবা অভিনয় পদ্ধতি দেখে? আমার মনে হয়—নাটকের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে তা হ'লো বক্তব্য উপস্থাপনে।

আগেকার নাটক ছিল গল্প-নির্ভর। গল্পের বাঁধুনি ছিল খুব পোক্ত। গল্পের অভিনবত্ব কিংবা চটকই নাটককে টেনে নিয়ে যেতো। কিন্তু আধুনিক নাটক সর্বাংশে গল্প-নির্ভর নয়। আইডিয়া-নির্ভর। 'রক্তকরবী'র কথাই ধরা যাক। পুরো গল্পটা বলা যাবে? যদি সে চেষ্টাও করা হয়—সেটা কোনো গল্পই হবে না। বরং 'অচলায়তন'-এ একটা গল্প আছে; যদিও তাকেও গল্প বলা যায় না। 'কালের যাত্রা'ও তাই। বাদলবাবু এবং প্রথম দিকে মোহিতবাবু ভিন্ন-ধর্মের আইডিয়া-নির্ভর কিছু নাটক লিখেছিলেন। এগুলোই হচ্ছে আধুনিক নাটকের চেহারা। এর-ই মধ্যে নিজস্ব আইডিয়াকে যিনি স্ফটিক-স্বচ্ছ ক'রে তুলতে পেরেছেন তিনিই সার্থক হয়েছেন। বাদবাকিরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন পুরানো ধরনে। এটা কোনো নিন্দাসূচক মন্তব্য নয়; এটা আধুনিকতার সূত্র-অন্বেষণ মাত্র।

একটা ব্যাপার আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আড়ালে-আবডালে সমালোচনার নামে নিন্দাবাদ। দম্ভপ্রকাশ ক'রে শ্রদ্ধেয়-জনদের ছোটো করার মধ্যে আর যাই থাকুক গর্ব করার কিছু থাকে না। যাকে উপহাস করা হচ্ছে তার যত না ক্ষতি হয়, যিনি উপহাস করছেন—তার ক্ষতি হয় অনেক বেশি। শাসনযন্ত্রের কাছাকাছি থেকে কিংবা ক্ষমতার পীঠস্থানে অবস্থানরত অবস্থায় নিজেকে বড় ব'লে মনে করা, সত্যতার বিচারে কতখানি যথাযথ—তা বিচার্যের বিষয়। একটা উদাহরণ দিতে পারি: এ দেশের এক বিখ্যাত নট-নির্দেশকের অভিনয়-ক্ষমতা নিয়ে কনিষ্ঠ এক অভিনেতা প্রায়ই পরিহাস করতেন। এমনকি জ্যেষ্ঠ-শিল্পীর সংলাপ উদ্ধৃত ক'রে সমালোচনা করতে তাঁর দ্বিধা হতো না। ঐ জ্যেষ্ঠ-সম্মানিত, অতুলনীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী শিল্পীর বিরুদ্ধে কাগজে চিঠিপত্রও লেখেন। বহুদিন পর ঐ কনিষ্ঠ-শিল্পীকে কথা-প্রসঙ্গে তাঁর সেদিনকার সমালোচনা-প্রসঙ্গ স্মরণ করাতেই তিনি স্বীকার করেন তাঁর বক্তব্য সঠিক ছিল না। কিন্তু জ্যেষ্ঠ-শিল্পীর অভিনয়গত ত্রুটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে তিনি স্থির থাকেন। এরও বেশ কিছু দিন পর বহুল প্রচারিত এক দৈনিক পত্রিকায় দেখি—সেই কনিষ্ঠ-শিল্পী একটি লেখায় পূর্বতন জ্যেষ্ঠ-শিল্পীর সর্বদিকের ক্ষমতা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। আমি যতদূর জানি, জ্যেষ্ঠ-শিল্পীর অভিনয়ের মান, সমালোচনা-কালে যতটা ছিল, এখনও তার থেকে বেশি বৃদ্ধি পায়নি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিমতটাই যা বদলে গেছে। বদলেছে—এটা নিশ্চিত ভালো; শুধু পূর্বের অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যগুলো ইতিহাসের দলিলে লিপিবদ্ধ না থাকলেই ভালো হতো। প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই সীমাহীন হওয়া ঠিক নয়, যদি-না সেই প্রশংসা বা নিন্দা বিশেষভাবেই তা দাবি করে।

'দূরদর্শন' অনেকের সুযোগ-সুবিধা ক'রে দিচ্ছে, কিন্তু অল্পবয়সী

ছেলে-মেয়েদের সহজ পথে সাফল্য অর্জনের প্রলোভনও দেখাচ্ছে।

পরিশেষে বলি, যোগ্য লোকেব সম্মান দেওয়াতে কার্পণ্য বোধ করা উচিত নয। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নট-নির্দেশক ব'লে আমি যাঁকে সম্মান কবি—শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র—তিনি এখনো জীবিত; অসাধাবণ প্রতিভার অধিকাবী উৎপল দত্ত এখনো সক্রিয—এঁদেব কাছ্ থেকে অনেক-অনেক কিছু পাওয়াব আছে। এ ব্যাপারে নতুন নতুন নাট্যকর্মীদেব সচেষ্ট হ্ওয়া দরকার। 'কিংবদন্তী-শিল্পী' তক্‌মা দিযে এঁদের সরিযে বাখাটা বোধহয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। আমাদের কালের বহু খ্যাতনামা শিল্পী ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছেন, যেমন—হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (বটুকদা), নিবেদিতা দাস, কেয়া চক্রবর্তী প্রভৃতি। নতুন নাট্যকর্মীদের প্রতি আবেদন: যথাযথ মর্যাদায এইসব শিল্পীর কাজের মূল্যায়নে ব্রতী হোন এবং সেই কার্যধারাকে ভিত্তি ক'রে নতুন নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হোন; মানব-চিন্তার অগাধ সমুদ্র ছেঁচে সংগ্রহ করুন অসংখ্য মণিমুক্তা—যার দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠুক আগামী কালের মানব-সভ্যতা।

রচনাকাল : ১৯৯৩
সায়ক নাট্যপত্র/২য় সংখ্যা
১৯৯৬-এ পুনর্লিখিত

অবসর মুহূর্তে: তৃপ্তি মিত্র, অমর গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা থিয়েটার—২০০ বছর

'বাংলা থিয়েটার - ২০০ বছর' শিরোনামে কয়েক মাস ধরেই কিছু কিছু লেখা দেখা যাচ্ছে, আলোচনা শোনা যাচ্ছে। টুকরো টুকরো বা বিক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্যাপারটা ঠিক ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। দু'শ বছর ধরে নিয়মিত মঞ্চাভিনয় চলে আসছে আমাদের দেশে? তা-ও তো নয়। তবে? তাছাড়া কেবল বাংলা থিয়েটারের কথা বলা হচ্ছে, না সারা ভারতের কথা?

এই অবসরে নাট্যাভিনয় (মঞ্চাভিনয়) প্রসঙ্গে পুরানো দিনের কিছু ঘটনার সাহায্যে পরিপ্রেক্ষিত বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। মঞ্চ, নাটক, অভিনয় ভারতীয়দের কাছে একেবারে অজানা ছিল না। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক প্রভৃতি অনেকেই গর্ব করার মতো নাটক লিখেছেন। মঞ্চ, রূপসজ্জা, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে 'নাট্যশাস্ত্রে' বিশদ আলোচনা আছে। তাহলে? নাটক লেখা হয়েছে অথচ মঞ্চস্থ হয়নি? মঞ্চের বিশদ বিবরণ রয়েছে অথচ মঞ্চের ব্যবহার হয় নি? নিশ্চয় হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সংস্কৃত নাটক। বাংলা নাটক নয়। তাতে কিছু যায় আসে না। সংস্কৃত আমাদের জাতীয়-ভাষা। সে সমস্ত নাটকও আমাদেরই দেশ-কাল-পাত্রকে নিয়ে লেখা। বিভিন্ন ধরনের মঞ্চও আমাদের ধ্যান, ধারণা, জীবনবোধ ও শিল্পপ্রকাশে সাহায্য করার মতো ক'রেই কল্পনা করা হয়েছে। এ সবই হয়েছে এবং চলেছেও দীর্ঘকাল ধরেই। তারপর বহুকাল নানা কারণে এই ধরনের নাট্যাভিনয় আর হয়নি। ধীরে ধীরে নানা ধরনের লোকনাট্য প্রভৃতি প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বহু বছর কেটে গেল। পৃথিবী ক্রমশ ছোটো হয়ে আসতে থাকলো। ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসিদের দেখলাম, তাদের হাত ধরে নতুন ক'রে মঞ্চাভিনয় প্রথাও চালু হয়ে গেল আমাদের দেশে। তাদেরই উদ্যোগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু হ'লো মঞ্চাভিনয়। ইংরেজি বা বিদেশীয় নাটক এবং মাঝে মধ্যে সংস্কৃত নাটকের ইংরাজি

অনুবাদ এবং ইংরাজিতেই অভিনয়। তাঁরাই অভিনয় করতেন, দর্শকও প্রধানত তাঁরাই। এটা কেবল বাংলার কথা নয়—সমগ্র ভারতেরই কথা। যাত্রা তো ছিলই, এ-ছাড়া কবিগান, তরজা, পালা, অঙ্কিয়ানাট্য, নওটঙ্কি, তামাসা, ভাওয়াই, যক্ষগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বহুল প্রচলন ছিল দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে। নিয়মিত মঞ্চাভিনয়, স্থানীয় ভাষায় অভিনয় শুরু হয়—ইংরেজ আসার পর।

আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত ক'রে বাংলা থিয়েটারের ধারাবাহিকতার কথা আলোচনা করা যাক।

হেরেসিম লেবেডেফ নামে এক রুশদেশীয় শিল্পী (ইউক্রেনের অধিবাসী) ১৭৮৭ সালে মাদ্রাজে আসেন। বেহালা-বাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। কনসার্ট পার্টির মুখ্য-সঞ্চালক হিসাবে মাদ্রাজে খ্যাতিলাভ করেন। পরের বছর তিনি কলকাতা আসেন এবং ঐকতান বাদনের অনুষ্ঠান করতে থাকেন। ১৭৮৮ সালে 'ক্যালকাটা গেজেটে' তাঁর অনুষ্ঠানের প্রশংসা করা হয়।

এই সময়ে ইংরেজরা কলকাতায় মাঝে-মধ্যে অভিনয় করতেন। সম্ভবত সেই সমস্ত দেখে তিনি নাট্যাভিনয়ে আকৃষ্ট হন। বাংলাভাষা শিখতে শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই কিছুটা ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দু'টি বিদেশীয় নাটক—'দি ডিসগাইজ্' এবং 'লাভ ইজ্ দ্য বেস্ট ডক্টর' বাংলায় অনুবাদ করেন। কলকাতা নিবাসী শ্রী গোলকনাথ দাস নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কয়েকজন পণ্ডিতকে তিনি তাঁর অনূদিত নাটক শোনান। পণ্ডিত শ্রোতাদের প্রশংসা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে উৎসাহিত করে। গোলকনাথ দাসের পরামর্শে 'দি ডিসগাইজ্' নাটকের অনুবাদ-'কাল্পনিক সং-বদল' (ছদ্মবেশ ? ছদ্মবেশী ?) মঞ্চস্থ করার সংকল্প করেন। শিল্পী-সংগ্রহ, অভিনয়, শিক্ষাদান এবং প্রযোজনা-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে গোলকনাথ দাস তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। এক এক সময় মনে হয় এই উদ্যোগে গোলকনাথ দাসই সম্ভবত সর্ব-বিষয়ে মূল নেপথ্য-নায়ক ছিলেন।

ডোমতলা লেনে (বর্তমানের এজরা স্ট্রীট) 'দি বেঙ্গলি থিয়েটার' নামে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশীয় সজ্জায় তাকে সজ্জিত করেন। শেষ পর্যন্ত ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ সালে বাংলা নাট্যাভিনয় শুরু হ'লো। 'দি ডিসগাইজ্' নাটকের বঙ্গানুবাদ। এইভাবে দু'শো বছর আগে বাংলা থিয়েটারের যাত্রা শুরু হ'লো। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—

(১) এই প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয় (মঞ্চাভিনয়) হ'লো।
(২) পুরুষ এবং মহিলা শিল্পী উভয়েই অংশগ্রহণ করলেন।
(৩) অভিনয়ের সময় ভারতচন্দ্রের কবিতায় সুর দিয়ে গাওয়া হয়েছিল এবং সম্ভবত মাঝে মাঝে কৌতুকাভিনয়ের আয়োজনও হয়েছিল।

(৪) প্রবেশ-মূল্য ধার্য করা হয়েছিল আট টাকা এবং চার টাকা।
(৫) দর্শক সমাগমে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হযে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় অভিনয় হয় ২১শে মার্চ, ১৭৯৬ সালে। সেদিনও প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়।

তখনকার দিনে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় অকল্পনীয় ছিল—তাই হয়েছিল। টিকিট কেটে সাধারণ লোকে থিয়েটার দেখতে গেল—এটাও একটা ঘটনা। বাংলাতে নাটক অভিনয়—মঞ্চাভিনয় হ'লো এ-ও নতুন। অস্বাভাবিক প্রবেশ মূল্য, তা-ও প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ।

এত সব সত্ত্বেও যেটা আশ্চর্যের এবং কৌতূহলের তা হ'লো এই প্রচেষ্টা আরম্ভেই শেষ হয়ে গেল। এরপরও তিনি বেশ কয়েক বছর কলকাতায় ছিলেন। ১৮০১ সনে ইংল্যাণ্ড যান। কিন্তু ইতিমধ্যে আর কোনো অভিনয় হয়নি। কেন হয়নি? সে প্রশ্নের উত্তর মেলে না। যেমন উত্তর মেলে না রঙ্গালয়-নির্মাণ, প্রযোজনা-খরচ কে বা কারা দিয়েছিলেন? বিত্তহীন লেবেডেফ নিশ্চয়ই নন। তবে কে? কারা? রঙ্গশালা বা টাকা-কড়ির কী হ'লো? ইংরেজ সরকারের অনুমতি নিয়েই নিশ্চয় লেবেডেফ অভিনয় করেছিলেন; মাত্র দুটি অভিনয়—তাও বাংলায়। নিশ্চয়ই ইংরেজ দর্শক পাননি কিংবা ইংরাজ-থিয়েটারের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেন নি? পুরো ব্যাপারটায় গোলকনাথ দাসের ভূমিকা কতটা ছিল? এসবের বিস্তারিত এবং সঠিক উত্তর সহজলভ্য নয়; ফলে অনুমান এবং কল্পনা-নির্ভর গুজব ছড়াতে বাধ্য।

লেবেডেফ অবশ্য এই সময়ে বাংলা ব্যাকরণ রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন; ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাই হোক যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে আরম্ভ তো হ'লো—সেটাই আমাদের পরম লাভ; আজ সেটাই ইতিহাস।

এর আগে এবং বিশেষ ক'রে এর পরে ইংরাজি নাট্যাভিনয় হতে থাকলো, শুধু তাই নয়—বাড়তেও থাকলো। যদিও এসব অভিনয়ের সঙ্গে বাংলা নাট্যাভিনয়ের কোনো সম্পর্কই ছিল না, তবু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাটক অভিনীত হচ্ছে, শহরে আলাপ-আলোচনাও হচ্ছে—এভাবে এক পরিবেশ তৈরি হতে থাকলো। বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালি ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এইসব নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকলেন। এই সময়ে কয়েকটি থিয়েটার, যারা মধ্যে মধ্যে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করছিলেন তাদের মধ্যে: (১) চন্দননগর থিয়েটার ১৮০৮ সালে চালু হয়েছিল। এটা অবশ্য ফরাসিদের থিয়েটার। (২) পর্তুগিজ চার্চের কাছে এথেনিয়াম থিয়েটার (১৮১২); এখানে কিছুদিন অভিনয় হয়েছিল। (৩) এই পর্বে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় চৌরঙ্গী থিয়েটারের (১৮১৩) কথা। ইংরেজরাই

ছিলেন এই থিয়েটারের চালক, তাঁরাই অভিনেতা-অভিনেত্রী, তাঁরাই দর্শক। তবে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ধনী বাঙালিও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

এই চৌরঙ্গী থিয়েটারে অনেক শিল্পী অভিনয় ক'রে পারিশ্রমিক পেতেন। টিকিটের মূল্য ছিল খুব বেশি। চৌবঙ্গী থিয়েটার অভিনয়ে খুব খ্যাতিও অর্জন করেছিল। কিন্তু তা-সত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যেই আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শেষে একদিন দুর্ঘটনা ঘটে; অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় এই থিয়েটার।

এর পরেও ইংরেজদের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে মাঝে মাঝেই অভিনয় হতো। যেমন—খিদিরপুর থিয়েটার (১৮১৫), দমদম থিয়েটার (১৮১৭), বৈঠকখানা থিয়েটার (১৮১৯) প্রভৃতি।

বিক্ষিপ্ত প্রয়াস হিসাবে 'কলিরাজার যাত্রা' (সম্ভবত ১৮২১ সালে) এবং 'কামরূপ যাত্রা'র (১৮২২ সালে ভবানীপুরে শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়ি) অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। 'কলিরাজার যাত্রা' যাত্রাভিনয়ও হয়ে থাকতে পারে।

পরবর্তী-পর্বে দেখি—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৩১ সালে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমেই ঘোষণা করা হয়—এখানে ইংরাজি ভাষায় এবং বিলাতী ধরনেই অভিনয়াদি হবে। ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'-এর ইংরাজি অনুবাদ, সঙ্গে 'জুলিয়াস সীজার'-এর এক অংক অভিনীত হয় তাঁর বেলেঘাটার বাগানবাড়িতে—যা 'শুঁড়োর বাগান' নামে পরিচিত ছিল। এই নাট্যানুষ্ঠানে ইংরেজ দর্শকদের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালি দর্শকও যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকজন বাঙালি শিক্ষক এবং ছাত্রও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

পরের বছর এখানে দ্বিতীয় নাটক হয় 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস্'। এই অভিনয়ের প্রশংসা হয়নি। বিশেষ ক'রে বাঙালি অভিনেতাদের ইংরাজি-উচ্চারণগত ত্রুটির জন্য তীব্র সমালোচনা করা হয় ইংরাজি কাগজে।

বাঙালির উদ্যোগে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাঙালি শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন—একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বাংলা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল না। এর দ্বারা বাংলার নাট্যক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে লাভবানও হয়নি।

সেই সময়ে বাংলার নাট্যক্রিয়ার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজারে তাঁর নিজের বাড়িতেই, সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সালে, প্রতিষ্ঠা করেন এক নাট্যশালা। ১৮৩৫ সালে এখানেই অভিনীত হয় 'বিদ্যাসুন্দর'। বছরে কয়েকবারই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য : (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। (২) এক এক দৃশ্য এক এক স্থানে অভিনীত হ্যেছিল। দর্শকরাও সেই মতো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় দেখতেন। (৩) দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময়ে ভারতচন্দ্রের কবিতা থেকে পাঠ করা হতো। (৪) ঐকতান বাদ্যের সুন্দর ব্যবহার হয়েছিল। (৫) নাট্যরস সৃষ্টি এবং চমক আনার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ ব্যয় ক'রে নানা যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল, যার সাহায্যে ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত প্রভৃতি দেখানো হয়েছিল। এই নাট্যশালা এবং প্রযোজনার জন্য শোনা যায় দু-লক্ষেরও বেশি অর্থ ব্যয় কবেছিলেন নবীনচন্দ্র বসু। এই প্রচেষ্টা আমাদের নাট্যক্রিয়ার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল পর আবার বাংলায় অভিনয় হ'লো—যা দর্শক সমাজকে নতুনভাবে আবার উৎসাহিত ক'রে তুললো, আকৃষ্ট ক'রে তুললো।

নাট্যাভিনয় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকলো। সংস্কৃত এবং হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অভিনয়ে আকৃষ্ট হয়ে কলেজে অভিনয় শুরু করেন। পরে কয়েক বছর বিভিন্ন স্থানে ইংরাজি নাটক, বিশেষ ক'রে শেক্সপীয়ারের নাটক অভিনীত হতে থাকে। এইভাবেই ১৮৫৩ সালে গড়ে ওঠে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। বাঙালি অভিনেতারাই অভিনয় করতেন কিন্তু অভিনয় হতো ইংরাজিতে। মাঝে মাঝে অবশ্য ইংরেজ মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন। 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' এবং পরে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাট্যাভিনয়ে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাও হয়েছিল।

সেই সময়েই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্যারীচরণ বসু (নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র) এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ১৮৫৪ সালে 'জুলিয়াস সিজার' নাটক প্রশংসার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

দেশি এবং বিদেশিদের প্রচেষ্টায় মাঝে-মধ্যেই ইংরাজি নাটক অভিনীত হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলা নাটক এবং অভিনয়ের অভাবও অনুভূত হচ্ছিল। এই অভাব-বোধ থেকেই জন্ম নেয় বাংলা নাটক লেখার এবং অভিনয়ের প্রবল বাসনা।

ইতিহাস রচিত হ'লো ১৮৫৪ সালে, কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের মাধ্যমে। ১৮৫৪ সালে লিখিত নাটকটি মঞ্চস্থ হ'লো ১৮৫৬ সালে, চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়িতে। এই প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় এবং প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ।

লেবেডেফের নাট্যক্রিয়া যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা, নবীনচন্দ্র বসুর 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মঞ্চ-উপস্থাপনা যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য,

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের অভিনয়-আয়োজনও তেমনি বাংলা নাট্যক্রিয়ার ইতিহাসে গর্বের বিষয়।

নানাবিধ নাটকের রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন নাট্য-রচনার পথ-প্রদর্শক হিসাবে স্মরণীয়। বিভিন্ন সময়ে নানা পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। ঠাকুর পরিবারের চাহিদা মতো বহু-বিবাহ সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে তিনি একটি নাটক লেখেন—'নব নাটক' এবং দু'শো টাকা পুরস্কার পান।

ক্রমে ক্রমে বাংলা-নাটক লেখা এবং মঞ্চস্থ করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। ধনে-মানে, বিদ্যা ও শিল্প-চর্চায় এবং দেশের সার্বিক উন্নতিতে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন—প্রথিতযশা সেই সমস্ত কৃতী-পুরুষ একের পর এক নাট্যচর্চায় ব্রতী হলেন ; ফলে কিছুদিনের মধ্যে নাটক এবং অভিনয়ের গুণগত মান উন্নত হতে থাকলো। প্রসঙ্গত কয়েকজনের নামোল্লেখ অতি প্রয়োজন।

আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবু) উত্তরপুরুষদের প্রচেষ্টায় ১৮৫৭ সালে তাঁদেরই গৃহের মঞ্চ সংস্কার ক'রে 'শকুন্তলা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখানে আরো কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

দেশগৌরব কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'বেণী সংহার' নাটকের বঙ্গানুবাদ (রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত) মঞ্চস্থ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে 'বিক্রমোর্বশী' নাটক অনুবাদ ক'রে মঞ্চস্থ করেন ১৮৫৭ সালে। নিতান্ত তরুণ বয়েসেই কালীপ্রসন্ন সিংহ অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান।

বেলগাছিয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন বেলগাছিয়া থিয়েটার। এটাই হ'লো প্রথম স্থায়ী রঙ্গশালা। এই নাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত 'রত্নাবলী'র বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ হয় ১৮৫৮ সালে। এই নাট্যাভিনয়েই প্রথম ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান বাদ্য পরিবেশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁদের অসামান্য নাট্যপ্রীতি ও অবদানের জন্য বাংলার নাট্য প্রচেষ্টার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার ক'রে আছেন। এই বেলগাছিয়া থিয়েটারেই মাইকেল মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভার বিকাশ হয়। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত এবং মঞ্চস্থ হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন এবং ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং সহযোগিতায় বাংলার নাট্যক্রিয়া ক্রমশ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

শোভাবাজার রাজবাড়ির উদ্যোগে ১৮৬৫ সালে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ হয়। তারপরেও মাইকেলের কয়েকটি নাটক এখানে হয়েছিল।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', তারপব ১৮৬৬ সালে 'বুঝলে কিনা' এবং পরে বহু-প্রশংসিত 'মালতী মাধব' প্রভৃতি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর পরিবারে 'নব নাটক' মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৭ সালে।

'শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', 'বহুবাজার নাট্যালয়', 'আহেরীটোলা আড়পুলি নাট্য সমাজ', 'বাগবাজার নাট্য সমাজ' প্রভৃতি সংগঠনও এই সময়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ ক'রে নাট্যাভিনয়ের ধারাকে ক্রিয়াশীল ক'রে রেখেছিলেন।

এত ক্রিয়াকাণ্ড সত্ত্বেও কিন্তু সাধারণ লোকের নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ ঘটে উঠছিল না। যখন অভিনয়াদি বেশি হতো না, তখন অভাববোধও ততটা ছিল না। ক্রমশ অভাববোধ বাড়তে থাকে। সাধারণ লোক পীড়িত বোধ করতে থাকেন। তার ফলেই নাট্যাভিনয়ের প্রাঙ্গণ শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায় সর্বসাধারণের মধ্যে।

লেবেডেফের প্রচেষ্টা যদি উপক্রমণিকা হয়, তারপর ইংরেজদের বা ইংরাজিতে অভিনয়াদি যদি মঞ্চাভিনয়ের আবহাওয়া এবং অভ্যাস তৈরি ক'রে থাকে, তাহলে নীবনচন্দ্র বসুর এবং কয়েক বছর পরে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের মঞ্চায়ন বাংলা নাটকের ধারাকে সংহত করে এবং ষাটের দশকে এসে এই নাট্যক্রিয়া সর্বসাধারণের কাছে ক্রমশ উন্মুক্ত হতে থাকে ও সাধারণ-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা-পর্ব শুরু হয়ে যায়।

এই সময়েই কয়েকটি ঘটনা কয়েকজন তরুণ নাট্যশিল্পীকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে। কয়লাহাটা-বঙ্গ-নাট্যালয়ে ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে 'কিছু কিছু বুঝি' নামে একটি প্রহসন মঞ্চস্থ হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রহসনের রচয়িতা। ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঙ্গালয়ে 'বুঝলে কিনা' নামে যে প্রহসন মঞ্চস্থ হয়েছিল তাকেই উপহাস-ব্যঙ্গ ক'রে 'কিছু কিছু বুঝি' রচিত হয়। তখন প্রহসনাদির মাধ্যমে পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা চলন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই দু'টি প্রহসনই বলা যায় রুচি-বহির্ভূত ছিল। 'কিছু কিছু বুঝি' নাটিকার মাধ্যমেই তরুণ অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, প্রভৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই তরুণ শিল্পীদের অভিনয়-প্রতিভার উচ্চ-প্রশংসা করেন।

এই অবসরে একটা কথা বলা প্রয়োজন। নাট্যপ্রচেষ্টা কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। যশোর, হুগলী, ফরিদপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিক নাটক সুখ্যাতির সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ঢাকাতেই ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম অভিনীত হয়।

দেশে নাটকের আবহাওয়া বদলাতে শুরু করলো। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটক আলোড়ন তৈরি করলো—বিশেষ ক'রে দেশের যুব-মানসে। ১৮৬৭ সালে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের যাত্রারূপ দিয়ে অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। এইভাবেই দুই প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে—গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখর। সঙ্গে ধর্মদাস সুর, উমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্র মঞ্চাভিনয়ের দিকে দৃষ্টি দেন। মঞ্চাভিনয় ব্যয়সাপেক্ষ—সহায়-সম্বলহীন কয়েকজন তরুণের পক্ষে বিপুল অর্থ-সংগ্রহ সহজসাধ্য নয়। শেষপর্যন্ত গিরিশচন্দ্র বেছে নেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক। 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'-এর পতাকাতলে ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ হয়। সেইদিন থেকে গিরিশচন্দ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যান; তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর। এই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ছাড়া যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম। বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বেশ কয়েকবার এই নাটকের অভিনয় হয় বিভিন্ন স্থানে। দীনবন্ধু মিত্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে 'লীলাবতী' নাটক অভিনয় করতে বলেন। ক্রমশ নতুন নতুন শিল্পী এসে যোগ দিতে থাকেন; মহেন্দ্রলাল বোস তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'-এর দ্বিতীয় প্রয়াস 'লীলাবতী', সম্ভবত ১৮৭১ সালে মঞ্চস্থ হয়। এই সময় থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্তন হতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'-এর নাম পরিবর্তন ক'রে 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম প্রস্তাব করা হয়। পরে 'ক্যালকাটা' শব্দ বাদ দিয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে অমৃতলাল বসুও এসে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সকলেই উৎসাহিত, সকলেই উত্তেজিত। প্রস্তাব ওঠে—'ন্যাশনাল থিয়েটার' টিকিট বিক্রি ক'রে নিয়মিত অভিনয় করবে। অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, নবগোপাল মিত্র, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির

সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মতপার্থক্য হয়—'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে খারাপ-কদর্য মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, পোশাক-আশাক নিয়ে টিকিট বিক্রি ক'রে অভিনয় করায় তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। মতের মিল না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

শেষপর্যন্ত জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ির মধ্যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়েই ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 'কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' ব'লে। প্রবেশ-মূল্য ধার্য হয়েছিল—বিশেষ আসন তিন এবং দুই টাকা, প্রথম শ্রেণী এক টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা। দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদির নিন্দা হয় কিন্তু অভিনয়ের খুব প্রশংসা হয়।

এইভাবেই শুরু হয়ে গেল সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রা। দু-একটি ভিন্ন নাটকের এক-আধটি অভিনয়ের পর সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র আবার এঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের চরিত্রে অভিনয় করেন।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে যে নাট্যক্রিয়া চলেছে তাকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। বহু ঘটনা-সমৃদ্ধ প্রথম-পর্ব শুরু হয় গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির উদ্যোগে, দ্বিতীয়-পর্ব শুরু হয় শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতির সার্থক কাজে, তৃতীয়-পর্বের শুরু এই শতকের চল্লিশের দশক থেকে। তৃতীয়-পর্বে দেখি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আর একটি ভিন্ন নাট্যধারা—নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রধানত 'গণনাট্য সংঘ'র পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতির প্রয়াসে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে এই ভিন্ন নাট্যধারা আপামর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তৃতীয়-পর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ের কাজকর্মের বাইরে এই যে ভিন্ন ধারায় নাট্যপ্রচেষ্টা শুরু হ'লো তা কয়েক বছরের মধ্যেই বহুমাত্রিক এক চেহারা পেল—যা দেশের, জাতির, গর্বের এবং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল।

এই তিন-পর্বের প্রতিটিরই অনুপর্ব আছে। বারেবারেই নাটক, অভিনয়, উপস্থাপনার কলাকৌশল সমস্ত বদলেছে। উদ্বুদ্ধ হবার মতো বহু ঘটনাই ঘটেছে। নাট্যাভিনয় কেবল আমোদ বা আনন্দ বিতরণের ক্ষেত্র নয়—এ-ও প্রমাণিত হয়েছে বহুবার।

প্রথম-পর্বে আমাদের প্রধান প্রাপ্তি হ'লো সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা। সাধারণের অভিনয় করা এবং দেখার সুযোগ হ'লো। নিতান্ত তরুণ বয়স্ক কয়েকজন যুবকের প্রয়াসে এই অসাধ্য-সাধন হয়েছিল। একাধিক নতুন নাট্যকার—বিষয় এবং বৈচিত্র্যে ভরা নতুন নতুন নাটক, মহিলা-শিল্পীদের অংশগ্রহণ—তা-ও ঘটলো। দীনবন্ধু,

মাইকেল, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশগৌরব ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সর্বোপরি রামকৃষ্ণদেবের থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ সমস্ত আবহাওয়াকে এক পরিচ্ছন্ন জায়গায় নিয়ে গেল। নাট্যাভিনয়েব মাধ্যমে সমাজচিত্র এবং দেশাত্মবোধ প্রকাশ—যার পরিণামে ইংরেজ সরকারেব 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল', বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ, রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে থিয়েটারের যোগসাধন, নাট্য-পত্রিকা প্রকাশ, অসাধারণ অভিনয়ের নজির সৃষ্টি, বহু শিল্পীর প্রতিষ্ঠা, সিনেমা এবং থিয়েটারের একত্র উপস্থাপন—সবই ঘটেছে এই প্রথম-পর্বে। শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়কে অভিনয়ের প্রাঙ্গণে টেনে এনেছে এই নাট্যক্রিয়া।

প্রথম-পর্বের প্রথম এবং প্রধান লাভ যদি হয়ে থাকে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা এবং নিয়মিত অভিনয়ের চলন, তাহলে দ্বিতীয়-পর্বের প্রথম এবং প্রধান লাভ হ'লো পরিচালকের আবির্ভাব। শিশিরকুমারের মধ্যে আমরা পেলাম একজন সম্পূর্ণ পরিচালককে। নতুন নাট্যকার, নতুন আঙ্গিক ও বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরা নাটকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে আমাদের নাট্য-ভাণ্ডার। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোর ব্যবহার—সমস্ত ক্ষেত্রেই আধুনিকতার চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদগ্ধ এবং গুণিজনের যোগাযোগে থিয়েটার আবার সম্মানের আসন দখল করে। নতুন নতুন নাট্য-পত্রিকা, উন্নতমানের সমালোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম। নতুন শিল্পী—স্ত্রী এবং পুরুষ, শিক্ষিত এবং পটু—সকলের যোগদানে থিয়েটার যেন আবার যৌবন ফিরে পেল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম-পর্বের তুলনায় দ্বিতীয়-পর্ব অনেক বেশি আধুনিক হয়ে ওঠে। এ-যুগেও সরকারী বিধি-নিষেধের কোপ আসে থিয়েটারের ওপর।

তৃতীয়-পর্বের প্রধান লাভ হ'লো এক ভিন্ন ধরনের নাট্যক্রিয়ার প্রচলন। সাধারণ রঙ্গালয় তার কক্ষপথে চলতে থাকলো ঠিকই, কিন্তু তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন এক নাট্যধারা তৈরি হয়ে গেল এই পর্বে। সময়োচিত এবং জীবনমুখী নাটক, তার আঙ্গিকের কলাকৌশল, সবই সহজ অথচ কাব্যময় বিশিষ্টতা পেতে থাকলো। ঝড় বয়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—এ সবেরই প্রতিফলন পড়তে থাকলো নাটকে। দেশভাগ হয়ে গেল। ক্রমশ লোকসংখ্যা বাড়তে থাকলো, সেই সঙ্গে মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাও বাড়তে থাকলো। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে স্থান পেল নাট্যশিল্প। এই পর্বে নাটক করার এবং দেখার লোকও অনেক বেড়ে গেল; পৃথিবী আরো ছোটো হয়ে এলো। শুধু দেশ-বিদেশের নাট্যক্রিয়ার প্রতিফলনই নয়—এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনাদর্শের প্রভাবও পড়তে থাকলো সমস্ত কাজেকর্মে। রবীন্দ্রনাট্যের সফল প্রযোজনাও এই-পর্বের এক বিশেষ ঘটনা। নাটক-লেখা, অভিনয়, আলো-দৃশ্যসজ্জা—সমস্ত বিভাগেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত রইলো না।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণেও নাট্যাভিনয়াদি চলতে থাকে উৎসাহের সঙ্গে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং উপস্থাপনাব মধ্য দিয়ে এই ধারা প্রতিষ্ঠা পায়। ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণ ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়েও হতে থাকে। উপস্থাপনার কলাকৌশল ঠাকুরবাড়ি বারবার বদলেছে। সঙ্গীত এবং নৃত্যের বহুল ব্যবহারে রবীন্দ্র-নাট্য-প্রযোজনাগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তবে নাট্যক্রিয়ার তৃতীয়-পর্বেই রবীন্দ্রনাট্যের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নাট্যক্রিয়াকে এক উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করে।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর এই নাতিদীর্ঘ কালে যেমন গর্ব করার মতো বহু ঘটনা ঘটেছে, তেমনি দুঃখজনক এবং অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটেছে বিস্তর। এই সমস্ত নিয়েই আমাদের থিয়েটার।

১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ রঙ্গালয় চালু হ'লো। স্ত্রী-ভূমিকার জন্য অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয় বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩ সালে। প্রথম যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা—গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যামাসুন্দরী।

'নীলদর্পণ' নাটক স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজ সরকার পছন্দ করেনি। 'ভারতমাতা' নাটকও ইংরেজদের বিরুদ্ধে দর্শকদের উত্তেজিত করেছিল। তারপর 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক—এ সবই ইংরেজদেব বিরুদ্ধে যাচ্ছিল, অথচ শাসক সম্প্রদায় তা বন্ধ করতে পারছিল না। এমন সময় একটি ঘটনা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র এডওয়ার্ড ১৮৭৫ সালে ভারতে এসে বাঙালি পরিবারের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বকুল বাগানে নিজের বাড়ির অন্দর-মহলে নিয়ে যান। অন্দর-মহলে জগদানন্দবাবুর স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যুবরাজ প্রীত হন। এই ঘটনা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নানারকম আলাপ-আলোচনা, কাগজ-পত্তরে বিভিন্ন লেখা প্রকাশে জগদানন্দবাবু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে 'গজদানন্দ চরিত' প্রহসন লেখা হয় এবং অভিনীত হতে থাকে। সংলাপ, কবিতা, গানের মধ্য দিয়ে জগদানন্দবাবুকে বিদ্রূপ করা শুরু হয়। ইংরেজ সরকারের অপছন্দের জন্য এই প্রহসনই নাম বদলে 'হনুমান-চরিত' নাম দিয়ে অভিনীত হতে থাকে। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ এই প্রহসনগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করলে সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ ল্যাম্ব এবং কমিশনার স্টুয়ার্ট হগকে বিদ্রূপ ক'রে 'গজদানন্দ চরিত'ই সামান্য বদল ক'রে 'পুলিশ অফ পিগ্ এ্যান্ড শিপ' নাম দিয়ে অভিনয় করা হয়। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকও উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। পুলিশ অশ্লীলতার অভিযোগ আনে। একদিকে পুলিশের

আক্রোশ, অন্যদিকে দেশের লোকেদের প্রতিবাদ ক্রমশ বাড়তে থাকে। পুলিশ-অর্ডিন্যান্স্-বলে 'গজদানন্দ', 'হনুমান চরিত', 'কর্ণাটি কুমার', 'দি পুলিশ অফ পিগ্ এ্যাণ্ড শিপ' -এর অভিনয় বন্ধ ক'রে দেয় ; তবু সরকার-বিরোধী প্রযোজনা বন্ধ করা গেলো না।

'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটক অভিনয় চলার সময়ে পুলিশ এসে উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল—এই অভিযোগেই তাঁরা ধৃত হন। বিচারে অবশ্য সকলেই মুক্তি পান। ঘোষণা করা হয়—'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'কে অশ্লীল বলা যায় না। কিন্তু ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে খসড়া তৈরি হয়, বছরের শেষের দিকে তা-ই 'দি ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস কন্ট্রোল এ্যাক্ট অফ ১৮৭৬'—আইন হিসাবে পাশ হয়ে যায়। নাট্যাভিনয়ের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হ'লো।

সরকারের কঠোর বিধিনিষেধের ফলে থিয়েটার কতকটা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। উপেন্দ্রনাথ দাস থিয়েটার ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যান। অর্ধেন্দুশেখর পশ্চিম ভারতে চলে যান। অমৃতলাল বসু কিছুদিন পরে পুলিশের চাকরি নিয়ে আন্দামান যান। সুকুমারী দত্ত সংসারে জড়িয়ে পড়েন ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও থিয়েটার থেকে দূরে সরে যান।

থিয়েটার কিন্তু বন্ধ হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। নাট্যক্রিয়ার প্রতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং গুণিজনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পড়ে। 'সাধারণী' পত্রিকা নাট্য-সমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

নাট্যাভিনয় আগে বিশেষ হতো না—ফলে নাটক লেখার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল কম। এই পরিস্থিতিতে মঞ্চের প্রয়োজনে সংস্কৃত বা বিদেশীয় নাটকের অনুবাদ এবং উপন্যাসাদির নাট্যরূপ, বিশেষ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—মঞ্চকে কিছুদিন রসদ যুগিয়েছিল। প্রয়োজনের তাগিদে নাটক লেখা শুরু হ'লো। গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির লেখায় নাট্যক্রিয়া সমৃদ্ধ হ'লো। বার বার সরকারী হস্তক্ষেপে নাটক বন্ধ হয়েছে কিন্তু কাজ থেমে থাকেনি। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'-এর সময়েও রঙ্গশালা যথাকর্তব্য পালন ক'রে গেছে।

এই পর্বের যুগান্তকারী অভিনয়ের কথা আজও আলোচিত হয়। 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'জনা', 'চৈতন্যলীলা', 'পাণ্ডব গৌরব', 'সিরাজদ্দৌল্লা' ছাড়াও 'চন্দ্রগুপ্ত', 'শাজাহান', 'মিশরকুমারী', 'আলিবাবা', 'রঘুবীর' প্রভৃতি বহু নাটক অসাধারণ অভিনয়গুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মহৎ অভিনয় প্রসঙ্গে আজও এই

নাট্য-অভিনয়গুলি বারবার আলোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নামোল্লেখ অতি প্রয়োজন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ছাড়াও অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অঘোরনাথ পাঠক, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মিত্র এবং সেই পর্বেরই তরুণদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে গৌরবের আসন দখল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী এবং সর্বোপরি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অভিনেত্রীদের মধ্যে বিনোদিনী, সুকুমারী, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরীর অভিনয়খ্যাতি দেশ-কাল অতিক্রম ক'রে গেছে।

নাটককে মঞ্চসফল জনপ্রিয় করবার জন্য, দর্শককে আগ্রহান্বিত করার জন্য উপস্থাপনা এবং প্রচারের কলা-কৌশলেরও অভাব ছিল না। মঞ্চে বজ্রপাত, বন্যা, গঙ্গাবতরণ থেকে শুরু ক'রে বাঘ নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ, ঘোড়ায় চড়ে জগৎ সিংহ, সীতারাম—এ সবই হয়েছে। নাটকের সঙ্গে সিনেমাও (বায়োস্কোপ) দেখানোও হয়েছে। এ ছাড়াও দর্শকদের উপহার দেওয়ার রীতিও চালু করা হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি নাট্য-বিষয়ক পত্রিকাও এই পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন উদ্যোগী-পুরুষ। বহু রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সময়ে। একই নাটক প্রতিযোগিতার মতো ক'রে বিভিন্ন মঞ্চে একই সঙ্গে অভিনয়ের আয়োজন করা হতো। বিজ্ঞাপনে ও প্রচারের ক্ষেত্রে বহু সময়েই শালীনতার সীমা অতিক্রম ক'রে যেত।

ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং ত্যাগ স্বীকারেরও দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন বহু শিল্পী। স্টার থিয়েটার নির্মাণে গিরিশচন্দ্রের ষোল হাজার টাকা দান আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ত্যাগ স্বীকার, শিল্পী এবং সাধারণের জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত দান, তাঁকে এক বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিনোদিনী ও তিনকড়ির দান এবং ত্যাগ স্বীকারও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে এবং আশীর্বাদে সাধারণ রঙ্গালয় পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। আজও সমস্ত নাট্যশালাতে রামকৃষ্ণদেবের ছবি শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখা আছে।

বহু ঘটনা-সমৃদ্ধ প্রথম-পর্বের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। এটা শুরু হয় এই শতকের প্রথম দশক থেকেই। অতুলনীয় শক্তিধর অভিনেতৃকুলের তিরোধান ঘটতে থাকে। ১৯০০ সাল থেকে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি—একে একে অকালে দেহত্যাগ করেন। বিনোদিনীর থিয়েটার-ত্যাগ এবং সর্বোপরি ১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্রের দেহত্যাগে

থিয়েটারের প্রাণবায়ু যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতলাল বসু ছাড়া দানীবাবু, তারকনাথ পালিত, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্রনাথ ও তারাসুন্দরী তখনও সক্রিয়। কিন্তু ১৯১৬ সালের ৬ই জানুয়ারি অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে থিয়েটার যেন অচল হয়ে পড়ে। নেতৃত্ব দেবার মতো, নতুন কিছু করার উদ্যোগ নেবার মতো বিশেষ কেউ আর রইলেন না। কয়েকটা বছর কখনো নতুন নাটক, কখনো বা পুরানো নাটকের অভিনয় ক'রে কোনো রকমে থিয়েটার তার অস্তিত্ব বজায় রাখলো।

১৯২১ সালের শেষের দিকে চমক লাগানো একটা খবর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে একজন অধ্যাপক সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছেন এবং অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেই অধ্যাপক হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, যিনি প্রায় একক প্রয়াসেই মৃতপ্রায় থিয়েটারে প্রাণের সঞ্চার করেন। তারপর একে একে বহু নবীন শিল্পী এগিয়ে এলেন এবং নাট্যক্রিয়ার দ্বিতীয়-পর্বের জয়যাত্রা শুরু হ'লো।

১০ই ডিসেম্বর ১৯২১-এ ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটক মঞ্চস্থ ক'রে শিশির ভাদুড়ী চমক সৃষ্টি করেন। ১৯২৩ সালে আর্ট থিয়েটারের উদ্যোগে 'কর্ণার্জুন' মঞ্চস্থ হয় এবং সেই বছরই ইডেন গার্ডেন্সে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' মঞ্চস্থ করেন শিশিরকুমার। ইতিমধ্যে নতুন এবং প্রভূত ক্ষমতাবান বহু শিল্পী এসে যোগ দিয়েছেন সাধারণ রঙ্গালয়ে: তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণভামিনী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি। তাছাড়া যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, জীবন গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, প্রভা দেবী, শৈলেন চৌধুরী, সরযূদেবী, রাণীবালা প্রভৃতি বহু ক্ষমতাবান শিল্পীর যোগদানে এবং অনবদ্য অভিনয়ে দ্বিতীয়-পর্ব গৌরবের আসন অধিকার করে। অমৃতলাল বসু, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, তারাসুন্দরী প্রভৃতিরা তখনও সক্রিয়। পুরানো এবং নতুন শিল্পীদের মিলিত প্রয়াসে থিয়েটারে প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরে আসে।

পুরানো এবং নতুন নাটক—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজনার কৌশলে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র অভিনয়-নির্ভরতাই প্রথম-পর্বের নাট্যাভিনয়ের অতুলনীয় খ্যাতির কারণ। দ্বিতীয় পর্বে অভিনয়-খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনার সর্বাঙ্গীন উন্নত-মানের নাট্যাভিনয় দর্শক-মনে অন্য এক সম্মানের আসন লাভ করে; সপ্রশংস আলোচনা এক ভিন্ন আবহাওয়া তৈরি করে। নাট্যক্রিয়া যে যৌথ-শিল্পকর্ম-নির্ভর, তা স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় এই পর্বে।

দেশ-বিদেশের নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে থাকেন বেশি ক'রে। মঞ্চদৃশ্য-সজ্জা, আলোর কুশলী এবং শিল্পসম্মত প্রয়োগ, পোশাক-আশাক, আহার্যের এবং রূপসজ্জারও বিশেষ সতর্ক-ব্যবহার সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'সীতা', 'কর্ণার্জুন', 'আলমগীর', 'দিগ্বিজয়ী', 'চিরকুমার সভা', 'ষোড়শী', 'শেষরক্ষা', 'কারাগার', 'ঝড়ের রাতে', 'মহানিশা', 'বিজয়া', 'রীতিমত নাটক', 'স্বীমী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচাব', 'পথের দাবী', 'ভোলা মাষ্টার' প্রভৃতি বহু নাটক।

ত্রিমাত্রিক মঞ্চসজ্জা, উচ্চতায় বহু স্তরের ব্যবহার, বাল্‌ব-স্পটের এবং ডিমারের ব্যবহার বাডতে থাকে। এই সময়েই ঘূর্ণায়মান-মঞ্চ স্থাপন এবং ব্যবহার শুরু হয়। আলো এবং মঞ্চের ব্যাপারে সতু সেনের অবদান নাট্য-প্রযোজনায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। বিভিন্ন ধরনের নাটক লেখা শুরু হয়, বিশেষ ক'রে ঘূর্ণায়মান-মঞ্চের সুবিধার সদ্ব্যবহার ক'রে। বহু নাট্যকারের দেখা পাওয়া যায় এই পর্বে। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, নিশিকান্ত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, জলধর সেন, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, অয়স্কান্ত বক্সী, তুলসী লাহিড়ী, তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিধাযক ভট্টাচার্য এবং আরও অনেক নাট্যকার এই পর্বেই আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপও হতে থাকে বিভিন্ন মঞ্চে। সময়ে-সময়ে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে এসেছেন। 'রীতিমত নাটক'-এ (১৯৩৫), 'শেষরক্ষা'য় মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান দূর ক'রে শিশিরকুমার নাট্য-প্রযোজনায় এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন। এই পর্বের কয়েকজন শিল্পী—রবীন্দ্রমোহন রায় (রবি রায়) এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতির ব্যক্তিগত চেষ্টায় নতুন এক নাট্যশালা রঙমহল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্বেই পরের দশকে কালিকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩০ সালে 'সীতা' নাটক অভিনয় করতে নিজের শিল্পীদের নিয়ে শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন। ব্যবস্থা এবং আয়োজনের বহু ত্রুটির ফলে এই যাত্রা ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু আমেরিকাবাসী সতু সেনের কলকাতায় ফিরে এসে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া—এক বিশেষ লাভ। মঞ্চ এবং বিশেষ করে আলোর শিল্পসম্মত এবং কৌশলী ব্যবহারে নাট্যক্রিয়া সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রথম-পর্বের মতো এই পর্বেও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে বহু নবীন অভিনেতা-অভিনেত্রী সাধারণ রঙ্গালয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসেন। ভূমেন রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, মিহির ভট্টাচার্য, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সিধু গাঙ্গুলী, শেফালিকা

দেবী, শান্তি গুপ্তা, রাজলক্ষ্মী দেবী এবং তারও পরে কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েকটি নাট্য-পত্রিকাও সুনামের সঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে এই পর্বে। 'নাচঘর' পত্রিকা বিশেষ ক'রে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। 'রূপমঞ্চ'ও একাজে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে। নাটক, রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয়ের ইতিহাস রচনাতেও বেশ কয়েকজন গুণী এগিয়ে আসেন। এই দুরূহ কাজের সঙ্গে ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, কালীশ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজনের নাম যুক্ত হয়ে আছে।

কখনো প্রাণচঞ্চল, কখনো বা মন্থর গতিতে রঙ্গালয় কাজ ক'রে চলছিল তার নির্দিষ্ট পথে। কিন্তু চল্লিশ দশকে দেশে একের পর এক অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। কলকাতা তো বটেই, সমস্ত দেশই যেন ক্রমশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধের কাঠামো, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সবই যেন ওলোট-পালোট হতে থাকে আর তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই নাট্যক্রিয়াতেও দেখা দিতে থাকে, এটা ঘটে সকলের অলক্ষ্যেই।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও তার প্রভাব আমরা বুঝতে পারি ১৯৪১ সাল আন্দাজ। এই ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বিদেশীদের এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বিদেশে আর আমরা ছিলাম বিদেশী শাসনে আবদ্ধ; সুতরাং যুদ্ধের সমস্ত কুফল আমাদের ওপরেও আসতে থাকলো। ১৯৪২-এর আন্দোলন এক ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরি করলো। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী দৈত্য তাড়া ক'রে ফিরতে থাকলো সকলকে। বর্মা প্রভৃতি দেশ থেকে হাজারে হাজারে লোক পালিয়ে আসতে থাকলো আমাদের দেশে, প্রধানত কলকাতায়। জাপানী বোমা পড়ল এ শহরে—লোকে ভয় পেয়ে যে যেখানে পারলো চলে যেতে থাকলো। ব্ল্যাক-আউটে শহর হয়ে গেল অন্ধকার। রাত্রে চলাফেরা সহজ রইলো না। গোরা সৈন্যদের টহলদারী আর অত্যাচারে কলকাতাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি কালো রং-এ ঢাকা পড়ে গেল।

এতো সবের মধ্যে এলো মানুষের তৈরি এক মহাদুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত লোকের মৃত্যু হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মৃত্যু হ'লো এ দুর্ভিক্ষে। বর্মা থেকে ইভাক্যুয়ি আসতে থাকলো কলকাতায় প্রাণের ভয়ে, আবার কলকাতার লোক কলকাতা ছাড়লো সেই প্রাণেরই দায়ে। গ্রামগঞ্জ থেকে লোক এসে ভিড় করতে থাকলো কলকাতায়—ভিক্ষের আশায়, জীবন বাঁচানোর তাগিদে। তারা মুহূর্তে যেন ভিখারি হয়ে গেল। কেবল ব্ল্যাক-আউট নয়, ব্ল্যাক-মার্কেট হয়ে উঠতে লাগলো নিত্য-সঙ্গী। এইভাবে পুরো সমাজটা তছনছ হয়ে যেতে থাকলো,

মূল্যবোধগুলো দ্রুত হারাতে শুরু করলো। কিছু লোক এই অবস্থা মেনে নিলো, অসহায়-বোধে কিছু লোক দিশাহারা হয়ে গোলমেলে পথে চলতে থাকলো; আবার কেউ-কেউ প্রতিবাদের পথও বেছে নিলো।

সাধারণ রঙ্গালয়েও এই অস্থিরতার ছোঁয়া লাগলো। কিন্তু নাটক রচনায়, প্রযোজনায় বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। দেশের, সমাজের, মানুষের দিশাহারার অবস্থার প্রতিফলনও কোনো নাট্যক্রিয়ায় দেখা গেল না। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বহু নাটকই জনপ্রিয় হয়েছে, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলেছে দিনের পর দিন। সমাজের এই গোলমেলে অবস্থার মধ্যেও দর্শকের অভাব হয় নি। কেবলমাত্র অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যই খ্যাতি পেয়েছে বহু নাটক। 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'রক্তের ডাক', 'মাইকেল' (অহীন্দ্র চৌধুরী এবং শিশিরকুমার—দু'জনের প্রযোজনাই), 'জীবনরঙ্গ', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দেবদাস', 'ধাত্রী-পান্না', 'বিজয়া', 'বিপ্রদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'টিপু সুলতান' প্রভৃতি নাটক খুব খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। কখনো অভিনয়ের মানে, কখনো বা প্রযোজনার কুশলতায়, এই সমস্ত নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য—দেশের তদানীন্তন অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থার অদলবদল, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চাহিদার ভিত্তিতে নাটক লেখা এবং মঞ্চস্থ করা হচ্ছিল না। এই কয়েক বছরের মধ্যে প্রথিতযশা কয়েকজন শিল্পীর অকালে দেহাবসানও ঘটে। বিশেষ ক'রে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বানাথ ভাদুড়ী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মৃত্যু বড় আঘাত হানে সাধারণ রঙ্গশালার কাজকর্মে।

আর ঠিক এই সময়েই শুরু হয় পালাবদল। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে শুরু হয়ে যায় তৃতীয়-পর্বের প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অক্টোবর ১৯৪৪ সালে মঞ্চস্থ হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক। 'গণনাট্য সংঘ' এর ব্যবস্থাপক। 'গণনাট্য সংঘ'র উদ্যোগে এর কয়েক মাস আগে দু'একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল কিন্তু 'নবান্ন' প্রযোজনা যেন এক ইতিহাস রচনা ক'রে দিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে, তাদের কাজকর্মের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক না রেখেই এক ভিন্ন ধারার নাট্যক্রিয়া জন্ম নিল ১৯৪৪ সালে।

সেদিনের গ্রাম-বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য জীবনের এক জীবন্ত দলিল প্রকাশ পেল এই নাটকে। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতির অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং বিশেষ ক'রে নির্দেশনার কলাকৌশলে এক ভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা দর্শক-মনকে জয় ক'রে নিল অতি সহজে। কমিউনিস্ট

পার্টির উদ্যোগে 'গণনাট্য সংঘ'র ব্যবস্থাপনায় শহরে, গ্রামে-গঞ্জে অভিনীত হতে থাকলো এই নাটক। সেদিন দেশের যুব-মানস যেন এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। অবশ্য একথাও ঠিক যে 'নবান্ন'-প্রযোজনা যত সফল হয়েছিল পরবর্তী কয়েকটি প্রযোজনা সে সাফল্য পায়নি। কিন্তু তবু ভিন্ন স্বাদের নাটক, সহজ অথচ নাটকীয় অভিনয় এবং প্রযোজনার ভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হল দর্শক।

'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'র উদ্যোগে 'অভ্যুদয়' নামে এক গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে সূত্রধারের গ্রন্থনায় এই নাট্যপ্রয়াস খুবই খ্যাতি অর্জন করে। শ্রী প্রবোধকুমার সান্যালের পাঠ, প্রহ্লাদ দাসের নৃত্য-পরিচালনা এবং সুকৃতি সেনের নির্দেশনায় 'অভ্যুদয়' নতুন ধরনের এক নাট্যকর্ম হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দুঃখজনক ঘটনা দেশকে বারবার বিড়ম্বিত করতে থাকে। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশকে যেন বিধ্বস্ত ক'রে দেয়। মানুষ যেন মানুষ নয়—কেউ হিন্দু, কেউ-বা মুসলমান। শেষপর্যন্ত বহু মূল্য দিতে হ'লো—দেশ ভাগ হয়ে গেল: ভারত এবং পাকিস্তান। নিজের দেশে নিজের গ্রামেই মানুষ ভিন্নদেশী হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হ'লো ১৯৪৭ সালে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে গেল।

১৯৪৭ সাল থেকেই 'গণনাট্য সংঘ'র বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে। 'ধরতী কি লাল' ছবি প্রযোজিত হবার পর দেখা যায় শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র এবং সর্বোপরি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—যিনি ছিলেন শিশিরকুমারের সহযোগী এবং পরে 'গণনাট্য সংঘ'র সভাপতি—সবাই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন, 'গণনাট্য সংঘ'র বাইরে চলে গেছেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সহযোগী হয়ে কালী সরকার—যিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে 'বিন্দুর ছেলে', 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি অভিনয় ক'রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যোগ দেন। অন্যদিকে কলিম শরাফী, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, মঃ জ্যাকেরিয়া, শোভেন মজুমদার, মঃ ইসরাইল, মুক্তি গোস্বামী প্রভৃতি তরুণ শিল্পীরা এসে মিলিত হন শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠে নতুন এক নাট্য-প্রতিষ্ঠান। বিজন ভট্টাচার্যও এসে যোগ দেন এই প্রতিষ্ঠানে, সঙ্গে আসেন ঋত্বিক ঘটক।

এঁদের সকলের মিলিত প্রয়াসে এবং অভিনয়ে 'নবান্ন' নতুন ক'রে মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৮ সালের ১৩, ১৪ এবং ১৬ই অক্টোবর, রঙমহল মঞ্চে। প্রথম থেকেই অভিনয়াদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ নজর দেয় এই প্রতিষ্ঠান। তৈরি হতে থাকে নতুনের দল, যাঁরা হয়ে উঠলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ

এবং শিশিক্ষু। 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হবার কিছুদিন পব বিজন ভট্টাচার্য চলে যান, আসেন প্রবীণ নাট্যকাব-অভিনেতা-সঙ্গীতজ্ঞ তুলসী লাহিড়ী। সাধারণ রঙ্গালয়ে তুলসী লাহিড়ী-বচিত বেশ কযেকটি নাটক ইতিপূর্বে মঞ্চস্থ হযেছে। ১৯৪৬ সালে 'দুঃখীব ইমান' নাটক তো সেই সমযে সকলেব সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

নব-গঠিত এই প্রতিষ্ঠান—পবে যাব নামকরণ হয 'বহুরূপী'—তুলসী লাহিড়ীর কয়লা খনির শ্রমিকদের নিযে লেখা নাটক 'পথিক' মঞ্চস্থ করে ১৯৪৯ সালে। তাঁরা ঘোষণা করেন: ভালো ক'রে, ভালো নাটক করবেন—যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস আছে। এই সময়ে দেবব্রত বিশ্বাস এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও এই কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। এক অভিনব প্রয়াসে কাজ শুরু হ'লো। ঘোষিত হ'লো, বছরে চারটে ক'রে নতুন নাটক তাঁরা মঞ্চস্থ করবেন এবং বহু মানুষকে দর্শক-শ্রেণীভুক্ত ক'রে 'অনুগ্রাহক-সদস্য' নামে চিহ্নিত করবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের বাৎসরিক চাঁদা স্থির হ'লো ১২ টাকা এবং ৮ টাকা। বছরের শুরুতেই এই চাঁদা সংগ্রহ করা শুরু হ'লো। স্থির হ'লো, দল যেসব নাটক তৈরি করবেন, মঞ্চস্থ করবেন, অনুগ্রাহক-সদস্যরা তার প্রথম অভিনয় দেখবেন এবং ভালো লাগলে 'কেন ভালো', না লাগলে 'কেন নয়', তার লিখিত সমালোচনা দেবেন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই অভিনব প্রয়াসে বেশ সুফল পাওযা গেল। ট্রাম কোম্পানির শ্রমিক থেকে হাইকোর্টেব বিচারক—সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকেই দর্শক হিসাবে পাওয়া গেল। তাদের সমালোচনায় বহুমাত্রিক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতো। নাট্যকর্মীদের সঙ্গে দর্শকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিবিড়-নৈকট্যের সূত্র রচনা করলো।

নতুন যে নাট্যধারা তৈরি হ'লো মঞ্চের অভাবে তার কাজকর্ম ব্যাহত হতে থাকলো। পেশাদারি-রঙ্গমঞ্চ তাদের মঞ্চে টিকিট বিক্রি ক'রে অভিনয় করার অনুমতি সহজে দিত না। স্টার থিয়েটার তো একেবারেই নয়। মূলত মঞ্চের অভাবই এই প্রতিষ্ঠানকে (যা ইতিমধ্যে 'বহুরূপী' নাম নিয়েছে) ঠেলে দেয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চের দিকে। নিউ এম্পায়ার তখন সিনেমা হল হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। ইংরেজ-ফিরিঙ্গি এবং উচ্চবিত্তদের যাতায়াত সেখানে বেশি ছিল। উপায়ান্তর না দেখে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রতি রবিবার এবং ১৯৫১ সালের প্রথম রবিবার সকালে এই মঞ্চ ভাড়া ক'রে 'বহুরূপী' এক 'নাট্যোৎসব'-এর আয়োজন করে। নিউ এম্পায়ার মঞ্চ—যেখানে সাধারণ দর্শক যেতে অভ্যস্ত ছিলেন না—তা-ও আবার সকালে অভিনয়, অনভ্যস্ত দর্শক, তবু প্রতি রবিবার অভিনয় এবং প্রযোজনার গুণে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটক অভিনীত হতে থাকলো। এই উৎসবে মঞ্চস্থ হয়েছিল তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার' এবং শ্রী সঞ্জীব (শম্ভু মিত্র)-রচিত 'উলুখাগড়া'। অভিনয়, আঙ্গিকগত কলাকৌশল এবং সামগ্রিক

প্রযোজনার গুণে তিনটি নাটকই দর্শকদের আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। তবে 'ছেঁড়াতার' নাটক বিষয়-বৈচিত্র্যে, অভিনয় এবং প্রযোজনার অভিনবত্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে নেয।

সাধারণ রঙ্গালয়েব কাজকর্ম যেমন চলতে থাকে, তেমনই চলছিল। তার বাইরে এই ভিন্নধারার কাজকর্ম ক্রমশ বিশিষ্টতা লাভ করতে থাকে এবং এক সম্মানের আসন অধিকার করে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি সংস্থা কাজ করতে শুরু করেছে। কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় 'গণনাট্য সংঘ'র অসুবিধা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন নামে 'গণনাট্য সংঘ' কাজ করতে থাকে। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নিজের সংস্থা গড়ে অভিনয় শুরু করলেন। 'নাট্যচক্র' প্রতিষ্ঠা পেল। শ্রী সুধী প্রধান তাঁর সংস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখলেন। ক্রমে ক্রমে এই ভিন্ন ধারার নাট্যক্রিয়া প্রসার লাভ করতে থাকলো। আর.এস.পি.-র পৃষ্ঠপোষকতায় 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠা হ'লো। পরে 'উত্তর সারথি' মঞ্চস্থ করলো নতুন নাট্যকার সলিল সেনের লেখা 'নতুন ইহুদী'। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং প্রযোজনার গুণে এ নাটকও উচ্চ-প্রশংসিত হ'লো। এটা হ'লো ১৯৫১ সালের ঘটনা।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে সে সময়ে যাঁরাই নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন তাঁদের নাট্য-অভিনয় এবং প্রযোজনা সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা পেতে থাকলো। নাটক হয়ে উঠলো জীবনমুখী। সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হতে থাকলো নাটকে।

পঞ্চাশের দশকে বহু ক্ষমতাবান শিল্পী যুক্ত হতে থাকলেন এই ক্রিয়া-কাণ্ডে, কাজের সুবিধার জন্য নিজের নিজের দল প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তাঁদের নিত্য নতুন নাটক, নিত্য নতুন প্রয়োগ-পদ্ধতি যুব-সম্প্রদায়কে উৎসাহিত ক'রে তুললো। নাট্যক্রিয়া অনেক বেশি জনপ্রিয় হতে থাকলো। 'বহুরূপী' ছাড়াও 'উত্তর সারথি' এবং কিছু পরে 'লিট্‌ল্ থিয়েটার' (ডিসেম্বর, ৫২), 'নাট্যচক্র', 'গণনাট্য সংঘ', 'অশনি চক্র', 'থিয়েটার সেন্টার', 'থিয়েটার ইউনিট', 'শৌভনিক', 'রূপকার' নিয়মিত কাজ করতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে 'বহুরূপী' রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর (১৯৫১ সালে) নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ ক'রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৫২ সালে 'দশচক্র' মঞ্চস্থ ক'রে 'বহুরূপী' নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে নেয়। এই সময় থেকে 'গণনাট্য' কথাটি ছাড়াও 'নবনাট্য', 'সৎনাট্য' প্রভৃতি কথা চালু হতে থাকে।

তবে এ-কথাও সত্য যে নাটককে জীবনমুখী ক'রে তুলতে গিয়ে কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সরলীকৃত রাস্তায় নাটক লেখা শুরু

হ'লো এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সমস্ত নাটক এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাররা প্রচার-সর্বস্ব হ'য়ে পড়লেন। স্বাভাবিকভাবেই এসব ক্রিয়াকর্ম হয় স্বল্পায়ু।

'নবান্ন'তে যার গৌরবময শুরু, 'ছেঁড়াতার'-এ যার প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৪ সালে 'রক্তকরবী'-প্রযোজনায় তা চরম উৎকর্ষ লাভ করলো। এই যুগান্তকারী প্রযোজনা নানা দিক থেকেই ইতিহাস তৈরি করলো। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪-র মধ্যে নাট্যক্রিয়ার সামগ্রিক পরিবেশের এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

বাইরের এই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব সাধারণ রঙ্গালয়ে গিয়ে পড়তে থাকলো। ১৯৫৩ সালে স্টার থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার করা হ'লো। সেখানে 'শ্যামলী' নাটক খুবই সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হতে থাকলো। কিছু পরে রঙমহলেও বহু অদল-বদল ঘটলো। সেখানেও নাটক জনসমাদর লাভ করলো। এই দশকেই দুঃখজনক এক ঘটনা সকলকে ব্যথিত ক'রে তোলে। শিশিরকুমারকে তাঁর শ্রীরঙ্গম নাট্যশালা ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাঁর এই প্রস্থান কেবল পেশাদারি-রঙ্গালয়ের নয়, দেশের সামগ্রিক নাট্যক্রিয়ার পক্ষে এক বড আঘাত। অপূরণীয় ক্ষতি হ'লো থিয়েটারের। সমগ্র পৃথিবীর নাট্যাভিনয়ের মানদণ্ডে তিনি ছিলেন প্রথম সারির শিল্পী; আমাদের দেশের গৌরব। শ্রীরঙ্গমের হাত-বদল হয়। নতুন নাম হয় বিশ্বরূপা। নানাভাবে সংস্কার ক'রে নতুন কর্মসূচি নিয়ে তাঁদের অধিকৃত বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে কাজ করতে থাকেন দক্ষিণেশ্বর ও রাসবিহারী সরকার।

শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক বড়ো শিল্পীদের অবস্থানগত পার্থক্য হ'লো এই যে—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র প্রভৃতি বিরাট মাপের অভিনেতাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচালক হ'লেও একই-সঙ্গে কেউ-ই প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা নন। শিশিরকুমার ভালোভাবে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার কথা ভেবেই নিজে মঞ্চ নিয়ে, আর্থিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে, নাট্য-প্রযোজনা করেছেন। যখন লাভ হয়েছে তখন পেয়েছেন, আবার যখন লোকসান হয়েছে তার দায়ও তাঁকেই বহন করতে হয়েছে। এক-আধবার তিনিও নাট্যাভিনয়কে চাকুরি হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, যেমন অন্যরাও কেউ কেউ এক-আধবার নিজেরা মঞ্চ নিয়ে প্রযোজনা এবং অভিনয় করেছেন, কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই এটা ব্যতিক্রম। এ ঘটনা সেই প্রথম থেকেই ঘটেছে। অর্ধেন্দুশেখর যখন একবার নিজে মঞ্চ নিয়ে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তখন তিনিও নানা সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তও তা-ই। শিশিরকুমারও ব্যতিক্রম নন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে যেভাবে তাঁকে জীবনযাপন করতে হয়েছে তা দেশের কলঙ্ক। তিনি 'পদ্মভূষণ' নেননি, আকাদেমির ফেলোশিপ নয়,

রবীন্দ্রভারতীর আসনও নয়। তিনি চেয়েছিলেন থিয়েটার। তিনি কী করতে পারেননি সেটা কোনো কথাই নয়—যা করেছেন, নাট্যাভিনয়ের যে-সম্মান এনে দিয়েছেন তা গৌরবের, তা স্মরণীয়।

আগে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটক, প্রযোজনা—সব কিছুই রঙ্গালয়ের বাইরের আগ্রহী কর্মীদের, সৌখিন নাট্যদলগুলিকে উৎসাহিত করতো—প্রভাবিত করতো। এবার পঞ্চাশের দশক থেকে সাধারণ রঙ্গশালার বাইরে যে নাট্যক্রিয়া চলছিল তাদের প্রভাব পড়তে থাকলো সাধারণ রঙ্গালয়ে। স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপা সর্বত্রই বদল শুরু হ'লো। বিশ্বরূপায় একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতার নিয়মিত ব্যবস্থা চালু করা হ'লো। নাট্য-প্রতিযোগিতা এর আগেও হয়েছে কিন্তু পেশাদারি-রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। সাধারণ দর্শক, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত যাতায়াত বাড়তে থাকলো। ক্রমশ স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপায় নাটক আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

এই দশকেই দ্বিতীয়-পর্বের বহু শিল্পীর দেহত্যাগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কাজে আবার ব্যাঘাত ঘটলো। নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, প্রভা দেবী, তিনকড়ি চক্রবর্তী এব. সর্বোপরি শিশিরকুমারের মৃত্যুতে নাট্যজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হ'লো।

মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিনের জন্য 'বহুরূপী' নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে—পরে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে 'অঙ্গার' এবং পরের দশকে 'ফেরারী ফৌজ', 'তিতাস', 'কল্লোল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাটক।

তরুণ রায়ের উদ্যোগে নিজস্ব মঞ্চ থিয়েটার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও নিয়মিত নাট্য-প্রযোজনার আয়োজন চলতে থাকে। তাছাড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, মফঃস্বলে, গ্রামে-গঞ্জে এই নতুন ধারার নাট্যক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময় যাত্রার আঙ্গিকে লেখা 'রাহুমুক্ত' নাটকটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। সোমেন নন্দীর নিজের বাড়িতে মঞ্চ তৈরি এবং নাট্য-প্রযোজনা উল্লেখের দাবি রাখে।

মুক্তাঙ্গন-রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তবে একথাও সত্য সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে এই বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর কাজের কাঠামোয় অনেক তফাৎ ছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ে শিল্পী ও অন্যান্য কর্মীদের মাসান্তে মাইনে দিতে হতো। সুতরাং নাটক জনপ্রিয় না হ'লে, আর্থিক দিক থেকে সফল না হ'লে, তাঁরা বিপদে পড়তেন। আর তাই নাট্যাভিনয়কে আর্থিক দিক থেকে সফল করার কথাই ভাবতেন বেশি। বাইরের নাট্যগোষ্ঠীর সুবিধা ছিল, কাউকে

বেতন বা দক্ষিণা দিতে হতো না। মহলা ইত্যাদির জন্যও খরচ করতে হতো না। সর্বোপরি টিকিট বিক্রি ক'রে অভিনয়ের আয়োজন যত হতো, তার চেয়ে বেশি হতো আমন্ত্রিত অভিনয়েব ব্যবস্থা—বলা যায এটা করতেই হতো। এই নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা ছিলেন, নাট্যাভিনয় তাঁদের প্রায় কারোরই জীবিকা ছিল না; ফলে পরীক্ষামূলক কাজ করার স্বাধীনতা ছিল বেশি, কারণ আর্থিক দায়-দায়িত্ব ছিল কম।

পঞ্চাশের দশকে এই ভিন্নধাবার থিয়েটারে বিরাট মাপের কয়েকজন নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নির্দেশক ও কলাকুশলীর পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিজন ভট্টাচার্য ছাড়াও নাট্যকার হিসাবে দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, বীরু মুখার্জী, উমানাথ ভট্টাচার্য, তরুণ রায়; আলোর প্রথিতযশা শিল্পী তাপস সেন; শিল্প-নির্দেশনায় নির্মল গুহরায়, খালেদ চৌধুরী প্রভৃতি এই দশকেই মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পান। রূপসজ্জায় শক্তি সেনের সুনামও হয় এই দশকেই। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র ছাড়াও অমর গঙ্গোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, উৎপল দত্ত, শোভেন মজুমদার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, তরুণ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, তরুণ মিত্র এবং কিছু পরে কুমার রায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণ কুন্ডু, নিমু ভৌমিক, রবি ঘোষ এবং তারও পরে শ্যামল ঘোষ, মমতা চট্টোপাধ্যায়, লিট্‌ল্ থিয়েটারের সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্য-শিল্পী দর্শকের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রতিষ্ঠা পান এই দশকে।

প্রতিটি গোষ্ঠীই তাঁদের সভ্যদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে থাকলেন নিজেদের মতো ক'রে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে 'বহুরূপী' এই শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রসারিত করে সকলের জন্য। এর সুফলও ফলতে থাকে কিছুদিনের মধ্যেই। বহুরূপী পত্রিকাসহ একাধিক নাট্য-পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে, কখনো নিয়মিতভাবে কখনো বা অনিয়মিত ভাবে। দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকার নাট্য-সমালোচনার মানও যথেষ্ট উন্নত হয়। পঙ্কজ দত্ত, নির্মলকান্তি ঘোষ, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, জ্যোতির্ময় বসুরায়, মহেন্দ্র সরকার এবং পরে সেবাব্রত গুপ্ত প্রভৃতি নাট্য-সমালোচকদের আলোচনায় সমালোচনার একটি মান তৈরি হতে থাকে। তাছাড়াও অমিতাভ চৌধুরী (শ্রী নিরপেক্ষ), উৎপল দত্ত প্রভৃতির সমালোচনাও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

এই পঞ্চাশের দশকেই ভারতে প্রথম 'জাতীয় নাট্যোৎসব'-এর আয়োজন হয় দিল্লীতে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত থেকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী এই 'নাট্যোৎসব'-এ যোগ দেন। এই উৎসবে 'বহুরূপী'-প্রযোজিত-অভিনীত 'ছেঁড়াতার' এবং

'রক্তকারবী' শ্রেষ্ঠ-প্রযোজনা হিসাবে সম্মানিত হয়।

পঞ্চাশের দশকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'লোকরঞ্জন শাখা' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশগৌরব সঙ্গীত-শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক, প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় প্রভৃতির প্রত্যক্ষ সাহায্যে এখানে নাচ-গান এবং অভিনয়ের চর্চা শুরু হয়।

এই সময়ে তৃপ্তি মিত্র এবং তাপস সেন সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। সাধারণ রঙ্গালয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তাঁদের যোগদানে। তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, সবিতাব্রত দত্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল এই মঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে তরুণ রায় নির্দেশনার কাজেও কিছুটা খ্যাতিলাভ করেন।

ষাটের দশকে নাট্যক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়ে যায়। বহু কৃতী লোকের সক্রিয় অংশগ্রহণে থিয়েটারের কাজকর্ম সর্ব বিষয়ে জনসমাদর লাভ করে। এই দশকেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় এবং নির্দেশনা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে; মর্যাদার সঙ্গেই তিনি প্রতিষ্ঠা পান।

সাধারণ রঙ্গালয়ে সেই প্রথম-পর্ব থেকে শিল্পীরা এক রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অন্য রঙ্গমঞ্চে চলে যেতেন আবার পরে ফিরেও আসতেন। ভিন্ন-থিয়েটার যা ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের গোড়ার দিক থেকে 'গ্রুপ-থিয়েটার' নামে পরিচিত হতে শুরু করলো সেখানেও দল ছেড়ে চলে যাওয়া ঘটতে থাকে 'নবান্ন'-পর্ব থেকেই। তখন দল বা গোষ্ঠী ছিল কম, ফলে ভাঙনও ছিল কম। তা সত্ত্বেও দেখা যায় এক দল থেকে অন্য দল, তা থেকে আর এক দল। ভাঙনের কাহিনীতে থিয়েটারের ইতিহাস পূর্ণ।

এই ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বহুরূপী, লিট্‌ল্ থিয়েটার, শৌভনিক, গণনাট্য সংঘ, থিয়েটার সেন্টার, নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট, গন্ধর্ব, নক্ষত্র, সুন্দরম, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রভৃতি সংস্থা গর্ব করার মতো কাজ করেছে বারে বারে এবং প্রথম ও দ্বিতীয়-পর্বের স্মরণীয় প্রযোজনার সঙ্গেই সেগুলো তুলনীয়। ষাটের দশকের এক বিশেষ প্রাপ্তি: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা— যার মূল কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশের দশকেই।

ষাটের দশক থেকে একের পর এক নতুন নতুন রঙ্গমঞ্চ তৈরি হতে থাকে। অভিনয় করার সুযোগ বেড়ে যায় অনেক বেশি। সাধারণ রঙ্গালয়ও কয়েকটি তৈরি হয় এই সময়ে। সরকারের তরফ থেকে এই ষাটের দশকে নতুন ক'রে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' আনার চেষ্টা হয়। আর এই সময়ে দুঃখজনকভাবে থিয়েটার সেন্টার ও পরে মুক্তাঙ্গন আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে প্রাণ-চাঞ্চল্যে থিয়েটার চরম উৎকর্ষে পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যে আরও বেশ কয়েকজন নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলা-কুশলী মঞ্চের গৌরব বাড়াতে এগিয়ে এসেছেন। বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, কেয়া চক্রবর্তী, মমতা চট্টোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, জোছন দস্তিদার, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয় কাজ করেছেন। সত্তরের দশকে রঙ্গনা মঞ্চ নিযে নান্দীকার-গোষ্ঠী নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

এর কিছু আগে এবং পরে নাট্যক্রিয়ায় অংশীদার হয়েছেন অনেকে, নিজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠালাভও করেছেন। শ্যামল সেন, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পবিত্র সরকার, অশোক মুখোপাধ্যায়, অসিত বসু, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল চৌধুরী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস মজুমদার, শাঁওলী মিত্র, চিত্রা সেন, চন্দন সেন (নাট্যকার), অনিল দে, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, কনিষ্ক সেন, সমীর বিশ্বাস, বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ বণিক, তড়িৎ চৌধুরী, অসিত মুখোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত, তমাল রায়চৌধুরী, সৌমিত্র বসু, অনসূয়া মজুমদার, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, সোহাগ সেন, ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী, বেবী সরকার এবং আরো অনেকে নাট্য-ক্রিয়ায় যোগ দিয়ে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, অধিকাংশই এখনো কাজ করে যাচ্ছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের কাজকর্ম গর্ব করার মতো অবস্থায় এখন আর নেই। এখন থিয়েটার বলতে, নাট্যাভিনয় বলতে এই ভিন্ন-থিয়েটারকেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সত্তরের দশকের শেষে আশির দশকেও গর্ব করার মতো বড়ো মাপের কাজ হয়েছে। সত্তরের দশকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 'মুদ্রারাক্ষস' মঞ্চস্থ করেন। শম্ভু মিত্র এই দুটি প্রযোজনাতেই অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও, 'পাপ-পুণ্য', 'গ্যালিলেওর জীবন', 'গ্যালিলেও', 'বলিদান' প্রভৃতি প্রযোজনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জগন্নাথ' ও 'মাধব মালঞ্চী কন্যা'র প্রযোজনাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, শিপ্রা দেবী, কেতকী দত্ত, গীতা দে, অসিতবরণ, তরুণকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ রঙ্গালয়ে গৌরবের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অনেকে এখনও যুক্ত। বেশ কয়েক বছর ধরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী উভয় নাট্য-ধারাতেই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বিগত কয়েক বছর ধরে নান্দীকার নিয়মিতভাবে 'জাতীয় নাট্যোৎসব'-এর

আয়োজন ক'রে ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ নট-নির্দেশক শম্ভু মিত্র আজও জীবিত। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের অকাল-দেহাবসানে থিয়েটারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দেশক উৎপল দত্ত এবং অসামান্য প্রতিভাধর নট-নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যু নাট্যক্রিয়াকে নিঃসন্দেহে শ্লথ-গতি করেছে।

'রবীন্দ্র-নাট্য'র সার্থক প্রযোজনায় তৃতীয়-পর্ব উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয়-পর্বে রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে কিন্তু 'রবীন্দ্র-নাট্য'র বহুমাত্রিক গভীরতা, ব্যঞ্জনা শম্ভু মিত্রের পরিচালনাতেই স্পষ্ট হয়েছে এই শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে।

ইদানীং প্রযোজনার গুণে খ্যাতিলাভ করেছে 'নাথবতী অনাথবৎ', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'তখন বিকেল', 'দায়বদ্ধ' প্রভৃতি আরও কিছু নাটক।

বেশ কিছু শিল্পীর প্রচেষ্টায় 'নাট্য সংহতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। কেবল অভিনয় বা প্রযোজনার লক্ষ্যে নয়, নাট্যক্রিয়ার সার্বিক উন্নতি, শিল্পী-কলাকুশলীদের সম্মান এবং মঙ্গলের কথাও 'নাট্য সংহতি' তার কর্মসূচির অন্তর্গত করেছে।

নতুন নতুন বহু শিল্পীর কাজে-কর্মে নাট্যক্রিয়া এখনো প্রাণ-চঞ্চল। তবে একথাও ঠিক যে বেশ কিছুদিন থেকে অনুশীলন, লেখাপড়া এবং বড়ো মাপের প্রযোজনার অভাব বেশি ক'রে নজরে পড়েছে। উন্নত-মানের অভিনয়, নির্দেশনা—সবই লেখাপড়া, অনুশীলন এবং আয়াস-নির্ভর।

ক্রান্তিলগ্নে নাট্য-কর্মকাণ্ডের এক সাধারণ চেহারাই এখানে বিধৃত হয়েছে। বহু কথা, বহু ঘটনা, বলা যায়নি। বিশদ আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে—যেখানে উল্লেখযোগ্য নাটক, বড়ো মাপের অভিনয়, নির্দেশনা এবং প্রযোজনার বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা থাকবে। মিলিত প্রয়াসে এই কাজ সম্ভব এবং এই কাজ এখনই প্রয়োজন; ঐতিহাসিক কারণেই তার দরকার।

রচনাকাল: ১৯৯৫
সায়ক নাট্য পত্র / ৪ সংখ্যা

শম্ভু মিত্র

শম্ভু মিত্র নাট্য-ক্রিযার ক্ষেত্রে আজও এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট উচ্চারণ, অতুলনীয় কণ্ঠস্বর—যা কাব্যময় এবং উচ্চকিত নাটকীয়-ভাব প্রকাশে সমান দক্ষ, সুঠাম দেহ, সর্বোপরি নাট্যকলার সর্ববিভাগে পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক দক্ষতায় পারঙ্গম এই নাট্য ব্যক্তিত্বকে অল্প পরিসরে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়; শুধুমাত্র অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

চল্লিশের দশকে যে নতুন নাট্য-রীতি প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শম্ভু মিত্র তার হোতা। বহু ক্ষমতাবান নাট্যকর্মী তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, অন্যত্রও অনেকে কাজ করেছেন, কিন্তু কেউ-ই সর্বকলায় পারদর্শী হয়ে তাঁর কাছাকাছি কোনো আসন অধিকার করতে পারেন নি। দীর্ঘদিনের কার্য অনুসরণে দেখতে পাই তিনি নিজেই নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন আর তারই ফলে কোনো নির্দিষ্ট মাপে বা অভিধায় তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি।

ওঁর বয়স যখন ৩২/৩৩, 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হয়ে গেছে, 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তি ক'রে লোককে চমৎকৃত করেছেন, গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত—তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তারপরই তাঁর সঙ্গে আমার কাজ শুরু।

আমাদের আগের পর্বের বেশ কয়েকজন বড়মাপের অভিনেতার কণ্ঠস্বর আমাদের মনে বিস্ময় জাগাতো, তাঁদের মধুময় কণ্ঠস্বর দর্শকদের মুগ্ধ ক'রে রাখতো। এ-ব্যাপারে শিশিরকুমার, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায় প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু এক শিশিরকুমার ছাড়া অন্যরা কণ্ঠস্বরের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারেই দক্ষ ছিলেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কণ্ঠস্বর সুরেলা, মিষ্টি, আবেগ প্রকাশে সক্ষম এবং চড়ার পর্দায় স্বচ্ছন্দ; রবি রায়ের কণ্ঠস্বরও মেলোডিয়াস, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে ছন্দোবদ্ধ-কাব্যময় সংলাপের আবৃত্তিতে অসাধারণ; দুর্গাদাস খাদের পর্দায় কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে অতি সহজেই দর্শককে মুগ্ধ ক'রে রাখতেন। শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরের গতি ছিল অবাধ—চড়া ও খাদে অনায়াস বিচরণ; সূক্ষ্ম স্বরের বিন্যাস, বৈচিত্র্য এবং সুন্দরতম স্বরক্ষেপণের পটুত্বে তিনি ছিলেন অসাধারণ শিল্পী। 'সীতা', 'আলমগীর', 'নরনারায়ণ', 'রঘুবীর', 'দিগ্বিজয়ী', 'ষোড়শী' প্রভৃতি অসংখ্য সৃষ্টিতে রত্ন-সমৃদ্ধ তাঁর কাজ।

এঁদের অভিনয় দেখা এবং কণ্ঠস্বর শোনার পরেও বলতে পারি: শম্ভু মিত্র

সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এক চমক জাগানো শিহরন তৈরি করেছিলেন। 'মধুবংশীর গলি'র আবৃত্তি দর্শক মনে প্রথম সাড়া জাগায়। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে এই দীর্ঘ কবিতাটি আবৃত্তি করা ছিল দুরূহ—এবং তিনি এর সূত্রপাত না ঘটালে এ অসামান্য কবিতাটি হয়তো অনাদৃত থেকে যেতো। 'পৃথিবী' কবিতায়—

'....... মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,/বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,/মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,....' ইত্যাদি বলার সময় 'ললিতে কঠোরে', 'পুরুষে নারীতে'—কত সহজেই আলাদা করতে পারতেন! অথচ তার জন্য কোথাও জোর দেওয়া কিংবা অযথা সুরের আধিক্য—কখনোই থাকতো না। এই সহজ, এই কাব্যময় এবং নাটকীয় প্রকাশে তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা অতুলনীয়।

এর আগেই 'নবান্ন' দেখেছি; পরবর্তী কালে এই নাটকে একসঙ্গে অভিনয়ও করেছি—মনে হতো ওঁর কণ্ঠস্বরের ব্যবহার কত সহজ, কত স্বাভাবিক; কিন্তু সমস্ত জটিল মনোভাব, সূক্ষ্ম অনুভূতি ওর-ই মধ্যে দিয়ে বহুমাত্রিক হয়ে প্রকাশ পেতো। অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে কেবল এই আলোচনা করলে অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো অবস্থা হবার সম্ভাবনাই বেশি। বহু আয়াস-অর্জিত কণ্ঠস্বর তাঁর বিরাট সম্পদ, কিন্তু একমাত্র বৈভব নয়।

যখন মহলায় থেকেছি, একসঙ্গে অভিনয় করেছি কিংবা যখন অভিনয় করছি না—প্রেক্ষাগৃহে ব'সে দেখছি, প্রত্যেক দিন, সমস্ত সময়েই যেন বিস্ময় আমাদেব জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতো। আজও মনে পড়ে—'৫৩ সালে যখন তিনি 'চার অধ্যায়'-এ অতীন চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করেন তখন দর্শক-শিল্পী সবাই এক বিচিত্র অনুভূতির স্বাদে যেন পাগল হয়ে যেতেন। রসিকতা ক'রে আমরা কতবার বলেছি—কেউ যদি কাউকে হত্যা ক'রে ধরা পড়তে না চায় তাহলে 'চার অধ্যায়' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন ক'রে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যদি প্রথম সারিতে বসিয়ে রাখে, অভিনয় শেষে দেখা যাবে তার মৃতদেহ পড়ে আছে! কষ্ট, উদ্বেগ, উপায়-বিহীন অস্থিরতা শম্ভুদা যেভাবে প্রকাশ করতেন—তার চাপ সাধারণ কোনো দর্শকের পক্ষেই সহজে সহ্য করা সম্ভব হতো না। তাঁর অভিনীত অতীন সেন্টিমেন্ট-সর্বস্ব কিংবা আবেগ-সর্বস্ব ছিল না—বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবকের ব্যক্তিগত প্রেম ও দলগত সমস্যার বিরোধ এবং তার চাপে ক্ষতবিক্ষত লড়াইয়ের বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ। শেষ দৃশ্যে যখন অতীন দলের নির্দেশে এলাকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতে এসেছে তখন মনে হতো অতলস্পর্শ কষ্টেও যেন সে ভাঙেনি, সে যেন নির্দেশ-বাহক এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে—সেই যন্ত্রের চাপে তার আর্ত-হাহাকার প্রকাশ পেতে চাইছে; অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ যুবক সমস্ত কিছুর বিনিময়েও দলীয় নির্দেশ পালন ক'রে

চলেছে। উদভ্রান্ত চেহারা, শুকনো গলা, কাতর ছটফটানির ভেতর সে এক অদ্ভুত প্রকাশ!

রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় ভাষা তাঁর কণ্ঠে প্রাত্যহিক কথ্য ভাষার মতোই মনে হ'তো। সেই যুগের প্রকাশও যেমন ছিল তাঁর অভিনয়ে, চিরকালীন-যুবমানসের প্রকাশও ঘটতো অপূর্ব দক্ষতায়; সে অতীন আজকের অতীন—চিরকালের অতীন।

চল্লিশের দশকে নির্দেশক হিসাবেও পেলাম শম্ভু মিত্রকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ ক'রে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে, নাট্যক্রিয়ার প্রাঙ্গণে নির্দেশকের (Artist Director) আবির্ভাব ঘটেছে গত শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই। রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকার বহু শিল্পী, যাঁরা জগৎ-জোড়া নাম এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য হ'লো: কেবল নাটক নয়, অভিনয় নয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা বা সংগীতের ব্যবহারই নয়—নাট্য-প্রযোজনায় এ-সবের একত্র এবং কৌশলী ব্যবহারই মূল কথা—আর সেটা সম্ভব যদি বিভাগীয় কাজ-কর্ম একজনের কল্পনা, চিন্তা-নির্ভর হয়েই উপস্থাপিত হয়—তিনিই হলেন নির্দেশক—বা Artist Director.

আমাদের দেশে ১৮৭২ সাল থেকে নিয়মিত নাট্যাভিনয় শুরু হ'লেও নির্দেশকের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে পঞ্চাশ বছর। শিশিরকুমারই আমাদের দেশে প্রথম নির্দেশক, যা এই শতকের বিশের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শম্ভু মিত্র শুরু করেন '৪৪-এ 'নবান্ন' নিয়ে। প্রচলিত প্রথায় এ-নাটক অভিনীত হয়নি, আবার পুরোপুরি ন্যাচারালিজমও নয়, বরং বলা যায় ন্যাচারাল ও সিম্বলিকের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কিন্তু সেই 'নবান্ন' প্রযোজনায় পরিচালক হিসাবে দু'জনের নামোল্লেখ আছে—সুতরাং 'নবান্ন'র পরবর্তী কাজকর্ম নিয়েই আলোচনা করা শ্রেয়।

'উলুখাগড়া' নাটকে ইঙ্গিতবহ দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার দেখতে পাই, যাকে 'সাজেস্টিভ' বলা যায়। এক দৃশ্যে তিনটি দরজার ব্যবহার আছে, কিন্তু কোনো দরজাই বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়। মধ্যমঞ্চে আর্চ লাগানো একটি দরজা—যা সম্পূর্ণ দরজা নয়, দরজার একটি ফ্রেম মাত্র। তার ওপর একটি আর্চ। সেই আর্চের মাঝখানে একটা আলো। পাশের ফ্রেম থেকে উইংস পর্যন্ত কালো কাপড় দিয়ে টানা—খানিকটা নিচু ক'রে; কাপড়ের ওপর দিয়ে ভেতরটা দেখা যেতো—কিন্তু তা যেন দেখার কথা নয়।

অন্য দু'টি দরজায় পাল্লা দেওয়া হতো। যে দরজা দিয়ে স্টাডিতে যাওয়া

যেতো তার পাল্লার ওপরের দিকটা যেন কাঁচের—টিসু কাগজ দিয়ে সেটা করা হতো। এই ধরনের মঞ্চসজ্জা আজ আর নতুন নয় কিন্তু ১৯৫০ সালে থিয়েটারে আলোড়ন এনেছিল। অনুরূপভাবে আলোর ব্যবহারও চমক এনেছিল।

'ছেঁড়াতার' নাটকের উপস্থাপনাও ছিল বিস্ময়কর। নাটক, অভিনয় এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যের নতুনত্বে এই উপস্থাপনা আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। মঞ্চসজ্জা এবং আলোর ব্যবহার আজও দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মঞ্চে গ্রামের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। দূরে গাছপালা, ঘরবাড়ি নিয়ে গ্রাম যেমন কাব্যময় হয়ে ওঠে, সেইভাবেই তৈরি হয়েছিল 'ছেঁড়াতার'-এর মঞ্চসজ্জা। অথচ কোনো কিছুই বাস্তবের অনুকৃতি নয়। মঞ্চের পেছনে সাইক্লোরামা—তার সামনে ছোটো ছোটো অল্প উচ্চতার কাট-আউটে গাছপালা—তারই আড়ালে মাঝে মাঝে কুঁড়েঘর—এসব এমন ক'রে আঁকা হয়েছিল যা গ্রামের চেহারাকে ফুটিয়ে তুলতো, অথচ ঠিক বাস্তব নয়। মঞ্চের সামনে কোণের দিকে কুঁড়ে ঘরের আদলে একটি সেট যা অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন হতো। সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে মঞ্চকে ভারাক্রান্ত করা হয়নি, বাড়াবাড়ি রকমের বাস্তব-অনুসারী না ক'রে—ইঙ্গিতবাহী এই মঞ্চসজ্জা দর্শকের কল্পনা-শক্তিকে বৃদ্ধি করতে যেমন সাহায্য করতো, তেমনি শিল্পীদের চলাফেরা, অভিনয় প্রায় স্বাভাবিক হয়েও তার ওপরে যেতে পারতো। এই নাটকেরই একটি দৃশ্য মঞ্চ-স্থাপত্যে এবং আলোর ব্যবহারে স্মরণীয় হয়ে আছে। দৃশ্যটি হ'লো—

শহরে বন্ধুর বাড়ি থেকে রহিম (শম্ভু মিত্র) হাঁটা-পথে যাত্রা শুরু ক'রে গিয়ে পৌঁছায় তার গ্রামে, শেষে নিজের বাড়ির উঠানে। চলচ্চিত্রে আমরা এ ধরনের দৃশ্য তো প্রায়ই দেখি, কিন্তু মঞ্চে?

মঞ্চের ডানদিকের কোণে তিনি শহরে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেকে কোলে ক'রে যখন যাত্রা শুরু করবেন তখন থেকেই বন্ধু এবং সেই অংশের ওপর আলো কমতে থাকে এবং দর্শক বোঝার আগেই আলো নিভে যায়। বন্ধু অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যান। রহিম ও ছেলের মুখে সামান্য আলো—অসুস্থ রহিম দুর্বল ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মঞ্চের ধার ঘেঁষে বাঁ-দিকে এগোতে থাকেন। অন্ধকার মঞ্চে অতি ক্ষীণ আলোয় ধীরে ধীরে গ্রামের সেই কাট-আউট আবছা হয়ে দেখা যেতে থাকে। রহিমও এগোতে থাকেন—আলোও বাড়তে থাকে—তবে কখনোই তা উজ্জ্বল বা প্রখর আলো নয়। কয়েক পা চলার পর গ্রামে রহিমের কুঁড়ে ঘর প্রথমে অস্পষ্ট এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ক্লান্ত রহিম কথা বলতে বলতে ছেলেকে দাওয়ায় নামিয়ে দেন। শহর থেকে গ্রামে চলে আসা সম্পূর্ণ হয় এবং পুরোটাই ঘটে

দর্শকের সামনে। এই দৃশ্য কল্পনা এবং বাস্তবায়িত ক'রে শম্ভু মিত্র এক অনন্য উদাহরণ তৈবি করলেন। রূঢ় বাস্তব শিল্প চাতুর্যে কাব্য হয়ে প্রকাশ পেলো।

আলোচ্য প্রসঙ্গে আর একটি নাট্য-প্রয়াসেব উল্লেখ কবা অতি প্রয়োজন। ১৯৫১ সালে আমরা 'বিভাব' মঞ্চস্থ কবি। একথা যেমন সত্য যে এই নাটিকার সংলাপ ইত্যাদি শম্ভুদা, বৌদি (তৃপ্তি মিত্র) এবং আমাব তৈবি—ঠিক তেমনি সত্য যে এই নাটিকাব যাবতীয় কল্পনা ও প্রয়োগ-পদ্ধতিব স্রষ্টা শুধুই শম্ভু মিত্র। কোনো গল্প নেই—অথচ কথা বলতে বলতে গল্প তৈরি হয়ে যায়; চেয়ার নেই—বসা হয়; জানলা নেই, দরজা নেই অথচ এসবের ব্যবহার ঠিক মতোই হয়—যেন সবই দর্শকেব সামনে আছে। ট্রাম-বাস-রিক্সা-মোটর গাড়ি—সবই দর্শক দেখে; এগুলো পিস্‌বোর্ডে আঁকা এবং শিল্পীবাই মুখে যান্ত্রিক আওয়াজ ক'রে নিয়ে যায়। শম্ভুদা অসাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এর অভিনয হয়েছে—সর্বত্রই জনগণ এর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অভিভূত হয়েছেন। শম্ভুদাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'বিভাব' নাটকের উপস্থাপনা।

এর পর আমরা ঠিক করেছিলাম আওয়াজ—প্রচলিত কোনো শব্দ নয়, শুধু আওয়াজ ব্যবহার ক'রে নাটক করবো। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় শেষপর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি।

এ-রকম অজস্র উদাহরণের মধ্যেই তাঁব বৈশিষ্ট্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। 'দশচক্র'তে—বিশেষ ক'রে ভিড়ের দৃশ্যে কিংবা বাইরের ঘর ও তার পেছনে খাবার ঘর, যেখানে ব'সে ধ্রুব খাচ্ছে, হৈমর সঙ্গে কথা বলছে, যা খোলা দরজার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—কখনো বাইরের ঘরের আলো বাড়িয়ে, কখনো সেটা সামান্য কমিয়ে খাবার ঘরটাকে আলোকিত করার মধ্যে সমস্ত দৃশ্যকেই সচল ক'রে রাখা হয়। অথচ কোনোটাই দাগ দিয়ে দেখানোর মতো ক'রে হয় না—বাস্তবের কঠিন জায়গায় দাঁড়িয়েই কাব্য প্রকাশ পায়। এই প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ব্যবহার 'দশচক্র'-র প্রথম পর্বের অভিনয়-কালেই হয়েছিল।

'রক্তকরবী'র প্রযোজনাতেও মঞ্চসজ্জা, আলোর মোহময়তা, সঙ্গীতের ঋজু ব্যবহার বিশেষ হয়েও নির্বিশেষ চেহারা প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে।

এই সমস্ত কারিগরি-কৌশল এবং তার শিল্পসম্মত ব্যবহার উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়ে শম্ভু মিত্র এবং সেকালের 'বহুরূপী'কে সম্মানের শিখরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। 'পুতুল খেলা', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন', 'রাজা', 'রাজা অয়দিপাউস' ইত্যাদি সমস্ত নাটকই প্রযোজনার গুণে দর্শক-মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কেবলমাত্র মঞ্চসজ্জা, আলোর কুশলী-প্রয়োগ এবং কাব্যময় প্রযোজনার জন্যই নয়, আবহ-সঙ্গীতেব সার্থক কল্পনা ও তার সুপ্রযুক্তিতে, ব্যক্তিগত এবং দলগত অভিনয়েব নান্দনিকতায তাঁর সৃষ্টি এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল।

নাটক নির্বাচনে, অভিনয-শিক্ষাদানে, সববকম কাবিগবি বিদ্যায় সকলকে শিক্ষিত ও পাবদর্শী ক'বে তোলায় চিরকাল তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আবাব দর্শক-গোষ্ঠী তৈবি কবাতেও তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। প্রথম পর্ব থেকেই নিযমিত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চালু করেন। মঞ্চস্থ হবে যে-নাটক কেবল তাকে অবলম্বন ক'রেই শিক্ষাদান নয়—যে-নাটক হয়তো কোনো দিনই অভিনীত হবে না—হয়ওনি—তা-ও সযত্নে শিক্ষা ও অভ্যাসেব কারণে মহলায় গ্রহণ করা হয়েছে।

যে-কোনো নাটকেব মহলা চলতো দীর্ঘদিন ধরে। পরিচালকের আসনে থেকে যা কল্পনা করতেন, যা-কিছু প্রকাশ করতে চাইতেন, সে-সমস্তরই ইঙ্গিত দিতেন—শিল্পীদের স্বাধীনতা থাকতো সেই চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক'রে নিজেদের মতো ক'রে কাজ কবার।

প্রথমদিকে অবশ্য প্রতি পদে শেখাতেন। চলাফেরা, ওঠা-বসা—সবই প্রায় হাত ধরে শিখিয়েছেন; কণ্ঠস্বরের মড্যুলেশন দেখাতেন—রোজই অভ্যাস করাতেন। এইভাবেই তৃপ্তি মিত্র, বর্তমান নিবন্ধকার এবং আরো অনেকেই শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। অবশ্য 'রক্তকরবী'র সময় থেকেই তিনি শিক্ষা-পদ্ধতি বদল করতে থাকেন। বারবার আলোচনা করতেন, নিজে অভিনয় ক'রে দেখাতেন, অন্যের প্রচেষ্টা দেখতেন এবং তা বোঝবার চেষ্টা করতেন।

ন্যাচারালিজমের বাড়াবাড়ি তাঁর কোনো কাজেই থাকতো না। 'As if real'—এই প্রকাশভঙ্গি দিয়ে তাঁর কাজ বোঝা যায়। ইঙ্গিত-আশ্রয়ী উপস্থাপনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দর্শকের কল্পনাকে প্রসারিত করার জন্য তাঁর ব্যবহৃত ইঙ্গিতগুলোই ছিল যথেষ্ট। মঞ্চসজ্জা, আলোর ব্যবহার, সঙ্গীতের প্রয়োগ—সব ক্ষেত্রেই এই কথা একইভাবে সত্য। বেশি ক'রে বাস্তবানুগ হতে গেলে প্রকাশ ও উপলব্ধির ব্যাপ্তি কমে যায়। ইঙ্গিতের ভাষা দর্শক বুঝতে পারবে না, রসগ্রহণ করতে পারবে না—এই ধরনের মনোভাবকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না।

এই সব নিয়েই শম্ভু মিত্র: অভিনেতা, শিক্ষক এবং নির্দেশক। একক প্রয়াসেই তিনি আমাদের দেশের নাট্য-প্রযোজনাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করলেন। 'নবান্ন' (৪৪), উলুখাগড়া' (৫০), 'ছেঁড়াতার' (৫০), 'চার অধ্যায়' (৫১), 'বিভাব' (৫১), 'দশচক্র' (৫২), 'রক্তকরবী' (৫৪), 'বিসর্জন' (৬২), 'রাজা' (৬৪), 'রাজা অয়দিপাউস' (৬৪), 'বাকি ইতিহাস' (৬৬)

প্রভৃতি নাট্য-প্রযোজনা যে-কোনো দেশের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

অসীম আয়াস স্বীকার ক'রে তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন, অপরকে সাহায্য কবেছেন, একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ ক'রে গেছেন। নাট্য-ক্রিযার সমস্ত বিভাগেই দেখেছি তাঁর জ্ঞান কেবল পুঁথিগত নয়—ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে মিলে একটা সম্পূর্ণ চেহারা পেয়েছে। একথা সত্য—সহজে তাঁকে কোনো বিষয়ে সন্তুষ্ট করা যেতো না। কিন্তু কেউ যদি ভালো কাজ করতো, কিংবা মৌলিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতো—তাহ'লে তিনি সবার আগে গিয়ে তাঁকে প্রশংসা জানিয়ে প্রতিষ্ঠা দিতেন।

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসাধারণ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন; সেই সঙ্গে একাধিক মৌলিক, অনূদিত ও রূপান্তরিত নাটকও লিখেছেন—যা মঞ্চস্থ ক'রে 'বহুরূপী' একাধিকবার প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অর্জন করেছে। '৪৩-'৪৪ সাল নাগাদ লেখা 'উলুখাগড়া', '৫১-'৫২ আন্দাজ 'ঘূর্ণি', তারপর রূপান্তরিত 'পুতুল খেলা', মৌলিক 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'রাজা অয়দিপাউস'-এর অনুবাদ এবং সর্বোপরি 'চাঁদ বণিকের পালা'—নাট্যকার হিসাবে প্রথম সারিতে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর মৌলিক উদ্ভাবনী-শক্তি দলকে স্থায়িত্ব দিয়েছে—নতুন নতুন ছেলে-মেয়েরা নাট্য-ক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে, নাট্য-শিক্ষিত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিটি সংগঠনের মতো নাট্য-সংগঠনেও দেখা যায় কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হ'লে সংখ্যাধিক্যের মতকেই গ্রাহ্য করা হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে—মত জোর ক'রে চাপিয়ে দিলে ফল কখনো ভালো হয়না। শম্ভুদা কিন্তু শুধুমাত্র 'সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত' নেবার পদ্ধতিই গ্রহণ করেন। দিনের পর দিন আলোচনা চললেও ওই একই ব্যবস্থা।

দর্শক-গোষ্ঠী তৈরির ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শঙ্কর ভট্টাচার্য—যিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শম্ভুদারই বয়সী এবং অভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন—তাঁরই পরামর্শে আমরা 'অনুগ্রাহক প্রথা' প্রবর্তন করি। এ-ব্যাপারে শম্ভুদার আগ্রহ ছিল অপরিসীম।

অভিনেতা, নির্দেশক, সংগঠক, শিক্ষক এবং নাট্যকার শম্ভু মিত্র—এ-যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্য-ব্যক্তিত্ব—এবং আমদের গর্ব। কাব্যময় অথবা আলংকারিক ভাষায় তাঁকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করা যায়—কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ তিনি নিজেই নিজের পরিচয়—ব্যতিক্রমী নাট্য-ক্রিয়ার জীবন্ত-প্রতিভূ।

রচনাকাল : ১৯৯৬